বঙ্গের মহিলা কবি

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৩৩৭

ধন্যবাদ জানাইতেছি। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সাহিত্যানুরাগী প্রীতি-ভাজন বন্ধু শ্রীযুক্ত রমদাপ্রসাদ ঘোষ এম, এ, এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

কোন গ্রন্থেরই প্রথম সংস্করণ আশানুরূপ করা সম্ভবপর হয় না, আমিও পারিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না। গ্রন্থ মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলে এবং আমার অজ্ঞতাবশতঃ যদি কোন মহিলা কবির বিষয় উল্লিখিত না হইয়া থাকে তাহা হইলে আমাকে দয়া করিয়া জানাইলে আনন্দিত হইব। যে নারী-জাতির পবিত্র জ্যোতিঃপ্রভাবে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন আলোকিত হইয়াছে, সেই মহীয়সী নারীকুলের কবি-প্রতিভার পরিচয় দিবার এই সুযোগ পাইয়া আমি আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

ঢাকা,
জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ,
শ্রাবণ, ১৩৩৭।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথগুপ্ত

উৎসর্গ

আমার জীবনের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন

যিনি ছিলেন

যাঁহার সুগভীর স্নেহের তুলনা জগতে দুর্লভ

সেই চির-স্নেহময়ী জননী

স্বর্গীয়া মোক্ষদাসুন্দরী দেবীর

পবিত্র নামে আমার অতি প্রিয়

'বঙ্গের মহিলা কবি'

উৎসর্গ

করিলাম।

বঙ্গের মহিলা কবিদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা অনেকদিন হইতেই আমার ছিল কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা এতদিন করিতে পারি নাই। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা বিশ্বভারতীর দুইটি সভায় 'দীপিকা' সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে ও আগ্রহে আমি 'বঙ্গের মহিলা কবিদের' সম্বন্ধে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করি এবং একে একে 'দীপিকা', 'বীণা' ও 'পঞ্চপুষ্প' প্রভৃতি মাসিক পত্রে কয়েকজন মহিলা কবির বিষয়ও প্রকাশ করিয়াছিলাম, অনেকের কাছেই ঐ সকল প্রবন্ধ প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মনোরঞ্জন বাবু আমার নিকট হইতে প্রথম পাণ্ডুলিপি খানা নিয়া হারাইয়া ফেলেন, সেজন্য আমার বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল এবং পুনরায় অনেক প্রবন্ধ নূতন করিয়া লিখিতে হওয়ায়ও অনেক সময় লাগিয়াছে। আজ তিন বৎসরের চেষ্টা ও যত্নে বঙ্গের মহিলা কবিদের পরিচয় ও আলোচনা-মূলক এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিলাম।

বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী ইতিহাস ও সাহিত্যের অনু-শীলনের ফলে নানা দিক্ দিয়া নানারূপ পরিবর্ত্তন হইতেছে, একদিন যাহা সত্যরূপে জনসমাজে পরিগৃহীত হইয়াছে আজ তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সকলে সন্দিহান হইতেছেন। বাঙ্গালার মহিলা কবিদের মধ্যে প্রাচীনত্বের দাবী করিবার অধিকারিণী চণ্ডীদাসের পদাবলীর উৎস—বাশুলী দেবীর মন্দিরের সেবিকা রামী বা রামমণি। এই রামমণি কয়েকটি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, এমন কি তাঁহার পদাবলীও আবিষ্কৃত হইয়াছে, এজন্যই আমরা তাঁহাকে প্রাচীনত্বের

দিক্ দিয়া সকলের আগে স্থান দিয়াছি। রামমণির অস্তিত্ব ছিল কিনা এবং কয়জন চণ্ডীদাস ছিলেন তাহা লইয়া পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন, আমরা যে প্রবাদ সত্যরূপে চলিয়া আসিতেছে এবং গৃহীত হইয়াছে তাহাকেই সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছি। তারপর চন্দ্রাবতী, আনন্দময়ী, গঙ্গামণি ইত্যাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কবিওয়ালাসম্প্রদায়ের মধ্যে যজ্ঞেশ্বরী নামে একজন স্ত্রীকবির পরিচয় পাওয়া যায়, ইনি কয়েকটি সঙ্গীত মাত্র রচনা করিয়াছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুভ অভ্যুদয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন ভাব বিকশিত হইল। মানব, প্রকৃতি ও সমাজের আলোচনায় কাব্য সাহিত্যের মধ্যে নূতন প্রেরণার উদ্দীপনা জাগরিত হইল। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য ছিল রাজসভার স্তুতিগান ও গৃহস্থ ঘরের কথা। ইংরাজী আমলের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যের মধ্যে বিশালতা বা বিপুলতা—এক কথায় বিশ্বজনীন ভাব, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মানুষমাত্রকেই অনুভব করা—তাহা ছিল না। এই বিশ্বের বাণী ইংরাজী আমলে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া সমগ্র জগতের মধ্যে বঙ্গ-সাহিত্য-সরস্বতীর আসনখানি সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। সেই সুর মহিলা কবিদের মধ্যেও সকলের আগে স্বর্ণকুমারী দেবীর বীণার তারে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রীযুক্তা কামিনী রায়, গিরীন্দ্রমোহিনী, মানকুমারী, প্রিয়ম্বদা হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান অতি আধুনিক যুগের নিরুপমা, লীলা, রাধারাণী ও উমাদেবীর মধ্যেও তাহার বিকাশ লাভের প্রয়াস দেখিতে পাইতেছি। ইহাদের কবিতার সুরে প্রাণের অভিনব স্পন্দন শুনিতে পাওয়া যায়।

কবির পরিচয় কাব্যের ভিতর দিয়াই হইয়া থাকে, তাহাতেই তাঁহার প্রকৃত রূপটি ফুটিয়া উঠে। কবিতা কি? কাব্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। গল্প আছে একজন সেণ্ট আগষ্টাইন্‌কে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন—কবিতার স্বরূপ কি? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন— "If not asked, I know, if you ask me I know not." ইহার চেয়ে সুন্দর উত্তর বড় একটা মিলে না। কবিতার বিচার নানাভাবে নানারূপে নানাজনে করিয়া থাকেন কিন্তু কবির প্রাণের মধ্যে যে সৃষ্টির সৌন্দর্য্য শতরূপে শতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে সেই প্রাণের সন্ধান কয়জন পাইয়া থাকেন? সেইখানেই কবিতার প্রকৃত পরিচয়। সেইরূপ বিচার করিবার ক্ষমতা আমাদের কতদূর আছে জানি না। আমি সেইরূপ সূক্ষ্মভাবে এবং বিস্তারিতরূপে কোন আলোচনা করি নাই—এক কথায় কবির পরিচয়, কাব্য-পরিচয় এবং কাব্য-গ্রন্থের আলোচনা প্রয়োজনানুরূপ কোথাও বিশদভাবে করিয়াছি, কোথাও করি নাই। তবে প্রত্যেক কবির কবিতার মূলসুরটুকু আমি যেমন বুঝিয়াছি তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে ইতস্ততঃ করি নাই। মহিলা কবিদের প্রত্যেকের কবিতায়ই একটা বিষাদের সুর—একটা নিরাশার সুর প্রবাহিত, এই বিশেষত্বটুকু সকলেরই চক্ষে পড়িবে। একথার উল্লেখও গ্রন্থ মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইবেন।

আমি শুধু বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন, সেই সকল মহিলা কবিদের বিষয়ই বিবৃত করিয়াছি, এই জন্যই ইংরাজী ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া যশস্বিনী কবি, স্বর্গীয়া তরু দত্ত, এবং আমাদের জাতীয় জীবনের নব উদ্বোধন-দিনের জননেত্রী বিদ্যুন্ময়ী তেজস্বিনী মহিলা কবি শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বিষয়এ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করি নাই। ইঁহারা যদি বাঙ্গালা সাহিত্যেরও আলোচনা করিতেন তাহা হইলে তাহা কত বড় গৌরবের কারণ হইত! সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াও অনেকে যশস্বিনী হইয়াছিলেন, বঙ্গে এমন মহিলা কবিও আছেন—এখানে বৈজয়ন্তী দেবী এবং প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহাদের সম্বন্ধেও এই গ্রন্থ মধ্যে কোন কথা বলা হয় নাই, যদি পাঠক-সমাজ ইহা প্রয়োজনীয়

মনে করেন তাহা হইলে ভবিষ্যত সংস্করণে ইঁহাদের বিষয় সন্নিবেশিত করিব।

এই গ্রন্থ প্রকাশে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছেন এবং উৎসাহ দিয়াছেন পূজনীয়া শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি-এ ও শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ। ইঁহাদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা-ঋণ অত্যন্ত বেশি। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী এই প্রাচীন বয়সেও আমাকে যে ভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহার ন্যায় মহীয়সী মহিলার পক্ষেই তাহা সম্ভব। একদিকে যেমন তিনি অনেক মহিলা কবির পরিচয় ইত্যাদি সংগ্রহ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন, তেমনি স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর ব্লকখানা প্রদান করিয়াও উপকৃত করিয়াছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত বলিতে পারি যে, প্রত্যেক মহিলা কবিই আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে এত সহজে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইত না।

কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদের প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ও শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ নন্দী সাহিত্য-পরিষদ পুস্তকালয় হইতে এবং রজনীকান্ত গুপ্ত মেমোরিয়েল লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষগণ উক্ত পাঠাগার হইতে আমাকে অনেক দুর্লভ পুস্তক ইত্যাদি দ্বারা বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের ঐরূপ সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে অনেক মহিলা কবিদের পরিচয় ও কাব্য আলোচনা করা সম্ভবপর হইত না। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পরম স্নেহভাজন সুহৃদ্ কবি শ্রীমান্ নরেন্দ্র দেব ও সুকবি শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসু, বন্ধুবর, কবিশেখর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ, মিউনিসিপাল গেজেট সম্পাদক সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম মহাশয় কোন কোন বিষয়ে সাহায্য করিয়া আমাকে উপকৃত করিয়াছেন, এ সুযোগে তাঁহাদিগকেও
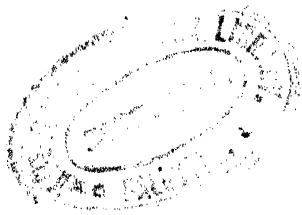
বঙ্গের মহিলা কবি

রামী

বঙ্গের মহিলা কবিদের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে সকলের আগে রজকিনী রামীর নাম করিতে হয়। তাঁহার রচিত কয়েকটি পদ আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহাকেই বঙ্গের মহিলা কবিদের মধ্যে প্রথম স্থান দিতে হয়। তাঁহার পূর্ব্বের আর কোনও মহিলা কবির পরিচয় আমরা পাই নাই। রামীর পূর্ব্বে যে দুই একজন স্ত্রী-কবির ভণিতা পাওয়া যায় তাহাদিগকে নিঃসন্দেহরূপে মহিলা কবিরূপে গ্রহণ করা যায় না বলিয়াই আমরা প্রথমেই রামীর কথা বলিতেছি।

রামীর সহিত চণ্ডীদাসের নামের স্মৃতি চির বিরাজিত। কিন্তু চণ্ডীদাসের পদাবলী লইয়া বর্ত্তমান সময়ে যে বিতর্ক চলিতেছে তাহাতে কোন্ চণ্ডীদাসের সহিত রজকিনী রামীর প্রণয়লীলা ঘটিয়াছিল তাহার একটা সুমীমাংসায় আসাও বড় সহজ নহে। তবে এ পর্য্যন্ত যে প্রেমবিহ্বল—ভাব-সম্পদপূর্ণ পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের কামগন্ধবিহীন পীযূষ-মধুর কবিতালহরীর সহিত আমাদের দেশের জনসাধারণের স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা আছে, সেই চণ্ডীদাসের সহিতই আমরা রজকিনী রামীর জীবন-ইতিহাসকে গ্রথিত করিলাম।

চণ্ডীদাস যৌবনেই ছিলেন উদাস প্রকৃতির লোক। সংসারের দিকে তাঁহার বড় একটা লক্ষ্য ছিল না। আপনার মনে আপনার খেয়ালে চলিতেন, তবে কিনা 'দেবদ্বিজে' প্রথম জীবনে ছিল তাঁহার অসাধারণ ভক্তি। আর ছিল তাঁহার সুমধুর কণ্ঠ—গান গাহিয়া মানুষের মন মুগ্ধ করিতেন।

চণ্ডীদাসের পিতার মৃত্যুর পর তিনি বাশুলী দেবীর পূজক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত দেবমন্দিরের সেবিকা রামমণি (নরহরির মতে তারা ধুবনী) কবির হৃদয়ে প্রেম উদ্দীপিত করিয়া দিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া প্রতিদিন দেবীর পূজা করিতেন, ভোগ রাঁধিতেন এবং গ্রামের প্রান্তভাগে, নির্জ্জনস্থানে, একটী পত্রের কুটিরে থাকিয়া নিত্য ভজন করিতেন।

"নান্নুরের মাঠে পত্রের কুটির
নিরজন স্থান অতি।
বাশুলি আদেশে, চণ্ডীদাস তথা
ভজন করয়ে নিতি॥"

এই সময়ে রামমণি অসহায় অবস্থায় আহার অন্বেষণে ইতস্ততঃ বেড়াইতেন। গ্রামের লোকেরা দয়া করিয়া তাঁহাকে দেবীর শ্রীমন্দির মার্জ্জনা কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। রামমণি প্রত্যহ শ্রীমন্দির মার্জ্জনা করিতেন এবং দেবীর প্রসাদ পাইতেন। দেবীর প্রসাদান্ন ভোজন করিয়া প্রসাদের মাহাত্ম্যে রামমণি দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন।

"অলপ বয়সে দুঃখিনী রামিনী,
সেবাতে নিযুক্ত হোল।
চণ্ডীদাস কহে, শশীকলার ন্যায়
ক্রমে বাড়িতে লাগিল।"

নিয়ত শ্রীমন্দিরে থাকিয়া রামমণি বড়ই শুদ্ধমতি হইয়া উঠিলেন; তাঁহার হৃদয়ে ক্রমে ভক্তির সঞ্চার হইল। গ্রামের সকলেই তাঁহার কার্য্যে প্রীতিলাভ করিলেন।

"রামিনী কামিনী, কাজেতে নিপুণা,
সকলের প্রিয়তমা।"

রামমণির বিবাহ করিতে বা অন্য পতি গ্রহণ করিতে আর ইচ্ছা রহিল না। কিন্তু দৈবের বিচিত্র সংঘটন—চণ্ডীদাসের সহিত রামমণির কামগন্ধহীন প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণ প্রীত্যর্থে রামমণির সঙ্গ করিয়াছিলেন এবং তাহাতে কামগন্ধ ছিল না। রামমণিকে চণ্ডীদাস কখন মাতা, কখন গুরু সম্বোধন করিয়াছেন নিম্নলিখিত পদ দুইটী তাহার প্রমাণ।

"শুন রজকিনী রামি!
ও-দুটি-চরণ, শীতল জানিয়া
শরণ লইনু আমি।
এবং এক নিবেদন, করি পুনঃ পুনঃ
শুন রজকিনী রামি।"

রজকিনীর কলঙ্কহেতু চণ্ডীদাস সমাজচ্যুত অবস্থায় ছিলেন; একদা তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ তাঁহাকে বলিলেন,—"শুন শুন চণ্ডীদাস। তোমা লাগিয়া আমরা সকলে ক্রিয়াকাণ্ডে সর্ব্বনাশ॥ তোমার পিরীতে আমরা পতিত, নকুল ডাকিয়া বলে। ঘরে ঘরে সব কুটুম্ব ভোজন করিঞা উঠা কুলে।" রামমণিও বাশুলী দেবীর প্রসাদান্নে বঞ্চিতা হইলেন—তিনি মিছা কলঙ্কে ম্রিয়মাণা হইয়া চণ্ডীদাসকে জানাইয়াছিলেন ঃ—

কি কহিব বঁধু হে বলিতে না জুয়ায়।
কাঁদিয়া কহিতে পোড়া মুখে হাসি পায়॥

অনামুখ মিন্‌সে গুলোয় কিবা বুকের পাটা।
দেবীপূজা বন্দ করে কুলে দেয় বাটা॥
দুঃখের কথা কৈতে গেলে প্রাণ কাঁদি উঠে।
মুখ ফুটে না বল্‌তে পারি মরি বুক ফেটে॥
ঢাক পিটিয়ে সহজবাদ গ্রামে গ্রামে দেয় হে?
চক্ষে না দেখিয়ে মিছে কলঙ্ক রটায় হে?
ঢাক ঢোলে যে জন সুজন নিন্দা করে।
ঝঞ্ঝনা পড়ুক তার মস্তক উপরে॥
অবিচার পুরী দেশে আর না রহিব।
যে দেশে পাষণ্ড নাই সেই দেশে যাব॥
বাশুলী দেবীর যদি কৃপাদৃষ্টি হয়।
মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়॥
আপনার নাক কাটি পরে বলে বোঁচা।
সে ভয় করে না রামী নিজে আছে সাঁচা॥—পদসমুদ্র

চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে রামীর রচিত একটী গীতিকা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। * ইহাতে জানা যায় চণ্ডীদাস গৌড়ের নবাবের রাজসভায় গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইয়া তথায় গমন করেন। সেই গানে বেগম মুগ্ধ হইয়া যান এবং চণ্ডীদাসের গুণের অনুরাগিনী হন। নবাবের নিকট তিনি নির্ভীক ভাবে এই কথা স্বীকার করেন। নবাবের আদেশে চণ্ডীদাস হস্তী-পৃষ্ঠে আবদ্ধ হইয়া দারুণ কষাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

---

* "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি সম্বলিত একটি প্রমাণ বসন্ত বাবু সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা রামীর রচিত একটী গীতিকা। কবিতাটী "সাহিত্যপরিষদের" পুস্তকাগারে আছে। ২১৭ পৃষ্ঠা।

তাঁহার আত্মীয়,বন্ধুবর্গের সমক্ষে এইরূপ কষাঘাত করিয়া তাহার প্রাণ হননের দণ্ডাজ্ঞা ছিল সুতরাং রামী ও বেগম সকলেই কবির এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়াছিলেন। চণ্ডীদাস মৃত্যুকালে সমস্ত শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও রামীর দিকে দুইটী নিশ্চল চক্ষের প্রেমের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বেগম এই দৃশ্য দর্শন করিয়া মূর্চ্ছিতা হন। সেই মূর্চ্ছা তাঁহার ভঙ্গ হইল না। বেগমের মৃত্যুতে রামীর হৃদয় শ্রদ্ধাতে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি মৃত দেহের পদযুগল স্পর্শ করিয়া শোক-প্রকাশ করিলেন। এই অপূর্ব্ব শোক-গীতিকা হইতে ইহাও জানা যায় যে চণ্ডীদাসও বেগমের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। রামী অনুযোগ দিয়া বলিতেছে, "বাশুলী তোমায় শুধু আমাকে ভালবাসিতে বলিয়াছিলেন, তুমি তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে কেন? * * * একটি দেশব্যাপী জনশ্রুতি যখন দুই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তলিপি সম্বলিত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হইতেছে, তখন তাহা আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা দেখিতেছি না। রাণী বাদসাহকে বলিয়াছিলেন—যাঁহার সুস্বরে ভুবন মুগ্ধ—যিনি প্রেমের মূর্ত্তিমান বিগ্রহস্বরূপ, তাঁহাকে সামান্য মানুষ মনে করিও না। রামী বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি রাজপাটে বসিয়াও প্রেমের আস্বাদ পায় নাই, তাহার জীবন নিরর্থক।"

রামীর পদ

(১) "কোথা যাও ওহে, প্রাণ বঁধু মোর, দাসীরে উপেক্ষা করি।
না দেখিয়া মুখ, ফাটে মোর বুক ধৈরয ধরিতে নারি॥
বাল্যকাল হতে, এ দেহ সঁপিনু, মনে আন নাহি জানি।
কি দোষ পাইয়া, মথুরা যাইবে, বল হে সে কথা শুনি॥
তোমার এ সারথি, ক্রূর অতিশয়, বোধ বিচার নাই।
বোধ থাকলে, দুঃখ-সিন্ধু-নীরে, অবলা ভাসাইতে নাই॥

পিরীতি জ্বালিয়া, যদি বা যাইবা, কবে বা আসিবে নাথ।
রামীর বচন, করহ শ্রবণ, দাসীরে করহ সাথ॥"

(২) "তুমি দিবাভাগে, লীলা অনুরাগে, ভ্রম সদা বনে বনে।
তাহে তব মুখ, না দেখিয়া দুঃখ, পাই বহু ক্ষণে ক্ষণে॥
ত্রুটী সমকাল, মানি সুজঞ্জাল, যুগ তুল্য হয় জ্ঞান।
তোমার বিরহে, মন স্থির নহে, ব্যাকুলিত হয় প্রাণ॥
কুটিল কুন্তল, কত সুনির্ম্মল, শ্রীমুখ-মণ্ডল শোভা।
হেরি হয় মনে, এ দুই নয়নে, নিষেধ দিয়াছে কেবা॥
যাহে সর্ব্বক্ষণ, হয় দরশন, নিবারণ সেহ করে।
ওহে প্রাণাধিক, কি কব অধিক, দোষ দিয়ে বিধাতারে॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার, সুহৃৎ কে আছে আর।
খেদে রামী কয়, চণ্ডীদাস বিনা, জগৎ দেখি আঁধার॥"

চণ্ডীদাসের মৃত্যু

কাঁহা গেয়ো বন্ধু চণ্ডিদাস।
চাতকী পিয়াসীগণ না পাইয়া বরিষন
না আনের নাগরে নিয়াস॥
কি করিল রাজা গৌড়েশ্বর।
না জানিঞা প্রেম লেহ, ব্রেথাই ধরিস দেহ
বধ কৈলে প্রাণের দোসর॥
কেনে বা সভাতে কৈলে গান।
স্বর্গ মঞ্চ (১) পাতালপুর, আবির্ভূত পশু নর
মানিনীর না রহিল মান॥

---

(১) মঞ্চ=মর্ত্ত্য।

রামী

গান শুনি পাৎসার বেগম
রাজারে কহে জানিঞা মরম ॥
রাণি মনঃ কথা রাখিতে নারিল।
চণ্ডিদাস মনে প্রিত করিতে হইল চিত
তার প্রিতে আপন খুয়াল্যা ॥
রাজা কহে মন্ত্রিরে ডাকিয়া।
তরার্ণিত হস্তি আনি পিঠে পেলি বান্ধ টানি
পিষঠ খুদে বৈরী ছাড় গিয়া। (২)
আমি অনাথিনী নারী মাধবির ভালে ধরি
উচ্চস্বরে ডাকি প্রাণনাথ।
হস্তি চলে অতি জোরে ভালস্তে (৩) না দেখি তোরে
মাথা এ পড়িল বজ্রাঘাত।
রাণি কহে, ছাড়িয়া না জায় (৪)
কহিতে কহিতে প্রাণ আর দেহ সমাধান
দুঁহু প্রাণ একত্রে মিলায় ॥ ১ ॥
স্বন প্রিয় রজকিনি আসকে হারালঙ প্রাণী
এবার তরাবে তুমি মোরে।
বেগম সহিত লেহ হা নাথ খুয়ালে দেহ
প্রাণে মাল্য (৫) এ রাজা গুঁয়ারে (৬)।
আসকে লভিতে প্রাণ তখনি করিলে গান
কেমনে জানিব হেন হবে।

১। পেলি=ফেলি। (২) পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া শত্রুকে বধ কর। (৩) ভালস্তে=ভাল করিয়া। (৪) জায়=যেও। (৫) মাল্য=মরিল। (৬) গুঁয়ারে=নিষ্ঠুর।

বৈরি শত ডংসে (৭) গায় চেতন পাই এ তায়
তোমারে ডাকি এ আত্মাভাবে।
এই করি স্বাস মনে উর্ধবারিতে পতিত জনে
তবে সে দুর্ল্লভ মানি প্রীত।
নতুবা ফুরাল্য দায় বৈরী চোটে প্রাণ যায়
কে য়ার করিবে মোর হীত।
কান্দি কহে চণ্ডিদাস দশ দসার আস
পুন্নু কর রজক কুমারি।
নহিলে একলা জাই সঙ্গে মোর কেহ নাই
কাছে য়াস্য তবে প্রাণে মরি ॥ ২ ॥
সুন বন্ধু চণ্ডিদাস দুখিনিরে সঙ্গে করি লেহ ॥ ধ্রু ॥

চঞ্চল স্বভাব তোর চিত
সভাতে গাইলে গীত
মনের মরম করি সার।
অনুরাগে কি না করিলে ফুৎকার।
পাতি হাট বসাত্যে না দিলে।
আসক আনলে পড়াইলে॥
বৈরি কাটে তোমা গায়
তুমি সে আনন্দ বাস তায়॥
মোর অঙ্গ সব ছেতি হেল।
রুধিরে বসন ভিজ্যা গেল॥

---

(৭) ডংসে=দংশে।

পরসিত এ জনার মন।
কতেক করাহ কদর্থন (১)॥
রামি কহে যদি সঙ্গে নিবে,
তুরিতে পরাণ তেজ তবে॥ ৩॥
স্থন প্রাণনাথ চণ্ডিদাস তার নির্ব্বন্ধন।
দৈবের কর্ম্মফাঁস না হয় খণ্ডন॥
ছাড়ি পরিবার মোর সঙ্গ কর
সভারে কহিলে সত্য।
বাস্থলি বচন না কৈলে সঙরণ
তাহাতে মজাল্যে চিত্ত
আমা মুখ চাঞা গজপিষ্টে স্থঞা
রয়্যাছ বন্ধন পাকে।
রাজা গৌড়েশ্বর দুষ্ট কলেবর
কেহনা বুঝাল তাকে॥
নাথ আমি সে রজক বালা
আমার বচন না শুনে রাজন
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা
মুগ্ধ কলেবর হইল জর্জ্জর
দারুণ সঙ্গান ঘাতে
এ দুজ্ঝ দেখিয়া বিদরএ হিয়া
অভাগিরে লেহ সাথে॥

(১) কদর্থন=কষ্ট।

কহেন রামিনী স্থন গুণমণি
জানিলাঙ তোমার রীতি।
বাশুলি বচন, করিলে লংঘন
স্থনহ রসিক-পতি ॥ ৪ ॥
পাৎসার বেগম কয়
স্থন মহিনাথ মহাশয়
তুমি অবলার বচন রাখ।
রসিক মণ্ডল দেখ ॥
আমি সে অবলা নারি।
তোমারে কহি এ বিনয় করি ॥
যোড় করে কহে রামি।
স্থন নৃপ চূড়ামণি।
স্থন রসের স্বরূপ সে
কেন বিনাশ করহ তাহার দে।
সে সামান্য মানুষ নহে।
রতি স্থিতি তার দেহে
যাহার স্থস্বর গানে।
বিন্ধিল আমার প্রাণে ॥
কেন কৈলে এমন কাজ
ভুবনে রাখিলে লাজ
রাজা হে যবন জাতি।
কি জানে রসের গতি।
চণ্ডিদাস করি ধ্যান।
বেগমে তেজিল প্রাণ।

স্থনি শ্রস্তা (১) ধাবিনি (২) ধায়
পড়িল বেগম পায় ॥ ৫ ॥

একখানি পাতা, উপকরণ—তুলোট কাগজ। আকার ১৫১/২ × ৫ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ পংক্তি, অক্ষর প্রাচীন। সাহিত্য-পরিষদ পুস্তকাগারে রক্ষিত। যে পর্য্যন্ত অন্য কোনও মহিলা কবির পরিচয় না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত আমরা অনায়াসেই রামী ধোপানীকেই বঙ্গদেশের সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। চণ্ডীদাস চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কাজেই আমরাও রামীকে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া উল্লেখ করিতে দ্বিধার কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। যদিও বর্ত্তমান সময়ে রামীর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই অনেকে সন্দেহ করিয়া আসিতেছেন।

(১) শ্রস্তা—ত্রস্তভাবে। (২) ধাবিনি—ধুবনী, রজক-কন্যা।
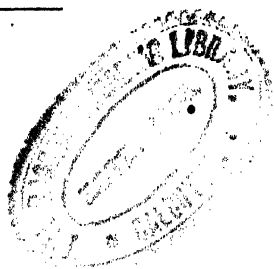
চন্দ্রাবতী

এই মহিলা কবির আবিষ্কারের জন্য আমরা ময়মনসিংহ গীতি-কবিতা সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয়ের নিকট ঋণী। চন্দ্রাবতী পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কবি পদ্মপুরাণ রচয়িতা দ্বিজ বংশী বা বংশীবদনের একমাত্র কন্যা। চন্দ্রাবতী কৃত রামায়ণেই এই পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। চন্দ্রাবতী তাঁহার রচিত রামায়ণে এইরূপ ভাবে পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

"ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়।
বসতি যাদবানন্দ করেন তথায়॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম, অঞ্জনা ঘরণী।
বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনি॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়।
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

*　　　　*　　　　*

দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে।
ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে॥
ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি।
আকর ভেদিয়া পড়ে উছিলার পাণি॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে।
চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়ীতে দরিদ্র জালা কষ্টের কাহিনী।
তার ঘরে জন্ম লৈল **চন্দ্রা** অভাগিনী॥

সদাই মনসাপদ পূজে ভক্তিভরে।
চাল কড়ি পান কিছু মনসার বরে॥

* * *

দূরিতে দরিদ্র দুঃখ দিলা উপদেশ।
ভাসান গাহিতে স্বপ্নে করিল আদেশ॥
মনসাদেবীরে বন্দি করি করযোড়।
যাহার প্রসাদে হোল সর্ব্ব দুঃখ দূর॥
মায়ের চরণে মোর কোটি নমস্কার।
যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার॥
শিব শিব বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী।
যার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি॥

* * *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়।
পিতার আদেশে গীতা রামায়ণ গায়॥

বন্দনায় চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন ঃ—

সুলোচনী মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা।
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥

চন্দ্রাবতীর জীবনের ইতিহাসটি বড় করুণ। "চন্দ্রাবতী পরমা সুন্দরী ছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে কবিতা রচনা করিতেন। দেশময় তাঁহার সঙ্গীত, কবিতা রচনা ও সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহার পাণিগ্রহণে উৎসুক হইলেন, কিন্তু চন্দ্রাবতীর প্রাণের দেবতা ছিলেন তাঁহার স্বগ্রামবাসী যুবক জয়ানন্দ। উভয়ে একত্র লেখা-পড়া করিতেন, খেলা করিতেন। কালক্রমে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ে

কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। সে সকল কবিতা তাঁহাদের উভয়ের ভালবাসার দান প্রতিদান। ক্রমে তাঁহারা অন্যান্য বিষয় লইয়াও কবিতা রচনা করিতে থাকেন। দ্বিজ বংশীকৃত পদ্মপুরাণে উভয়েরই রচনা আছে। প্রণয় যখন গাঢ় হইয়াছিল, চন্দ্রাবতী তখন মনে মনে তাঁহার প্রাণের দেবতার পদে সমস্ত জীবন যৌবন ঢালিয়া দিলেন। বিবাহের কথাবার্ত্তা একরূপ স্থির হইয়া গেল, এমন সময় এক বিষম অনর্থ ঘটিল। অলক্ষ্য হইতে নিদারুণ বিধাতা কল ঘুরাইলেন। মূর্খ যুবক এক মুসলমান রমণীর প্রেমে আত্মবিক্রয় করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিল। সে বুঝিল না কি অমূল্য রত্নই হেলায় হারাইল!"

অদৃষ্টের সেই ঘাত-প্রতিঘাতে চন্দ্রাবতীর কোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বহু দিন পরে মন স্থির করিয়া শিবপূজায় মনোনিবেশ করিলেন। তিনি স্নেহময় পিতার চরণে দুইটি প্রার্থনা জানাইলেন, একটি নির্জ্জন ফুলেশ্বরী তীরে শিবমন্দির স্থাপন, অন্যটি তাঁহার চিরকুমারী থাকিবার বাসনা। কন্যাবৎসল পিতা উভয় প্রার্থনাই পূর্ণ করিলেন। সেই সঙ্গে তিনি দুহিতাকে সংসারের সুখ-দুঃখের অনিত্যতা বুঝাইয়া দিলেন। চন্দ্রাবতী কায়মনোবাক্যে শিববন্দনা করিতেন ও অবসর কালে রামায়ণ লিখিতেন। তাঁহার এই রামায়ণ এখনও ময়মনসিংহের কোন কোন অঞ্চলে মুখে মুখে গীত হইয়া থাকে, মুদ্রিত হয় নাই। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের কুলবালাগণ সূর্য্য-ব্রতের দিন উদয়াস্ত পর্য্যন্ত এই রামায়ণ সুরে গান করিয়া থাকেন। * এখানে চন্দ্রাবতীর রামায়ণ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

---

* শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে লিখিত এবং ১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যার সৌরভে প্রকাশিত মহিলা কবি চন্দ্রাবতী শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে এই মহিলা কবির জীবনী সঙ্কলিত হইল।

শয়ন মন্দিরে একাগো সীতাঠাকুরাণী
সোণার পালঙ্গপরে গো ফুলের বিছানী।
চারিদিকে শোভে তার গো সুগন্ধী কমল,
সুবর্ণ ভৃঙ্গার ভরা গো সরযূর জল।
নানাজাতি ফল আছে সুগন্ধে বসিয়া,
যাহা চায় তাহা দেয় গো সখীরা আনিয়া।
ঘন ঘন হাই উঠে গো নয়ন চঞ্চল,
অল্প অবশ অঙ্গ গো মুখে উঠে জল।
উপকথা সীতারে শুনায় আলাপিনী,
হেনকালে আস্‌লে তথায় গো কুকুয়া ননদিনী।
কুকুয়া বলিছে বধূ গো মম বাক্য ধর।
কিরূপে বঞ্চিলা তুমি গো রাবণের ঘর ?
দেখি নাই রাক্ষসে গো শুনিতে কাঁপে হিয়া,
দশমুণ্ড রাবণ রাজা গো দেখাও আঁকিয়া।
মূর্চ্ছিত হইলা সীতা গো রাবণ নাম শুনি,
কেহবা বাতাস দেয় গো কেহ মুখে পাণি।
সখীগণ কুকুয়ারে করিল বারণ,
অনুচিত কথা তুমি গো বল কি কারণ।
রাজার আদেশ নাই বলিতে কুকথা,
তবে কেন ঠাকুরাণীর গো মনে দিল ব্যথা।
প্রবোধ না মানে গো কুকুয়া ননদিনী;
বার বার সীতারে বলয়ে সেই বাণী।
সীতা বলে আমি তারে গো না দেখি কখন,
কিরূপে আঁকিব আমি গো পাপিষ্ঠ রাবণ।

যত করি বুঝান সীতা গো কুকুয়া না ছারে,
হাসি মুখে সীতারে সুধায় বারে বারে।
বিষলতার বিষফল বিষগাছের গোটা,
অন্তরে বিষের হাসি গো বাঁধাইল লেঠা।
সীতা বলে দেখিয়াছি ছায়ার আকারে,
হরিয়া যখন দুষ্ট লয়ে যায় মোরে।
সাগর জলেতে পরে গো রাক্ষসের ছায়া,
দশমুণ্ড কুড়ি হাত রাক্ষসের কায়া।
বসে ছিল কুকুয়া গো শুইল পালঙ্কতে,
আবার সীতারে কয় গো রাবণ আঁকিতে।
এড়াতে না পারে সীতা গো পাখার উপর
আঁকিলেন দশমুণ্ড গো রাজা লঙ্কেশ্বর।
শ্রমেতে কাতর সীতা গো নিদ্রায় ঢলিল;
কুকুয়া তালের পাখা গো বুকে তুলে দিল।

"চন্দ্রাবতী এই রামায়ণ শেষ করিতে পারেন নাই। সীতার বনবাস পর্য্যন্তই লিখিয়াছিলেন। ইতি মধ্যে আর এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। সেই প্রণয়ী যুবক চন্দ্রাবতীর দর্শনপ্রার্থী হইলেন। এক পত্র লিখিলেন। চন্দ্রাবতী পিতাকে সমস্ত জানাইলেন। পিতা অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, তুমি যে দেবতার পূজায় মন দিয়াছ তাহারই পূজা কর। * * চন্দ্রাবতী যুবককে একখানা পত্র লিখিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন এবং সর্ব্বদুঃখহারী ভগবান শিবের চরণে মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে উপদেশ দিলেন। অনুতপ্ত যুবক পত্র পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ চন্দ্রাবতীর স্থাপিত শিব-মন্দিরের অভিমুখে ছুটিল। চন্দ্রাবতী তখন শিবপূজায় তন্ময়, মন্দিরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ। হতভাগ্য যুবক আসিয়াছিল চন্দ্রাবতীর কাছে

দীক্ষা লইতে, অনুতপ্ত দুর্ব্বিসহ জীবন প্রভুপদে উৎসর্গ করিতে। কিন্তু পারিল না, চন্দ্রাবতীকে ডাকিতেও সাহস হইল না। আঙ্গিনার ভিতর সন্ধ্যামালতীর ফুল ফুটিয়াছিল, তাহারই দ্বারা কবাটের উপর চার ছত্র কবিতা লিখিয়া চন্দ্রাবতীর নিকট, বসুন্ধরার নিকট শেষ বিদায় প্রার্থনা করিল।"

"পূজা শেষ করিয়া চন্দ্রাবতী দ্বার খুলিয়া বাহির হইলেন। আবার যখন দ্বার রুদ্ধ করেন তখন সেই কবিতা পাঠ করিলেন, পাঠ করিয়াই বুঝিলেন দেবমন্দির কলঙ্কিত হইয়াছে। চন্দ্রাবতী জল আনিতে ফুলিয়ার ঘাটে গেলেন, যাইয়া বুঝিলেন, সব শেষ হইয়া গিয়াছে, অনুতপ্ত যুবক ফুলিয়ার স্রোতধারায় নিজের জীবনস্রোত ভাসাইয়া দিয়াছে। * * ইহার পর চন্দ্রাবতী আর কোন কবিতা লিখেন নাই, এইরূপে রামায়ণ অপরি-সমাপ্ত রহিয়া গেল। তারপর একদিন শিবপূজার সময় সহসা তাহার প্রাণবায়ু মহাশূন্যে মিলাইয়া গেল।"

চন্দ্রাবতীর গান পূর্ব্ব ময়মনসিংহের সর্ব্বত্র সুপ্রচারিত। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় বলেন—"শ্রাবণের মেঘভরা আকাশতলে ভরা নদীতে যখন বাইকগণ সাঁজের নৌকা সারি দিয়া বাহিয়া যায়, তখন শুনি সেই চন্দ্রাবতীর গান, বিবাহে কুলকামিনীগণ নববরবধূকে স্নান করাইতে জলভরণে যাইতেছে—সেই চন্দ্রাবতীর গান, তারপর স্নানের সঙ্গীত, ক্ষৌরকার বরকে কামাইবে তাহার সঙ্গীত, বরবধূর পাশাখেলা, তার সঙ্গীত সে কত রকম।" পাশাখেলার একটী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা হইল।

কি আনন্দ হইল সইগো রস বৃন্দাবনে,
শ্যামনাগরে খেলায় পাশা মনমোহিনীর সনে।
আজি কি আনন্দ……।

উপরে চান্দোয়া টাঙ্গান নাচে শীতলপাটি,
তার নীচে খেলায় পাশা জমিদারের বেটি।
আজি কি আনন্দ……।

*　　　　*　　　　*

চন্দ্রাবতী কহে পাশা খেলায় বিনোদিনী
পাশাতে হারিল এবার শ্যামগুণমণি!
আজি কি আনন্দ……।

মনসাদেবীর কথা ও রামায়ণ ছাড়া চন্দ্রাবতী "মলুয়া" 'কেনারাম' প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা বংশীদাস যখন ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র ভাসান গানের দল লইয়া গান গাহিয়া বেড়াইতেন সে সময়ে সেই প্রদেশ ধন-ধান্যশালী ও সমৃদ্ধ ছিল, চন্দ্রাবতী লিখিয়াছেন—

"বাথানে মহিষ আর পালে যত গাই।
কত যে চরিত তার লেখাজোখা নাই।"

কিন্তু হইলে কি হয়? জেলায় তখন ঘোর অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল, আমরা চন্দ্রাবতীর রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"টাকা পয়সা রাখে লোক মাটিতে পুতিয়া।
ডাকাত কাড়িয়া লয় গামছা মোড়া দিয়া॥
ডাকাত দেশের রাজা পাতসায় না মানে।
উজাড় হইল রাজ্য কাজির শাসনে॥
ভয় পাইয়া সবে ছাড়ে যে লোকালয়।
ধনে প্রাণে মরে প্রজা চন্দ্রাবতী কয়॥" *

---

* বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৪২২—২৩ পৃষ্ঠা। শ্রীযুত দীনেশচন্দ্র সেন। পঞ্চম সংস্করণ।

"দ্বিজ বংশীদাস কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটওয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকৃত "মনসামঙ্গল" ১৪৯৭ শকে অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দে শেষ হয়। মনসামঙ্গলে চন্দ্রাবতী ও তাঁহার প্রণয়ী জয়চন্দ্র বা জয়ানন্দের অনেক কবিতা আছে। বংশী, স্বীয় কন্যার সাহায্যে এই পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। মনসামঙ্গল রচনার সময় চন্দ্রাবতীর বয়ঃক্রম অন্যূন ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে ১৪৭২ শকে অর্থাৎ ১৫৫০ খ্রীঃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বংশীদাস, বৃন্দাবন দাস ও লোচনদাসের সমসাময়িক কবি এবং চন্দ্রাবতী বয়সে তরুণ হইলেও সেই সময়ে কবি-প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

আনন্দময়ী

এই মহীয়সী বিদুষী মহিলা কবি বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সাধক কবি বিলদায়নীয়া (রাজনগরের) অধিবাসী লালা রামগতি সেনের কন্যা। আনন্দময়ীর মাতার নাম কাত্যায়নী দেবী। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দময়ী জন্মগ্রহণ করেন। রামগতি নিজহস্তে কন্যার শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া কন্যাকে সুশিক্ষিতা করিতে সম্পূর্ণরূপে পারগ হইয়াছিলেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে পয়গ্রামবাসী প্রভাকরবংশীয় রূপরাম কবিভূষণের পুত্র অযোধ্যারাম সেনের সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। "লালা রামপ্রসাদ পৌত্রী ও তাঁহার পতিকে যে বৃত্তি প্রদান করেন, তাহা কৌতুকস্বরূপ 'আনন্দীরাম সেন' বলিয়া অভিহিত হয়; পতি-পত্নীর নামের যোগে এই অদ্ভুত সঙ্কর নামের উদ্ভব হয়। অযোধ্যারাম সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পত্নীর বিদ্যার খ্যাতি তাঁহার যশঃলোপ করিয়াছিল।"

আনন্দময়ীর বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, রাজনগর গ্রামবাসী পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশের পুত্র হরিদেব বিদ্যালঙ্কার আনন্দময়ীকে শিবপূজা পদ্ধতি লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে ভ্রম থাকায় আনন্দময়ী বিদ্যাবাগীশ মহাশয়কে পুত্রের অধ্যয়ন সম্বন্ধে অমনোযোগী বলিয়া ভৎর্সনা করিতে ত্রুটী করেন নাই। মহারাজ রাজবল্লভ যখন অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করেন, তখন তিনি যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞ-কুণ্ডের প্রতিকৃতি চাহিয়া রামগতি সেনের নিকট পত্র লিখেন, সেই সময়ে রামগতি সেন মহাশয় পুরশ্চরণে নিযুক্ত থাকায় স্বয়ং পুস্তক হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়া দিতে অসমর্থ হন। তিনি এ বিষয়ের ভার কন্যা আনন্দময়ীর উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, কারণ কন্যার বিদ্যাবত্তার সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। আনন্দময়ী যথাসময়ে পিতৃ আদেশ অনুযায়ী সমুদয় প্রমাণ ও প্রতিকৃতি স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পরে রাজ-সভায় এই বিষয়ের আলোচনা হইলে সকলেই তাহা বিশ্বাস করিলেন। কারণ আনন্দময়ীর পাণ্ডিত্য তখন সর্ব্বজনবিশ্রুত ছিল। বিশেষ সভাস্থ পণ্ডিত কৃষ্ণধন বিদ্যাবাগীশ মহাশয় আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন।

আমরা এখন আনন্দময়ীর কবিত্ব সম্বন্ধে পরিচয় দিব। আনন্দময়ী তদীয় খুল্লতাত, জয়নারায়ণকে হরিলীলা গ্রন্থ প্রণয়ন সম্বন্ধে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। আমরা এস্থলে "হরিলীলা" হইতে আনন্দময়ীর রচনার পরিচয় দিতেছি। সওদাগর পুত্র চন্দ্রভানুর সহিত সুনেত্রার "বাসি বিবাহ" উপলক্ষে কবির বর্ণনা শুনুন।

"হের চৌদিগে কামিনী লক্ষে লক্ষে।
সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে॥
কতি প্রৌঢ়া রূপা ওরূপে মজন্তি।
হসন্তি, স্খলন্তি, দ্রবন্তি, পতন্তি॥

কত চারুবক্ত্রা সুবেশা, সুকেশা।
সুনাসা, সুহাসা, সুবাসা, সুভাষা ॥
কত ক্ষীণমধ্যা, শুভাঙ্গা, সুযোগ্যা।
রতিজ্ঞা, বশীজ্ঞা, মনোজ্ঞা, মদজ্ঞা ॥
দেখি চন্দ্রভানে, কত চিত্তহারা।
নিকারা, বিকারা, বিহারা, বিভোরা ॥
করে দৌড়াদৌড়ি, মদমত্ত প্রৌঢ়া।
অনূঢ়া, বিমূঢ়া, নবোঢ়া, নিগূঢ়া ॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ড পৃষ্টা।
প্রহৃষ্টা, সচেষ্টা, কেহ ওষ্ঠদষ্টা ॥
অনঙ্গাস্ত্রবিদ্ধা, কত স্বর্ণ বর্ণা।
বিকীর্ণা, বিশীর্ণা, বিদীর্ণা, বিবর্ণা ॥
কারো ব্যস্ত বেণী, নাহি বাস বক্ষে।
কারো হার কুর্পাস্ পরিস্রস্ত কক্ষে ॥

*　　*　　*　　*

কারো বাহু বল্লি কারো স্কন্ধ দেশে।
রহিয়া সাধু বাক্য বক্তে্র প্রকাশে ॥
সুকক্ষে, নিতম্ব উর হেম কুম্ভে।
এভাবে ওভাবে হাটিতে বিলম্বে ॥
তাহে দোলিতা লাজভারি ভরেতে।
পরে হেলি ঢুলি অনঙ্গ জ্বরেতে ॥
সুনেত্রাকে কেহ, কেহ চন্দ্রভানে।
করে সেক তোয়ে সবে সাবধানে ॥
সুহস্তে ঢালিছে সর্ব্ববারি অঙ্গে।

ঝনৎ ঝনৎ নলৎ গমৎ গলৎ পড়ে নীর অঙ্গে ॥
সখি চন্দ্রভানে বলে চাতুরীতে।
এ রত্নের মালা কাকের গলেতে ॥
শুনি চাতুরী দম্পতি হেট মাথে।
চলাচল গলাগল সখী সর্ব্বতাতে ॥

আমাদের দেশে পূর্ব্বে বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি মাঙ্গলিক উৎসবে রমণীগণ মিলিয়া সমস্বরে সঙ্গীত করিতেন, তাহাদের উলুধ্বনি সহকারে এই সমুদয় সঙ্গীতের মধুর স্বর-লহরী একদিন সত্য সত্যই বিশেষ উপভোগ্য ছিল। পূর্ব্বে এবং বর্ত্তমান সময়েও অধিকাংশ স্থলেই আনন্দময়ীর বিরচিত সঙ্গীতই গীত হইত। আমরা এখানে তাহারও একটী উল্লেখ করিলাম।

বিবাহের গান

যাত্রা করি রঘুনাথ করিলেন গমন।
জানকী করিতে বিয়া চলেন নারায়ণ ॥
পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে জনক রাজার বাড়ী।
রঘুনাথ করিবেন বিয়া জনক কুমারী ॥
সর্ব্বলোকবলে ধন্য সীতার জননী।
তাহাকে দিবেন সেবা দেব রঘুমণি ॥
নারীগণে বলেন রাণী শুনগো বচন।
সীতারে সাজাও সাজে কৌশল্যানন্দন ॥
সীতারে সাজায়ে রাণী রতি করি দুর।
কঙ্কন মেখলা দিল পঞ্চম নূপুর ॥
নাসায় বেসর দিল শিরে শিরোমণি।
ঠেকীতে তরুয়া যেন ধরিয়াছে ফণী ॥

তাহার পরে পরাইল তার কেঙুর।
আভরণ জ্বলে সীতার শশী করি দূর॥
মণিময় আভরণ পরাইল শেষে।
রঘুনাথ বরিতে গেলেন মনের হরিষে॥
বিচিত্র সেউতি পুষ্প সীতাদেবী থিটে।
গগনে ঠেকিয়া পৈল রামের মুকুটে॥
বিচিত্র পঙ্কজ পুষ্প গন্ধ মনোহর।
উদয়ে ফুলের জ্যোঃতি জিনি নিশাকর॥
পঙ্কজের দল জিনি জানকীর হাত।
ভ্রমর গুঞ্জরে পাশে হাসেন রঘুনাথ॥
ভ্রমর বলে শশী নয়নোদয় পদ্মবর।
শশধর হৈলে হেথা আসিত চকোর॥
রাম বামে জানকীর বিবাহ হইল।
কৃত্তিকা সহিত যেন শশী লুকাইল॥
বিবাহ হইল সীতার রাম বামে বসি।
লাজে লুকাইল তখন শরদের শশী॥
বিবাহ হইল সাঙ্গ যজ্ঞ সমাপন।
পাণিগ্রহ সাঙ্গ কৈল কৌশল্যানন্দন॥
অপূর্ব্ব বসন্ত ঋতু মদনের সখা।
যাহে নব নব কুসুমের দেখা॥
বিকসিত রসাল—মঞ্জরী নানা মতে।
ফলিত মল্লিকা কলি কত শতে শতে॥
স্তবকের ভরে নত কুসুমের লতা।
যেন গুরু কুচভরে নিতম্ব নিলতা॥

পৃথিবী রজতময় হইয়াছে কিশোরে ॥
কিংশুকে ভুবন পূর্ণ স্বর্ণ অলঙ্কারে ॥
কুসুমের বনে কত কত অলিকুল ।
গুণ গুণ শব্দ করে গন্ধেতে আকুল ॥
মলয় কন্দর হইতে মন্দ সমীরণ ।
বিরহিণীর যম হেতু বহে ঘন ঘন ॥
কারো হার খুলি ঘুরায় বারে বার ।
কেহ খসাইয়া পুনঃ দেয় অলঙ্কার ॥
কদলী বেদীতে রাম জানকী আনিয়া ।
কত নাট কত জাট করে বিনাইয়া ॥
শুভক্ষণে সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়া রঘুপতি ।
সীতা সঙ্গে ঘরে চলেন অতি হৃষ্ট মতি ॥

অন্নপ্রাশনের গীতের নমুনা,—

"ছয় মাসের রঘুনাথ জননীর কোলে ।
কেলী করে দেখে রাজা মন কুতূহলে ॥
নব শশী জিনি কান্তি বাড়ে দিন দিন ।
কত পূর্ণ শশী মুখ হেরিয়া মলিন ॥
অন্নপ্রাশনের হেতু কৈলা অনুমতি ।
আসিলেন বশিষ্ঠ ঋষি অতি হৃষ্ট মতি ॥
শুভ তিথি বার আর নক্ষত্র বিহিত ।
বিচারিয়া শুভক্ষণ কহেন পুরোহিত ॥
নানা মত করিলেন মঙ্গল রচন ।
নানা স্থানে নাচে গায় যত বামাগণ ॥

আনন্দময়ীর সহজ রচনার নমুনাও এখানে একটু দিতেছি। স্বামী চন্দ্রভানু ব্যবসায় উপলক্ষে ডিঙ্গা সাজাইয়া শ্বশুরের সহিত প্রবাসে গমন করিয়াছেন, তখন বিরহিণী সুনেত্রা বিরহ-ব্যথায় ব্যথিতান্তঃকরণে বলিতেছে ঃ—

————আসি দেখহ নয়নে।
হীনতনু সুনেত্রার হয়েছে ভূষণে।
হয়েছে পাণ্ডুর গণ্ড, রুক্ষ কেশ প্রতি
ঘরে আসি দেখ নাথ এসব দুর্গতি॥
রহিয়াছি চির বিরহিণী দীন মনে।
অর্পণ করিয়া আমি তোমা পথ পানে॥

*   *   *   *

*   *   *   *

ভাবি যাই যথা আছ হইয়া যোগিনী।
না সহে এ দারুণ বিরহ আগুনি॥
যে অঙ্গে কুঙ্কুম তুমি দিয়াছ যতনে।
সে অঙ্গে মাখিব ছাই তোমার কারণে॥
যে দীর্ঘ কেশেতে বেণী বাঁধিছ আপনি।
তবে জটাভার করি হইব যোগিনী॥
শীত ভয়ে যে বুকেতে লুকায়েছ নাথ।
বিদারিব সে বুক করিয়া করাঘাত॥
যে কঙ্কণ করে দিয়াছিলা হৃষ্ট মনে।
সে কঙ্কণ কুণ্ডল করিয়া দিব কাণে॥
তব প্রেমময় পাত্র ভিক্ষা পাত্র করি।
মনে করি হরি স্মরি হই দেশান্তরী॥

তাতে মাতা প্রতিবন্ধ বাহিরিতে নারি।
আর তব স্থাপ্য-ধন বিষম যৌবন॥
লুকাইয়া নিয়া ফিরি দরিদ্র যেমন।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' লেখক ডাক্তার শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বলেন—"ইহার অব্যবহিত পরেই রমণী কবির দৃষ্টি শব্দালঙ্কারের প্রতি পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অলঙ্কার দেখাইবার স্পৃহা রূপসীগণের স্বাভাবিক, আনন্দময়ী নূতন কোন অপরাধ করেন নাই, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত রচনা পড়িয়া আনন্দময়ীর অলঙ্কারস্পৃহা পাঠক কি স্ত্রীলোক-সুলভ রোগ বলিতে ইচ্ছা করিবেন?—"পতি শোকসাগরে, না দেখিয়া নাগরে, ফিরে যেন সাগরে ডাক ছাড়ি। হইয়ে জীবশেষা, বিগলিতবেশা, লটপটকেশা, ভূমে পড়ি।"

এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে যে, জয়নারায়ণ এক দিবস কাব্যরচনায় এতদূর দৃঢ় মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন যে, বেলা দ্বিতীয় প্রহর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার স্নানাহারের কথা মনে ছিল না। আনন্দময়ী খুল্লতাতকে স্নানাহারাদি করিতে অনুরোধ করিলেন। কবি জয়নারায়ণ বলিলেন যে, আর অতি সামান্য অবশিষ্ট আছে ভগবানের দশ অবতার সংক্ষেপে বর্ণনা হইলেই তিনি উঠিবেন। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রীর ঐকান্তিক অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে না পারিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া স্নানাহার করিতে গমন করিলেন। এই অবসরে আনন্দময়ী লিখিলেন,—

"জলজ বনজ যুগ যুগ তিন রাম।
খর্ব্বাকৃতি বুদ্ধদেব কল্কি সে বিরাম।

এত সংক্ষেপে আর কেহই এরূপ ভাবে ভগবানের দশরূপ বর্ণনা করেন নাই। স্ত্রীলোকের কেশের বর্ণনা অনেকেই করিয়াছেন কিন্তু—

কুটিল কুন্তল তার, বন্ধন শঙ্কায়।
নিতম্বে পড়িয়া পদ ধরিবারে ধায়॥ সুন্দর নয় কি?

আনন্দময়ী যেরূপ সুশিক্ষিতা ছিলেন, তদ্রূপ বিনীতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। পতির প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। পতির মৃত্যুর সময়ে আনন্দময়ী পিত্রালয়ে ছিলেন, যখন তিনি এই হৃদয়বিদারক সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার পুত্র, কন্যা, ভাই ভগ্নী কাহারো নিমিত্ত মমতা রহিল না, আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া সত্বর অনুমৃতার আয়োজন করিলেন। পরিশেষে স্বামীর কাষ্ঠ পাদুকা হৃদয়ে ধারণ করিয়া জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। যতদিন পর্য্যন্ত মহিলা কবিগণের কাব্যের আদর থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত আনন্দময়ীর কবিত্ব-প্রতিভা উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় কাব্যগগন আলোকিত করিবে।

গঙ্গাদেবী

গঙ্গামণি দেবী লালা রামপ্রসাদের কন্যা ও লালা জয়নারায়ণ ও লালা রামগতির ভগিনী। গঙ্গাদেবী আনন্দময়ীর সমসাময়িক। বিবাহ সময়ে গাহিবার উপযুক্ত বহু মঙ্গল গান তিনি রচনা করিয়াছিলেন। এক সময়ে সে সকল সঙ্গীত বিশেষ আদরেরও ছিল। কিন্তু কালবশে গঙ্গামণির সে সমুদয় সুমধুর সঙ্গীতাবলি বিলুপ্ত প্রায়। আমরা গঙ্গামণি দেবীর একটী খণ্ডিত গান প্রকাশ করিলাম। ইহা হইতেই তাঁহার রচনা নৈপুণ্য ও কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই গানটীতে সীতার বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

জনক নন্দিনী সীতা হরিষে সাজায় রাণী।
শিরেশোভে সিঁথিপাত, হীরা, মণি, চুণী॥

নাসার অগ্রেতে মতি বিম্বাধর পরি।
তরুণ নক্ষত্র ভাতি জিনি রূপ হেরি॥
মুকু গা দশন হেরি লাজে লুকাইল।
করীন্দ্রের কুম্ভ মাঝে মজিয়া রহিল॥
গলে দিল থরে থরে মুকুতার মালা।
রবির কিরণে যেন জ্বলিছে মেখলা॥
কেয়ূর, কঙ্কণ দিল আর বাজুবন্ধ।
দেখিয়া রূপের ছটা মনে লাগে ধন্দ।
বিবিত্র ফলিত শঙ্খ ফুল পরিচিত।
দিল পঞ্চ কঙ্কণ পৈছি বেষ্টিত॥
মনের মত আভরণ পরাইয়া শেষে।
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে॥

আমাদের দেশে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে মহিলারা কিরূপ অলঙ্কার পরিয়া সেকালের পুরুষদের মন ভুলাইতেন ইহা হইতে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

দ্বিজ-তনয়া

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একজন মহিলা কবির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি তাঁহার নাম ও পরিচয় প্রদান করেন নাই শুধু 'দ্বিজ তনয়া' নামে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যপরিষদ পুস্তকালয়ে দ্বিজ-তনয়া

প্রণীত "উর্ব্বশী" নামে একখানি নাটক আছে। নাটক খানার টাইটেল পেজ বা আখ্যাপত্র এইরূপ—

উর্ব্বশী নাটক

দ্বিজতনয়া প্রণীত

কলিকাতা,

শ্রীযুক্ত ডিরোজারিও কোম্পানির মুদ্রা যন্ত্রে প্রকাশিত।

সন ১২৭২—ইং ১৮৬৬

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

এই মহিলা কবি পুস্তকখানার 'বিজ্ঞাপন' পত্রে লিখিয়াছেন—"দণ্ডী-পুরাণে দণ্ডী রাজার বৃত্তান্ত সকলেই পড়িয়াছেন। ভগবান্ চক্রী কি প্রণালীতে সৃষ্টি পালন করেন, পুরাণকর্ত্তা এই গ্রন্থে তাহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্যাসদেব সমুদায় মহাভারতে ভগবান্‌কে চক্রীরূপে বর্ণন করিয়াছেন। ঈশ্বরের এতাদৃশ পরিচয় নব্যমতাবলম্বীদিগের মধ্যে অনেকের রুচি পীড়া জন্মায় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা জগতের নিয়ম সকল উন্মিলীত নয়নে দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, মহর্ষি এ বিষয়ে অভ্রান্ত কি না। দণ্ডী পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সেই বর্ণনা রক্ষা করিয়া দিয়াছেন। আমার নাটক পুরাণ অবলম্বন করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু সে কেবল প্রসঙ্গতঃ মাত্র। বিস্তৃত প্রস্তাবে ভগবানের বর্ণনার চেষ্টা পাওয়া কেবল মুনি ঋষিদিগেরই সম্ভবে। এই হেতু অধিক সাহস করি নাই।

দণ্ডীপুরাণের বৃত্তান্তে উর্ব্বশী ও দণ্ডী রাজাই প্রধান। আমিও নাটকে তাঁহাদেরই প্রধান্য রাখিয়াছি। সুতরাং আমার গ্রন্থে অপবিত্র প্রণয়ের ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু কেবল তাহা বলিয়াই সূক্ষ্মদর্শী পাঠকমণ্ডলী আমার গ্রন্থকে অনাদর করিবেন না।

এই নাটকে ভূরি ভূরি দোষ আছে, তথাপি আমি ইহাকে পাঠক সমাজে প্রেরণ করিলাম, **আমি অশিক্ষিত অবলা**, এই আমার প্রথম রচনা, এ কথা বলিয়া পাঠকগণের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে সাহসী হইনা। গ্রন্থমাত্রেই নিজ গুণে পরিচিত হয়; গ্রন্থকারের অবস্থা বিবেচনা করিয়া হয় না। পাঠক সমাজ অপক্ষপাত বিচারপতি সদৃশ। তাঁহাদের অনুগ্রহও নাই, নিগ্রহও নাই। অতএব বৃথা অনুনয় বিনয়ের ফল কি? তথাপি প্রবোধের নিমিত্ত এই এক ভরসা যে, যদিই আমার গ্রন্থ নিতান্ত নীরস হইয়া থাকে, তবে যে ইহা আপনিই অচিরাৎ লয় পাইবে, ও আমিও পাঠক মণ্ডলীর তিরস্কার হইতে উদ্ধার পাইব।

এই গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে অনেকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের সকলেরই নিকট চিরকাল অনুগৃহীত থাকিব। মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয় এই গ্রন্থ সংশোধনাদি দ্বারা অধিনীকে চিরবাধিত করিয়াছেন। রোজারিও কোম্পানীর মুদ্রা-যন্ত্রের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র দাস মহাশয় কত উপকার করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি না; অপর যে মহাশয় এই বিজ্ঞাপন রচনায় সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার নিকটেও অনুগৃহীত হইলাম।

দ্বিজ-তনয়া

বিজ্ঞাপনের মধ্য হইতে আমরা লেখিকার সম্বন্ধে কিছুই আত্ম-পরিচয় পাই না, কাজেই ইঁহাকে দ্বিজতনয়া নামেই পরিচিত করিলাম। উর্ব্বশী নাটকখানি চারিটি অঙ্কে বিভক্ত। পত্রাঙ্ক ৮৫। কোথাও অভিনীত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় নাই। লেখিকার কবিতা রচনার পরিচয় আমরা তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলির মধ্য হইতে বেশ পাই। এখানে কবির রচিত

কয়েকটী সঙ্গীত ও কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। প্রথম অঙ্ক—অমরাবতী। উর্ব্বশী স্বর্গ-চ্যুতা। উর্ব্বশীর অভাবে দেবরাজ ইন্দ্র বলিতেছেন—

বিনে সে উর্ব্বশী রূপসী, স্বর্গে কি আর শোভা আছে!
জীবন, নয়ন, মন, সুন্দরীর সঙ্গে গেছে॥
হায় সখা চিত্ররথ, আমার সে মনোরথ,
তাহে বিধি বিপরীত খেদে হৃদি বিদরিছে!
অভিশাপ দিলা মুনি, হয়ে ধনী তুরঙ্গিনী,
কাননেতে একাকিনী কিরূপেতে সে ভ্রমিতেছে!

বসন্ত আসিয়াছে। বসন্তের মধুর রূপ-মাধুরীতে রম্ভার চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে তাই মদন দেবকে সম্বোধন করিয়া গাহিতেছেন,—

বলি রতিপতি শোন্
নিবারণ করে দেরে মধুকরে
গুণ গুণ আগুন কেন করে বরিষণ॥
কুসুম সৌরভে রবে নারে প্রাণ,
সবে না শরীরে কোকিলের গান!
মলয় বাতাসে, মরিরে হুতাশে, হুতাশন সুধাকরের কিরণ!

উর্ব্বশী রাজার বিরহ-বেদন আশঙ্কায় বলিতেছেন—

তোমারি অধিনী আমি, গুণমণি জান মনে।
বিনা দেখা প্রাণ সখা, বিচ্ছেদে বাঁচি কেমনে॥
নিতান্ত তব আশ্রিতা, যেন মীন জলাশ্রিতা,
চকোরিণী হরষিতা সুধাকর দরশনে।
চাতকিনী ঘন ঘন চাহে যেন নব ঘন
তোমারি হে প্রাণ ধন, সদা ভাবি মনে মনে।

দণ্ডীরাজা উর্ব্বশীর এই প্রণয় নিবেদনের উত্তরে বলিতেছেন—

তোমাকে যে ভালবাসি, প্রেয়সি কি তা জাননা।
গেল রাজ্য, সে ঐশ্বর্য্য, তাহে করি না ভাবনা।
যাবত রব জীবনে, হব সুখী তব সনে,
অভিলাষ ছিল মনে, পূরিল না সে বাসনা।
নিরাশ হইনু যদি, যদি বিধি প্রতিবাদী,
তবে আর কারে সাধি কে নাশিবে এ যাতনা।

নিম্নে উর্ব্বশীর পুনরুত্তর প্রদত্ত হইল।

পয়ার

উর্ব্বশী। তবে আর প্রয়োজন নাহি এ জীবনে।
তেজিব জীবন আমি নাথ তব সনে॥
আমার বিচ্ছেদ তুমি সহিতে না পার।
সেই হেতু প্রাণ দিতে করিলে স্বীকার॥
আমার উপায় আর আছে কিহে সখা।
কি আশায় এত জ্বালা সয়ে প্রাণ রাখা॥
রেখেছিলে বহুদিন তোমার আশ্রমে।
প্রণয়ের পাশে মোরে বেঁধেছিলে ক্রমে॥
এখন তেজিয়ে তুমি প্রবেশিবে জলে।
দহিতেছে এ হৃদয় ঘোর দুখানলে॥
আমাদের প্রণয়েতে বাদী হন হরি।
কিন্তু তাঁরে দেখাইব প্রাণ পরিহরি॥
তথাপি না ছাড়াছাড়ি হবে তব সহ।
কে সহিবে বিচ্ছেদের যাতনা দুঃসহ॥

ভালবাসা হবে আশা করেছিনু মনে।
গেল দুঃখ হল সুখ, রব তব সনে॥
সেইত অমরাবতী যথা মন সুখ;
ভুলেছিনু সকলি হে চেয়ে তব মুখ॥
যে বদন ইন্দুনাথ শুকাইল ত্রাসে।
অভিমানে নয়ন কমল নীরে ভাসে॥
প্রাণের অধিক ভালবেসেছি যে জনে।
তাহার এতেক কষ্ট সহিব কেমনে॥
কেমন করিয়া আমি নয়নে দেখিব।
জীবন তেজিবে মোর জীবন বল্লভ॥
আজ্ঞা কর প্রাণনাথ ঘুচাই যাতনা।
আর কেহ কার লাগি ভাবিতে হবে না॥

এই ক্ষুদ্র নাটকখানির মধ্যে আর যে কয়েকটী সঙ্গীত ছিল এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

বসন্ত-গীত

সুখ বসন্ত কালে
সুখে সারী শুকে, থাকে মুখে মুখে, মনের সুখে ডাকে,
ডালে কোকিলে॥

কুসুমকাননে অশোক করবী
গন্ধরাজ আর মল্লিকা মাধবী,
মুঞ্জরিছে কলি, গুঞ্জরিছে অলি, সুখে সরোজিনী
ভাসে সলিলে।

এ সুখ নিশিতে, হাসিতে খুসিতে, রতিপতি রসে ভাসিতে ভাসিতে,
যুবক যুবতী মন সুখি অতি, বিরহিণী ভাসে চক্ষের জলে।

(উর্ব্বশীকে দেখিয়া গীত)

মরি কিবা চমৎকার হেরিনু নয়নে।
জগত জুড়িয়া আলো করে এ রমনী ধনে॥
ছদ্মবেশে তুরঙ্গিনী, হয়েছিল এ কামিনী,
পূর্ব্বজন্ম ফলে দণ্ডী লভেছিল কাননে।
অনুমান হয় ধনী, না হইবে মায়াবিনী, বরষি
আনন্দসুধা মোহিছে জগত জনে।

উর্ব্বশী-বিদায় উপলক্ষে দণ্ডীরাজ বলিতেছেন ঃ—

কি কব মনেরই কথা, সকলি রহিল মনে।
এমন হইবে শেষে, না জানি কখন জ্ঞানে॥
কি আর জানাব আমি, জানেন অন্তরযামী,
শুনিয়া তোমার বাণী, যে করে আমার প্রাণে।
করেছিনু এক আশা, ঘটিল আর এক দশা,
বিষম স্বপন ধনী, দেখালে অধীন জনে॥

বিরহ-ব্যথিতা নারী গাহিতেছেন,—

মরি মদন হুতাশে।
করে পঞ্চবাণ, করিয়ে সন্ধান, বিরহিণীর প্রাণ, বধিতে এসে॥
পিক মধুকর তাহার কিঙ্কর, করের কারণে পীড়ে নিরন্তর;
পূর্ণশশধর, যেন বিষধর, বিষদৃষ্টি করে থেকে 'আকাশে।
ত্রাসে করযুড়ে করিগো মিনতি, বলি রতিপতি, শুনরে দুর্গতি;
যে ছিল সংগতি, নাইরে'সংহতি,আছি বিচ্ছেদব্রতী পতি বিদেশে॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য যুগে দ্বিজ-তনয়া ব্যতীত অপর কোন মহিলা কবি বিরচিত কোন মুদ্রিত কিংবা অপ্রকাশিত রচনার বিষয় জানিতে না পারায় ইঁহার বিষয়ই প্রথমে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী

ইংরাজী শিক্ষার শুভ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশে যে মহীয়সী মহিলা বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া যশস্বিনী হইয়াছেন, যাঁহার প্রতিভা, কবিত্ব-খ্যাতি শুধু বঙ্গদেশে নয় বঙ্গের বাহিরেও প্রচারিত, সেই বিদুষী স্বর্ণকুমারী দেবী পরম পূজ্যপাদ স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা। ইংরাজী ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং বাঙ্গালা ১২৬৫ সালের ভাদ্রমাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষালের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। জানকী বাবু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন; পরে কংগ্রেসের সম্পাদক ও দেশহিতৈষী কর্ম্মীরূপে খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

সেকালের অন্তঃপুর-শিক্ষার ইতিহাস স্বর্ণকুমারীর নিজের ভাষায় উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা হইতেই পাঠক পাঠিকা বুঝিতে পারিবেন সেকালে বাঙ্গালা দেশে অন্তঃপুর শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ ছিল এবং কিরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া স্বর্ণকুমারীকে সাহিত্য সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছিল।

স্বর্ণকুমারী দেবী বলিতেছেন—"যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন, তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও পুত্রবধূগণ, তাঁহার ভগিনী ভাগিনেয়ীগণ প্রভৃতি সকলেই এক বাড়ীতে তখন বাস করিতেন। এই বহু পরিবারের কেহ মূর্খ ছিলেন না। বরঞ্চ ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী ছিলেন।" এই পরিবারের মধ্যে যে অধিক দিন হইতেই শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত ছিল ইহা হইতে তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থ স্বর্ণকুমারীর স্বামী তাঁহাকে বোম্বাই রাখিয়া আসেন। তখন তিনি অতি সামান্যই ইংরাজী জানিতেন। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া তিনি তথায় এক বৎসর কাল ছিলেন। স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীজাতির শিক্ষা ও সংস্কার সম্বন্ধে যখন অত্যন্ত মনোযোগী হইয়াছিলেন—স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষালও তাঁহাকে সে সময়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহপূর্ণ বাণী যে স্বর্ণকুমারীর কত দ্বিধা ও সঙ্কোচ দূর করিয়া তাঁহাকে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার সহায়তা করিয়াছিল তাহা তাঁহার The Fatal garland নামক ইংরাজি পুস্তকের ভূমিকায় বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছেন। এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"It was my loving and revered father, Maharshi Devendra Nath Tagore, who had prepared me for my life's career by giving me an education unusual for Hindu girls of those days. Still, but for the help and encouragement given to me by my beloved husband, I do not think that it would have been possible for me to venture so far. It was he who moulded and shaped me in the fashion that the outside world knows to-day, and under his loving guidance I passed through stormy waves of literary life as easily and pleasantly; as a good swimmer through a rough sea. And though he is not present with me in the body to-day, yet his benign spirit still works in me and through me, and I feel his helping hand in every struggle and hear his prompting voice in each good resolution. The deep love of literature that he fostered in me urged me to accept the responsibility of editing one of the most

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

intellectual magazines of the day ; and the joy of the mental freedom that he enabled me to taste gave an impetus to my desire to share with and spread among my countrymen and countrywomen the ever-growing development and enlightenment of our progressive age.

ছেলেবেলা হইতেই স্বর্ণকুমারী প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক প্রতিভাবলে সাহিত্যানুরাগিণী হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার যখন অতি শৈশব তখন তিনি ছড়া বাঁধিয়া কবিতার ছন্দে কথা বলিতেন এবং সে ছন্দের মিল অতি সহজ সরলভাবে সম্পন্ন করিতেন। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ছিল তাঁহার সকলের চেয়ে বেশি, কেহ বাঁশী বাজাইতেছে শুনিলে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন—তখন তাঁহার প্রাণে আপনা হইতেই কল্পনার বিচিত্র সুন্দর ছবি ফুটিয়া উঠিত। আপনা হইতেই গানের সুর কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিত। কাহারও শিক্ষা এবং উপদেশ ব্যতিরেকেই তিনি গাহিতে পারিতেন এবং নব প্রচলিত হারমোনিয়াম বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। একদিন তিনি আপনার মনে সম্পূর্ণ অতর্কিত ভাবে গান গাহিতেছেন এমন সময় হঠাৎ সেখানে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"স্বর্ণ! তুমি এমন সুন্দর গাইতে পার তাত জানিতাম না।"

১২৯১ সালে প্রায় ছয়চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্ণকুমারী দেবী যখন শ্যাম-বাজার অঞ্চলে কাশিয়াবাগান বাগান বাটীতে অবস্থান করিতেন তখন ১২৯১ সালে 'ভারতীর' সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ১১ বৎসর কাল সম্পাদন করিবার পর শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ তিনি সে ভার ১৩০২ সালে কন্যাদ্বয়ের হস্তে ন্যস্ত করেন। ১৩১৫ সালে তিনি পুনরায় সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন এবং ১৩২২ সালে স্বামীর পরলোক গমনে অবসাদগ্রস্ত

হওয়ায় স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর উহার ভারার্পণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। স্বর্ণকুমারী দুইবারে মোট আঠারো বৎসর কাল 'ভারতী' সম্পাদন করিয়াছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম গদ্য সাহিত্যের দিক্ দিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার সঙ্গীত ও কবিতা পুস্তকের সংখ্যাও কম নহে। এখানে তাঁহার লিখিত কাব্য পুস্তকাবলীর নাম দেওয়া গেল। গাথা, কবিতা ও গান, বসন্ত-উৎসব (গীতিনাট্য) দেবকৌতুক ও যুগান্ত (কাব্যনাট্য), কনে বদল এবং গীতি-গুচ্ছ। তাঁহার বিরচিত সঙ্গীত ও কবিতা পাঠ করেন নাই বাঙ্গালী সমাজে এমন পুরুষ ও নারী অতি অল্পই আছেন। তাঁহার—

নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে,
কম্পিত পল্লব দক্ষিণ বাতে,
পেখল সজনি সতিমির রজনী
অম্বরে চন্দ্র ন তারকা ভাতে,
ঝিল্লী ধ্বনি কৃত, বন পরিপূরিত,
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।

এই সঙ্গীতটি সর্ব্বজনবিদিত ও সর্ব্বজনপ্রিয়। প্রথম যাহারা গান করিতে বা হারমোনিয়মে বাজাইতে শিক্ষা করেন তাঁহারা প্রায় সকলেই এই গানটিই প্রথম শিক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার রচিত গাথার বিষাদপূর্ণ গল্পগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। এক সময়ে তাঁহার বিরচিত গাথা এবং কবিতা ও গান বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

একদিন তিনি দেবী ভারতীকে বন্দনা করিয়া গাহিয়াছিলেন—

ওগো কমল-আসনা, রঙ্গিনী-বীণাপাণি !
আমি কাহারেও আর জানি না, ভারতি
তোমারেই শুধু জানি।

ওগো মধুর ছন্দা, হৃদয়ানন্দা
জানি না প্রভাত, না জানি সন্ধ্যা—
তোমারি পর্ব্বে অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
আমি জানিনাত তাহা ভাল কি মন্দ,
বাস হীন কিবা মধুর গন্ধ,
শুধু প্রীতি পূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি।
আমি না চাহি অন্য বিভব ঋদ্ধি
চাহি না মুক্তি, চাহি না সিদ্ধি
তোমারি প্রসাদ লভিবারে সাধ
তোমারি অমৃত বাণী।

তাঁহার এই সাধনা, দেবী বীণাপাণি পূর্ণরূপে সার্থক করিয়াছেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গাথা' বাঙ্গালা সাহিত্যে একখানা উপাদেয় কবিতা গ্রন্থ। ইহাকে কথা কবিতা নাম দিলেই ইহার উপযুক্ত পরিচয় দেওয়া হয়। গাথার প্রথম প্রকাশের তারিখ সন ১২৮৭ সাল। ঠিক্ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালী-কিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ বইখানা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে উপহৃত।

সাশ্রুসম্প্রদান, সাধের ভাসান, খড়্গ-পরিণয়, অভাগিনী এই চারিটি গাথায় এই গাথার কলেবর গ্রথিত। ইহার মধ্যে খড়্গ-পরিণয় গাথাটি ঐহিতাসিক কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

গাথায় কবির কবিত্ব অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাষা সুন্দর, বর্ণনা সুন্দর এবং ছন্দের গতি সহজ ও সরল। ঐ সময় বাঙ্গালা

সাহিত্যে এইরূপ গাথা কেহই রচনা করেন নাই। বর্ণনা এত সুন্দর যে, একবার মাত্র পড়িলেই চক্ষের সম্মুখে চিত্রটি ফুটিয়া উঠে। প্রত্যেকটি কাহিনী বিয়োগান্ত। প্রেমের ব্যর্থতা ও বিষাদময় চিত্র অঙ্কনে কবি বিশেষ কৌশলের পরিচয় দিয়াছেন। এই রচনার মধ্যে কবি বিহারী-লালের আদর্শানুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কে ওই ললনা শান্ত জ্যোতির্ম্ময়ী
দাঁড়ায়ে প্রাসাদ শিখরোপরি ?
মধুর ঝলকে, শুকতারা যেন,
উষাতে আকাশ উজল করি।

তেজোময় বটে, নহে তীব্র তেজ·
প্রখরতা গেছে বিষাদে ঢাকি,
স্নিগ্ধ মাধুরীতে স্নিগ্ধ চারিদিক,
ওরূপে নাহিক ঝলসে আঁখি।

এলোথেলো দীন পাগলিনী বেশ,
শূন্যে উড়ি উড়ি ছড়ায় কেশ,
নিরাশামাখান মধুর মুখানি,
অটল গম্ভীর যোগিনী বেশ।”

বাঙ্গালা সাহিত্যে ঝড় তুফানের বর্ণনা বিরল। গাথায় যে ঝড়ের বর্ণনাটি আছে তাহা আমাদের কাছে অতি সুন্দর লাগিয়াছে।

মেঘে মেঘে মেঘে, ছেয়েছে আকাশ
দেখা নাহি যায় চাঁদিমা আর,
নদীর উরসে, ঢেউ সাথে ঢলি
খেলেনা জোছনা রজতধার।

মৃদুল পবন বহেনাকো আর,
গাছের একটী পাতা না নড়ে,
বহে কিনা বহে, তটিনী কে জানে
ঢেউতো একটী নাহিক পড়ে।
আঁধার আকাশ, স্তম্ভিত ধরণী,
মন্ত্র-স্তব্ধ যেন চারিটি ধার,
কি বিপ্লব কথা, নীরবে কহিছে
থাকে না বুঝি বা জগৎ আর।

* * *

সহসা অশনি কড় মড় কড়
ঘোষিল ভেদিয়া আঁধার নিশি,
নিবিড় জলদ, ভীম গরজনে
সঘনে কাঁপায়ে তুলিল দিশি।
বীর পরাক্রমে, এদিকে ওদিকে
মাতিয়ে বহিল পবন রাশি,
ধাঁধিয়ে দিগন্ত বেড়াইছে ছুটে
সুবিকট ঐ দামিনী হাসি।
নাহি সে তটিনী, প্রশান্ত মূরতি,
সংহার মূরতি ধরেছে এবে।
সফেন তুফানে আক্রমিছে বেলা,
দুর্দ্দাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিছে সবে। ইত্যাদি।

কবির গল্প বলিবার কৌশল এবং মনের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া দিয়া ভবিষ্যতের বিষাদময় চিত্র আঁকিবার ইঙ্গিতটুকু তাঁহার রচনা নৈপুণ্যের নিদর্শন। নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু হইতে তাহা উপলব্ধি হইবে।

বিজন একটি বনের মাঝারে
কালের কালিমা মাখিয়ে গায়,
দাঁড়ায়ে একটি কালিকা মন্দির
অনিত্যের স্থির প্রতিমা প্রায়।

ভেঙ্গে গেছে তার শিখর প্রদেশ
ঝর ঝর ইট পড়িছে খসি,
বট অশথের গভীর শিকড়
রহেছে তাহার মরমে পশি।

ভিতরে কালিকা—করাল মূরতি,
সিঁদূরে কপাল ঢেকেছে তাঁর,
চন্দন চর্চ্চিত ভীষণ কৃপাণ,
গলায় দুলিছে জবার হার।

আঁধার সে বনে মন্দির মাঝারে
নিভ, নিভ, এক প্রদীপ জ্বলে,
লক্ষ্য করি তায় যুবক যুবতী
বহু দূর হতে আসিছে চলে।

বহু পথ হাঁটি, বহু শ্রম করি,
বহু সাধ আশা করিয়া মনে
শ্রান্তি ক্লান্তিময় নলিনী ও যুবা
পশিল সেই সে গভীর বনে।

স্বর্ণকুমারীর কবিতা ও গানে প্রায় শতাধিক খণ্ড কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাই সরল এবং মিষ্টি। ছোট কথায় ভাবের প্রকাশ বস্তুতঃই

বঙ্গের মহিলা কবি

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী

রমণীয়। তাঁহার প্রণয় কবিতাগুলি রসমাধুর্য্যে ঢল ঢল করিতেছে। এখানে আমরা তাঁহার রচিত দুইটি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিলাম।

সে কেমনে চলে যায়!
আমার ত দেখিলে তাহায়, শুধু দেখিলে তাহায়,
শুধু মুখপানে চেয়ে প্রাণ উঠে উথলিয়ে,
শতবার হৃদিমাঝে বিদ্যুতের লহরী খেলায়।
সদা ভয়ে ভয়ে সারা, বুঝি পড়িলাম ধরা,
হৃদয়ের ভাব বুঝি নয়নে প্রকাশ পায়!
সেত বুঝিতে না পারে, শুধু যাই যাই করে
মনে মন না বুঝিলে কে বোঝাবে কায়!
আমি বড় ভালবাসি সে মুখের হাসি,
মলিন দেখিলে মুখ বুক ফেটে যায়;
তবু সাধ যায় সখি, একবার দেখি,
সে প্রাণে বেজেছে ব্যথা না দেখে আমায়!
দেখিতে পাইনে বলে হৃদয়ে বেদনা জ্বলে,
সখি এ হেঁয়ালি বল কে বোঝায়!

তাঁহার বিরচিত "এখনো এখনো প্রাণ সে নামে শিহরে কেন!" ত সর্ব্বজন পরিচিত সঙ্গীত। নিম্নোদ্ধৃত সঙ্গীতটি কি ভাবে, কি ভাষায়, কি গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রেমসঙ্গীতসমূহের সহিত স্থান পাইতে পারে।

এমন যামিনী, মধুর চাঁদিনী
সে শুধু গো যদি আসিত!
পরাণে এমন আকুল পিয়াসা;
যদি সে শুধু গো ভালবাসিত!
এ মধু বসন্ত; এত শোভা হাসি,
এ নব যৌবন, এত রূপ রাশি,

সকলি উঠিত পুলকে বিকাশি,
সে শুধু গো যদি চাহিত।
মিথ্যা তুমি বিধি! মিথ্যা তব সৃষ্টি,
বৃথা এ সৌন্দর্য্য নাহি যদি দৃষ্টি
যদি হলাহলে-ভরা প্রেম সুধা মিষ্টি,
কেন তবে প্রাণ তৃষিত!

সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবব্যঞ্জক কীর্ত্তি মাসিক পত্র সম্পাদন। তিনি যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত 'ভারতীর' পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১৩২২ সালের চৈত্র মাসে স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী' সম্পাদনের গুরুতর ভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি বিদায়গ্রহণ উপলক্ষে যে কথা কয়টি বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণযোগ্য। তিনি লিখিয়াছিলেন—"পুরাতন চিরস্থায়ী নহে অথচ তাহার মৃত্যুও নাই। সে বর্ত্তমান নূতনে। পিতামাতা সন্তানে জীবিত, পূর্ব্বস্রোত পরবর্ত্তী স্রোতে প্রবাহিত, অতীত ভবিষ্যতে সম্মিলিত। নূতনে লীন হইতে না পারিলেই পুরাতনের প্রকৃত মৃত্যু। পুরাতনের প্রধান ধর্ম্ম নূতনকে অনুগামী করা অর্থাৎ পথ দেখান, অন্য কথায় নূতনকে গঠিত করিয়া তোলা। ইহাতে যে সফলতা লাভ করে তাহার জীবন সার্থক। আমার বহুদিনব্যাপী সাহিত্য সেবায় যদি এই উদ্দেশ্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সার্থক হইয়া থাকে তবেই আমি ধন্য। কিন্তু বিচারের ভারও নূতনের হস্তে।" নূতন এই বিচার করিয়াছে। তাঁহার সাহিত্য সাধনার ফল বর্ত্তমান সময়ে পূর্ণতা লাভ করিতেছে। স্বর্গীয় মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় স্বর্ণকুমারী দেবীর হস্ত হইতে যখন 'ভারতীর' সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন, তখন যে কথা বলিয়াছিলেন—আমরাও সেই সঙ্গে সুর মিশাইয়া বলিতে

পারি—"তিনি বাংলাদেশের নারীজাতির মুখোজ্জল করিয়াছেন; এবং বিশ্বনারী-সভায় বাঙ্গালী নারীকে বরেণ্য করিয়া তাঁহাদের গৌরব-আসন সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছেন।"

প্রথম জীবনে বাঙ্গালী তাঁহাকে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার উপযুক্তরূপ সম্বর্দ্ধনা না করিলেও বর্ত্তমানে তাঁহার প্রতিভার আদর করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান করিয়াছেন। বৈদ্য-বাটী সাহিত্য সম্মেলন তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছে এবং ১৩৩৬ সালের সাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রীরূপে বাঙ্গালা সাহিত্য-সেবিগণ তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার তরুণের ন্যায় অসাধারণ সাহিত্য সেবা বাঙ্গাল সাহিত্যে আদর্শস্থানীয় হইয়া থাকিবে। তিনি একদিন ভারতীর শ্রীচরণ পদ্মে যে অর্ঘ্য রচনা করিয়া দান করিবার আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, দেবী তাঁহার সেই অর্ঘ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর বিরচিত কুড়িখানা গ্রন্থমধ্যে কবিতা পুস্তক মাত্র পাঁচখানা। তাঁহার নাম কবি হিসাবে যতটা না পরিচিত—ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠা গল্প লেখিকা এবং ঔপন্যাসিক হিসাবে সমধিক প্রসিদ্ধি ও সাহিত্যক্ষেত্রে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সমাজের কল্যাণজনক কার্য্যের জন্যও উহাঁর নাম স্মরণীয় থাকিবে।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর দেশহিতকর অনুষ্ঠানটির কিছু উল্লেখ না করিলে তাঁহার জীবনকথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে কলিকাতায় সখিসমিতি নামে একটি স্ত্রী সম্মিলনী স্থাপন করেন। সমিতির প্রধানতঃ তিনটি উদ্দেশ্য। প্রথম, সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের সম্মিলনে তাঁহাদের মধ্যে সদ্ভাব বৃদ্ধি এবং সকলে একত্র হইয়া দেশহিতকর কার্য্যানুষ্ঠান। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, অনাথা বিধবাদিগকে ভরণ, পোষণ,

আশ্রয় ও শিক্ষাদানপূর্ব্বক শিক্ষয়িত্রীরূপে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী করা। তৃতীয় উদ্দেশ্য তাঁহাদের দ্বারা অন্তঃপুরে শিক্ষা বিস্তার। এই সমিতি হইতে মহিলা-শিল্প-মেলা নামক প্রতি বৎসর একটি মেলার অনুষ্ঠান হইত। অন্তঃপুরিকাদের নিকট ইহা একটি বিশুদ্ধ আনন্দের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিল; তাঁহারা ইহার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকিতেন। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। "রমণীতে বেচে; রমণীতে কেনে, লেগেছে রমণীরূপের হাট।" তাঁহার এই সদনুষ্ঠানের কার্য্যভার পরে তাঁহার কন্যাগণ গ্রহণ করিয়া পরিচালিত করেন।

জীবনের অপরাহ্নে স্বর্ণকুমারী বিষাদ-করুণ-সুরে গাহিয়াছেন—

শীতল শান্ত বেলা
শাল শ্যামল নদী সৈকত অম্বর মেঘ মেলা
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা!
বাতাস গাহিছে মর্ম্ম কাহিনী,
পাতায় পাতায় হৃদয় দাহিনী
করুণ হতাশ দোলা!
পান্থ আমি অতি শ্রান্ত একেলা বড় একেলা।
তলায় তলায় তরু বীথিকার ঘন কজ্জল ছায়া,
তার মায়া নাই তবু, মায়া নাই তার গো
অসহন দুঃখ জ্বালা,
বড় একেলা আমি বড় একেলা।

শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী

পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের চৌধুরী জমিদার বংশ উত্তর বঙ্গে প্রসিদ্ধ। এই গ্রাম পূর্ব্বে রাজসাহী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, এখন পাবনা জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই গ্রামে বহু জমিদারের বাস। তাঁহাদের মধ্যে বড় তরফ ও ছোট তরফ প্রধান। বড় তরফের ছোট কর্ত্তা স্বর্গগত দুর্গাদাস চৌধুরী পিতার মৃত্যুর পর জমিদারীর বেশীর ভাগ হস্তান্তরে গেলে গভর্ণমেণ্টের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করেন। প্রসন্নময়ী তাঁহার প্রথম কন্যা। দুর্গাদাস চৌধুরীর পুত্রেরা এক্ষণে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা সাত ভাই। ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা স্বর্গগত স্যার আশুতোষ চৌধুরী হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রসন্নময়ী স্যার আশুতোষের জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও প্রায় পাঁচ ছয় বৎসরের বড়। তাঁহার জন্ম ১৮৫৬।৫৭ সালে ১৪ই আশ্বিন। ইঁহার মাতামহ বংশ **বাগকাশীনাথপুরের** রায়েরা বাঙ্গালার দ্বাদশ ভূম্যধিকারিগণের অন্যতম। বংশ-মর্য্যাদায় এখনও বাগকাশীনাথপুরের রায়েরা বারেন্দ্র সমাজে প্রধান।

প্রসন্নময়ীর শৈশব অতি মধুর ছিল। নাটোরের মহারাণী কৃষ্ণমণি ইহার পিতামহীর সহোদরা ছিলেন। তিনি প্রসন্নময়ীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

যদিও সে সময় বর্ত্তমান কালের মত অন্তঃপুর শিক্ষার প্রচলন ছিল না এবং অধিকাংশ স্থলেই মেয়েরা লেখাপড়া শিক্ষা প্রয়োজন মনে করিতেন না, তথাপি হরিপুরের চৌধুরীবংশের মেয়েরা সকলেই কিছু না কিছু লেখাপড়া শিখিতেন। প্রসন্নময়ীর পিতৃ-স্বসারা রীতিমত পণ্ডিত

মহাশয়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। প্রসন্নময়ীর পিতা নিজেই প্রসন্নময়ীকে পড়াইতেন। তিনিও স্যার আশুতোষ একসঙ্গে পাঠাভ্যাস করিতেন।

বংশের নিয়মানুসারে তাঁহার দশ বৎসর বয়সে পাবনা গুণাইগাছা গ্রাম নিবাসী কুলীনশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণকুমার বাগচী মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু তিনি শ্বশুরালয়ে খুব কম দিন কাটাইয়াছিলেন। বিবাহের মাত্র দুই বৎসর পরেই তাঁহার স্বামী উন্মাদরোগগ্রস্ত হন। তদবধি তিনি চিরদিনই পিত্রালয়ে বাস করিতেন। এইরূপে অতি অল্প বয়স হইতেই তাঁহার জীবন বিষাদের হইয়াছিল এবং বলিতে গেলে চিরদিনই তিনি কোন না কোনরূপ দুঃখ পাইয়া আসিয়াছেন।

তাঁহার পিতা কন্যার এই মর্ম্মক্লেশ কিছু মাত্রায় দূর করিবার জন্য তাঁহাকে গৃহে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে মনস্থ করেন। প্রসন্নময়ীকে ইংরাজী ও গীতিবাদ্য শিখাইবার জন্য মেম শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন এবং নিজে তাঁহার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। ইংরাজী ও গীতিবাদ্য শিক্ষা যদিও বেশি দূর অগ্রসর হয় নাই, তথাপি প্রসন্নময়ী নিজের চেষ্টায় উত্তর বয়সে বেশ সুন্দর ইংরাজী শিখিয়াছেন।

জীবনের দুর্দ্দৈববশতঃ লেখাপড়া ভিন্ন তাঁহার সংসারে অন্য কাজ বিশেষ ছিল না; সুতরাং তিনি শৈশব হইতেই সাহিত্য চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। বারো বৎসর বয়সে তাঁহার কবিতা পুস্তক "আধ আধ ভাষিণী" প্রকাশিত হয়। সে সব কবিতা হইতেই **নবজীবনে** তাঁহার কাব্যশক্তি যেরূপ বিকাশ পাইয়াছে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তিনি যে যুগে লিখিতে আরম্ভ করেন তাহা বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্যের প্রারম্ভকাল। তিনি সেই সময়কার অনেক মাসিক পত্রে রচনা, গল্প ও কবিতা লিখিয়াছিলেন। এখনও তিনি "ভারতবর্ষ", "মানসী ও মর্ম্মবাণী" ও "মাতৃমন্দির"

কবি প্রসন্নময়ী

প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রায়ই লিখিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার রচিত ৺স্যার আশুতোষ চৌধুরীর জীবনী "মাতৃমন্দির" মাসিক পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। উক্ত রচনা হইতে সেকালের নানা কথা যাহা বর্ত্তমান যুগের তরুণের দল অজ্ঞাত তাহা জানিতে পারা যায়। ইংরাজীতে উহার অনুবাদ হইতেছে।

ইঁহার লিখিত কবিতা এবং গদ্য রচনার মধ্যে বিশেষত্ব আছে। বাঙ্গালা সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি গদ্য রচনা দ্বারা যে পুষ্পের সাজি উপহার দিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। সত্যই তাঁহার গদ্য লিখিবার ভঙ্গী বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি বিশেষ ধারা সৃষ্টি করিতেছে।

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু ইঁহার গ্রন্থাবলীর একজন অতি ভক্ত পাঠক ছিলেন। তিনি প্রসন্নময়ীকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন।

প্রসন্নময়ীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। নানা প্রকার জনহিতকর কার্য্যের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট এবং সকলের নিকটই পরিচিত। প্রসন্নময়ী ইঁহাকে জীবনে সুখী করিয়া নিজের বিষাদময় জীবনে একটু আলোক আনিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিধাতা তাহাতেও বাদ সাধেন। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁহার স্বামী ও একমাত্র পুত্রকে হারান। এইরূপে মা ও মেয়ে উভয়েই দুঃখ ও বিষাদে জর্জ্জরিত হইয়া পড়েন। প্রসন্নময়ীর রচিত গ্রন্থাবলী যথা—**'বনলতা'**, **'নীহারিকা'** ১ম ও ২য় ভাগ ও **'অশোকা'** এবং **'আর্য্যাবর্ত্ত'** প্রভৃতি। ইহার মধ্যে 'পূর্ব্বকথা' ও 'তারা চরিত' এই গ্রন্থ দুইখানা তাঁহার ও তাঁহার আত্মীয়স্বজনের ঘটনা লইয়া রচিত। শেষোক্ত দুই গ্রন্থ হইতে তাঁহার জীবন কিরূপ দুঃখ ও বিষাদের ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি ৺স্যার আশুতোষ চৌধুরী ও কর্ণেল মন্মথনাথ

চৌধুরী এই দুই ভ্রাতাকে হারাইয়াছেন। এই সব শোকে তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

প্রসন্নময়ী নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করিয়াছেন ঃ—

কবিতা ঃ—আধ আধ ভাষিণী, বনলতা ও নীহারিকা
(১ম ও ২য় ভাগ)

গদ্য ঃ—অশোকা (উপন্যাস—সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনা অবলম্বনে)
আর্য্যাবর্ত্ত—উত্তর ভারত ভ্রমণ-কাহিনী
পূর্ব্বকথা—সামাজিক ও পারিবারিক চিত্র
তারা চরিত—জীবনী

আমরা এখন তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাঁহার প্রথম পুস্তক 'আধ আধ ভাষিণী'। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ১২৭৬ সালে G. P. Ray & Co, Printers কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সে হিসাবে এ বইখানির বয়স দাঁড়াইতেছে—ষাট বৎসর। প্রসন্নময়ীর বয়স তখন ছিল মাত্র বারো বৎসর। এই ক্ষুদ্র বহিখানি ডিমাই ১২ পৃষ্ঠা মাত্র। মলাটে ছিল "অমৃতংবালভাষিতং"। "আধ আধ ভাষিণী" লেখিকা তাঁহার পরমারাধ্য পিতা শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের শ্রীচরণে সাদরে অর্পণ করিয়াছেন। ইহাতে সতেরটি ছোট ছোট কবিতা আছে। ষাট বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুপরিবারের একটি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকার রচনা কেমন ছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমরা এখানে একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

বসন্ত বর্ণন

"শীত ঋতু করে শেষ বসন্ত আইল।
হায় কি সুন্দর সাজে ধরণী সাজিল ॥
প্রকৃতি প্রকৃত বেশ ধরিল এখন।
হেরিয়ে প্রফুল্ল হলো ভাবুকের মন ॥

কোকিল আইল দেখ বসন্তের সাথে।
ভূলোক পুলক হলো সুখের আশাতে ॥
মলয় সমীর এবে বহে মন্দ মন্দ।
প্রকাশিছে ঋতুরাজাগমনে আনন্দ ॥
তুলশী মূঞ্জরি হয় আম্রের মুকুল।
নানা জাতি ফুল ফুটে সৌরভে আকুল ॥
কতরূপ ফল ফলে এ সময়ে হায়।
ফলের ভরেতে তরু বিনম্র দেখায় ॥
শিশির পড়িয়ে রাত্রে থাকে দূর্ব্বাদলে।
যেন ছেঁড়া মুক্তাহার তাহাদের গলে ॥
কতই অপূর্ব্ব শোভা এ সময়ে হায়।
বসন্তের শোভা দেখি নয়ন যুড়ায় ॥
ওহে প্রভু দয়াময় জগতের সার।
তোমার সৃষ্টির ভাব বুঝে উঠা ভার ॥"

সেকালের প্রচলিত পয়ার ছন্দের অনুকৃতিই এই কবিতায় দেখিতে পাইতেছি। প্রার্থনা কবিতায় সেকালের সামাজিক চিত্রের একটু আভাষ আমরা পাই।

"একেত অবলা নারী তাহে পরাধীনা।
কেমনে তোমারে পাবে এ সম্বলহীনা ॥
শ্বশুর শ্বাশুরীগণ সবে প্রতিকূল।
সতত থাকি হে নাথ ভয়েতে ব্যাকুল ॥

*　　*　　*

অতিশয় ভয়ানক দেশের আচার।
কতদিনে ব্রাহ্মধর্ম্ম হবে হে প্রচার ॥
যত সব ভদ্রলোক একত্রিত হয়ে।
আমোদ আহ্লাদ করে পুত্তলিকা লয়ে ॥

বিদরিয়া যায় হৃদি দেখে দেশাচার।
হবে নাকি এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মাচার॥"

প্রসন্নময়ীর দ্বিতীয় কবিতা গ্রন্থ 'বনলতা'। ১২৮৭ সালে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোংর বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। এই বহিখানা পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এখানাও লেখিকা আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে তদীয় পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে উৎসর্গ করিয়াছেন। পঁচিশটি খণ্ড কবিতা লইয়া এই গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ। ইহার মধ্যে তিনটি কবিতা ইংরাজী কবিতার অনুবাদ।

'বনলতা' লেখিকার তরুণ বয়সের রচনা। বনলতা প্রকাশিত হইবার পর লেখিকা সাহিত্য সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সেকালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক সুপণ্ডিত রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরাও যেমন ইহার প্রশংসা করেন তেমনি 'আর্য্যদর্শন', "Indian Nation", "The Indian Mirror", "Brahmo Public opinion", 'Calcutta Review' প্রভৃতি পত্রিকায়ও এই গ্রন্থের উৎসাহব্যঞ্জক সমালোচনা প্রকাশিত হয়। Calcutta Review'এর সমালোচক বলিয়াছিলেন—

The Banalata is from the pen of a Hindu (Brahmin) Lady who dedicates the work to her father. It consists of several short poems on a variety of subjects which bear the impress of a mind emancipated from the thraldom of Jati, Juti Mallika, Malti of bygone ages, and awakening to an appreciative perception of the beautiful, the grand and the sublime, not simply *in terrestrial* objects, but likewise in the phenomenal aspects of Nature, in all her immensity. The following lines will partially Mustrate our views, if they will not remind the reader *I anthe* in the Magic car of Shelly.

"রবি-শশী-তারা কল্পনা নয়ন
শারদ-কৌমুদী কল্পনা বরণ
কল্পনার কণ্ঠ বীণার নিক্কণ
কল্পনার খেলা সুখের স্বপন।"

জন্মভূমি কবিতা পড়িতে পড়িতে প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বের সমাজ-চিত্রের কথা মনে পড়ে। নারীজাতির কল্যাণের দিকে না চাহিয়া সমাজের দিকে চাহিয়া, কৌলিন্য ও দেশাচারকে বড় করিয়া দেখিয়া কেমন করিয়া শত শত কুসুমকোমলা নারীর জীবনের সর্ব্বনাশ করা হইত, এখানে তাহার একটু আভাস পাই।

"পরিণয় হার পরিয়া গলায়,
দিবানিশি কাঁদে তাহারি জ্বালায়,
সোণার প্রতিমা শোভা নাহি পায়;
মুকুতার হার বানর-গলায়।
জনক জননী, স্নেহের আশায়,
দুহিতার দুঃখ, না চিন্তিল হায়!
স্নেহ বিসর্জ্জিল দেশাচার পায়,
স্বর্গের কুসুম সঁপিল চাষায়।"

'বনলতায়' অনেক কবিতার মধ্যদিয়াই একটা দুঃখের সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'কেন জাগিলাম'—কবিতায় কবি স্বপ্নের ছবি হারাইয়া দুঃখ করিয়া বলিতেছেন,—

"আর কি দেখিব সেই সুখের স্বপন?
জীবনে কি সে চিত্রের পাব দরশন?
আজীবন কাঁদিবারে
জাগিলাম—মরিবারে,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মৃত্যু! নিরাশে অনল
জ্বলিবে, পিপাসা মন বাড়িবে কেবল।"

জগতে 'শিশুর হাসি'র তুলনা মিলে না। 'হাস' কবিতাটি বড় সুন্দর। শিশুর ঢল ঢল অরুণসম সুন্দর বদনের হাসি দেখিয়া কবি-চিত্ত-বিমুগ্ধ। শিশু যখন টলে, টলে, ঢলে ঢলে, আদরে গলিয়া,—

"হাসির তরঙ্গ তুলি,
চল তুমি দুলি দুলি,
বিমুগ্ধ হইয়া আমি থাকিরে চাহিয়া,
হাসির তরঙ্গে প্রাণ যায়রে ভাসিয়া।

তাই কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন ঃ—

এমন সুন্দর তুমি স্নেহের কুসুম,
পবিত্র জীবন ল'য়ে
চিরকাল সুখে র'য়ে,
থাকরে সংসারে শিশু উজ্জ্বলি জীবন,
জগতের শোকতাপ পেওনা কখন!"

হায়রে এই আশীর্ব্বাদ যদি সত্য হইত! 'বনলতার' কবিতাগুলি সেকালে যে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। সরল সহজ ভাষা, সুন্দর শব্দসম্পদ, সুরুচি সঙ্গত অভিব্যক্তি সে যুগের নূতন আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। কোন কোন কবিতায় দেশ-প্রীতি স্বতঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা 'বীরনারী লক্ষ্মীবাই'শীর্ষক কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কথার সমর্থন করিতেছি।

"রণবেশে মত্ত সতী নাচিছে সমরে রে
নাচিছে সমরে,
বিমুক্ত কুন্তলভার,
মুখে শব্দ মার মার,
তীক্ষ্ণ তরবার ওই শোভিতেছে করে, রে
শোভিতেছে করে।

অতুলিত রূপরাশি,
শরতের পৌর্ণমাসী,
রবি ছবি পরকাশি করিতেছে রণ, রে
করিতেছে রণ।" ইত্যাদি।

প্রসন্নময়ীর তৃতীয় গ্রন্থ—'নীহারিকা' ১২৯০ সালে কলিকাতা ১৪ নম্বর কলেজস্কোয়ারে এস্ কে লাহিড়ী কোং দ্বারা প্রকাশিত। এই হিসাবে এ বইখানার বয়স ছ'চল্লিশ বৎসর। নীহারিকার দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮১৮ শকে। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এই হিসাবে 'নীহারিকা' দ্বিতীয় ভাগের বয়স বত্রিশ বৎসর।

'নীহারিকা' প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় ভাগের কবিতাগুলির মধ্যেই কবির হৃদয়ের বেদনা প্রকাশিত। একটা বিষাদ রাগিণীর করুণ সুর প্রবাহিত। মানুষের জীবন লইয়াই মানুষের কাব্য ও কবিতা, এ কথা প্রসন্নময়ীর প্রত্যেকটি কবিতার ভিতরই প্রকাশ পাইতেছে। কবি কখন এই পৃথিবীর সুখ দুঃখের ক্ষণিক হাসির, ক্ষণিক আনন্দের মধ্যে আত্মহারা হইতেছেন। তখন দেখিতে পান—

"আকাশে নক্ষত্র আছে,
বারি-কোলে ঊর্ম্মি নাচে,
কুসুম সুরভিময়, শশধরে হাসি,
প্রদীপ্ত অরুণে সদা তীব্র-কর-রাশি
দামিনী বারিদ-কোলে,
তরুকণ্ঠে লতা দোলে,
ছায়া শীতলতাপূর্ণ, সমীরে জীবন,
তেমনি এ ভালবাসা-আত্মার মিলন!"

কিন্তু এ মিলনত চিরস্থায়ী হয় না! কেন না—

"সকলি স্বার্থের দাস, স্বার্থের ধরণী—
নিজ সুখে মুগ্ধ নর দিবস রজনী।"

তাই সাধ পূর্ণ হয় না। 'নীহারিকা' প্রথমভাগে মোট একুশটি কবিতা আছে। 'নীহারিকায়' তাঁহার কবিত্বশক্তি পূর্ণ বিকশিত। কল্পনা, ভাব ও ভাষা সে যুগের তুলনায় প্রশংসনীয়। 'স্নেহোপহার', 'সেই চন্দ্রালোকে' 'গাওরে আবার', 'আর্য্যনারী', 'জাহ্নবী সৈকতে', 'জীবনকাহিনী' আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'নীহারিকা দ্বিতীয় ভাগের কবিতার মধ্যে জীবনের নিগূঢ় রহস্য ব্যথা ইংরাজীতে যাহাকে বলে 'Criticism of life' তাহা বেশ দেখিতে পাই। মোট আটত্রিশটি কবিতাগুচ্ছ লইয়া নীহারিকা রচিত হইয়াছে।

কবির স্বদেশপ্রীত অনেক কবিতার মধ্যেই বর্ত্তমান। কখনও যমুনার কলপ্রবাহের মধ্যে কবি দেখিতে পাইতেছেন—

"দীপ্তিমান সৌভাগ্যের সে দিন অতীত
খুঁজিলে যমুনা প্রাণে,
মিলিবেনা বর্ত্তমানে,
ভারতের ইতিহাস আর্য্যের গরিমা,
বিলুপ্ত স্মৃতির ছবি জাহ্নবী যমুনা।
আঁধার সৈকত ভূমি, ভগন শ্মশান,
দীপমালা নির্ব্বাপিত,
হাহাকারে পরিণত
স্নিগ্ধ সমীরণ, সুধু আকুল ক্রন্দনে
প্রতিধ্বনি তীরে তীরে জাগে রাত্রিদিনে!"

কবি প্রসন্নময়ী নানা বিষয়ে খণ্ড কবিতা রচনা করিয়াছেন। বিধাতা তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ কাল হইতে সুদীর্ঘ জীবনে শোকের যে দারুণ

ব্যথা দ্বারা আঘাত করিয়াছেন তাহা প্রত্যেকটি কথার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে।

বর্ত্তমান সময়েও তিনি সমানভাবে গদ্য ও পদ্য রচনা দ্বারা বাঙ্গালা-ভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়া যাইতেছেন। আমরা তাঁহার লিখিত 'সন্ধ্যাতারা' কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

"উঠেছিল সন্ধ্যার আকাশে,
প্রভাত না হ'তে রাতি
নির্ব্বাণ করিয়া ভাতি
চলে গেলে পুনঃ পরকালে
তব পানে নেত্র তুলে'
অজানা নদীর কূলে
ভেবেছিনু হয়ে যাব পার,
ঘাটে নাই তরীখানি
পথ কভু নাহি জানি
কেমনে যাইব পর পার!

* * * *

সেই এক সন্ধ্যা তারা মম,
সাঁঝের আকাশতলে
নিত্য যাহা নিভে জ্বলে
সেত নহে মোর তারা মম।
বিদায়ের সন্ধ্যাকালে
হৃদয়ের অন্তরালে
আছে যাহা গোপনে গোপন,
শরীরী মূরতি ধীরে
দাঁড়ায়ে সমুখে ফিরে
সন্ধ্যাতারা দেখিব তখন।"

স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

সেকালের অবরোধবাসিনী পুরমহিলাগণের মধ্যে যাঁহাদের কবি-প্রতিভা একযুগে বিশেষ ভাবে প্রভান্বিত করিয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী অন্যতম। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বালিকা গিরীন্দ্র-মোহিনীর প্রথম কবিতা পুস্তক "কবিতাহার" প্রকাশিত হইলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দের "বঙ্গদর্শনে" তাহার সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—"ইহার অনেক স্থান এমন যে, তাহা কোন প্রকারেই অল্প বয়স্কা বালিকার রচনা বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। শৈশবে যে কবি-প্রতিভার ক্ষীণ রশ্মি প্রকাশ পাইয়াছিল, কালে তাহাই বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য অপূর্ব্ব কিরণে উদ্ভাসিত করিয়াছে।"

আমরা প্রথমে তাঁহার জীবনীর পরিচয় দিয়া পরে তাঁহার রচিত কাব্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১২৬৫ সালের ৩রা ভাদ্র কলিকাতা ভবানীপুরে মাতুলালয়ে গিরীন্দ্র-মোহিনীর জন্ম হয়। গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা ৺হারাণচন্দ্র মিত্রের আদি নিবাস কলিকাতার চারিক্রোশ উত্তরে গঙ্গাতীরবর্ত্তী পাণিহাটি গ্রামে।

মজিলপুর গ্রামে গিরীন্দ্রমোহিনীর শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। বাটিস্থ বালিকা-বিদ্যালয়ে ইনি প্রথম শিক্ষালাভ করেন। দিনের অধিকাংশ সময়ই গ্রন্থ পাঠে অতিবাহিত হইত। শিক্ষার প্রতি গিরীন্দ্রমোহিনীর অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। খেলাধূলার সময় খেলা করিতে তিনি বড় একটা ভালবাসিতেন না। বিদ্যালয়ে সর্ব্বদাই তিনি রৌপ্য পদকাদি সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। শৈশব হইতেই তাঁহার চিত্ত পরদুঃখকাতর, শান্তিপ্রিয়। তিনি যখন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তখন তাঁহার সহপাঠিনী

শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

এক দরিদ্র বালিকা এক দিন কাণ বিঁধাইয়া, কাণে সূতা পরিয়া বিদ্যালয়ে আসিয়াছিল। কাণে সূতা পরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বালিকা বলিল,—"আমরা গরীব মানুষ, সোণার মাকড়ি পাব কোথা, ভাই, তোমাদের মত।" কথাটা বলিবার সময় বালিকার চোখ ছল ছল করিয়াছিল, তাহাতে সহৃদয়া গিরীন্দ্রমোহিনী এমন বিচলিতা হইলেন যে, তদ্দণ্ডেই আপনার কর্ণ হইতে মুক্তার মাকড়ি খুলিয়া তিনি বালিকার কর্ণে পরাইয়া দেন। এমন করিয়া বিস্তর দরিদ্র বালিকাকে তিনি বস্ত্র জামা প্রভৃতি দান করিতেন। এ বিষয়ে অনুজ্ঞার অপেক্ষাও রাখিতেন না। মাতা কন্যার অতিরিক্ত দানশীলতায় বিরক্ত হইলে, বালিকা কন্যা করুণ কণ্ঠে বলিতেন,—"আহা, ওদের যে নাই মা।"

শৈশবে শিক্ষকের নিকট গিরীন্দ্রমোহিনী ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। সেই সময় ইংরাজী শিখিবার উদ্যোগ হয়। স্বামীর নিকট তিনি ইংরাজী পড়িতেন; কিন্তু কিছুকাল পড়িয়াই পড়া ছাড়িয়া দিলেন। স্বামী অনুযোগ করিলে গিরীন্দ্রমোহিনী বলিতেন,—"গুরু মহাশয়ের নিকট না পড়িলে বিদ্যা শিক্ষা হয় না!" কবির দাম্পত্যজীবনের এ রহস্যটুকু কেমন মিষ্ট ও উপভোগ্য!

শৈশবেই তাঁহার কাব্যানুরাগ প্রস্ফুট হইয়াছিল। কেহ নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বালিকা গিরীন্দ্রমোহিনী আধ আধ ভাবে বলিতেন,—

"আমার নামটি বাবু চাঁদা।
পাখী মারি, ভাত খাই, চোখে লাগাই ধাঁধা!"

গিরীন্দ্রমোহিনীর পিতা হারাণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিতেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর বয়স যখন দ্বাদশ বর্ষ, সেই সময় একদিন

তিনি কন্যার নিকট একটি ইংরাজী কবিতা বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া বালিকা কন্যা ছন্দে সেই বিদেশী কবিতার মর্ম্ম গাঁথিয়া পিতাকে দেখাইলেন। এই কবিতাটি "তপোবন" নামে "ভারত-কুসুমে" প্রকাশিত হইয়াছে। তারপর বালিকার কল্পনা বিকাশের সহায়তা কল্পে পিতা তাঁহাকে Paul and Virginia, Theodosius, Constancia প্রভৃতি পুস্তক ও গল্প বাঙ্গালায় ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। তাহা হইতে এবং মাতামহী সংগৃহীত "মহানাটক" "কোকিলদূত," "যোজনগন্ধা," "বাসবদত্তা," "ইসফ জেলেখা," "কবিকঙ্কণ" প্রভৃতি পাঠ করিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য প্রতিভা স্ফূরিত হইয়া উঠে।

দশ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয়। তাঁহার স্বামী ৺নরেশচন্দ্র দত্ত বহুবাজার নিবাসী সম্ভ্রান্ত জমিদার ৺অক্রূর দত্ত মহাশয়ের প্রপৌত্র ৺দুর্গাচরণ দত্তের কনিষ্ঠ পুত্র।

বিবাহের পর বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত জন্মিলেও কাব্যানুরাগ বিন্দু পরিমাণে শিথিল হয় নাই। শিক্ষা নানা পথে তাঁহার প্রতিভাকে চালিত করিয়াছে। সূচীর সূক্ষ্ম শিল্প এবং রন্ধনাদি কার্য্যে গিরীন্দ্রমোহিনী সুনিপুণা। পরিণত বয়সে চিত্র কার্য্যেও তিনি বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট চিত্র বঙ্গদেশের নানা শিল্প প্রদর্শনীতে সমাদর ও পদকাদি লাভে সমর্থ হইয়াছে। ইহা অল্প প্রশংসার কথা নহে!

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "কবিতাহার" প্রকাশ সম্বন্ধে বেশ একটু ইতিহাস আছে। ইংরাজী ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রচিত গদ্যে পদ্যে লিখিত কয়েকখানি পত্র তাঁহার স্বামীর জনৈক বন্ধু "জনৈক হিন্দু মহিলার পত্র" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। পত্র প্রকাশিত হইলে, নববধূ গিরীন্দ্রমোহিনী অতিশয় লজ্জিত, ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া প্রবাসী স্বামীকে লিখিয়া-

ছিলেন,—"যদি আমার রচনা লোককে দেখাইতে এত ইচ্ছা হইয়াছিল, তবে বলিলে আমি অন্য কবিতা না হয় দিতাম। পত্র কেন প্রচার করিলে? ইহার ফলেই গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রথম কবিতা গ্রন্থ "কবিতাহার" প্রকাশিত হয়। "কবিতাহারের" সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি প্রথমেই বলা হইয়াছে।

গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রকৃতিটি সত্য সত্যই কবিজনোচিত ছিল। গর্ব্ব নাই, দ্বেষ নাই, আড়ম্বর নাই! শান্ত মৃদু কথাবার্ত্তায়, মিষ্ট মধুর বচনে অবরোধবাসিনী কবি নিতান্তই যেন "প্রকৃতিপালিতা" ছিলেন। তিনি কোন দিন গম্ভীর-প্রকৃতি-গৃহিণী [Serious house-wife] হইতে পারেন নাই। কিন্তু ভাব-সমুদ্রের কূলে তিনি সমুদ্রের মতই গম্ভীর ছিলেন। গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'ভারতী' সম্পাদিকা সুপ্রসিদ্ধ লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর সহিত সখ্যভাব। এমন সখ্যভাব সাহিত্য জগতে বিশেষতঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যতদিন গিরীন্দ্রমোহিনী জীবিতা ছিলেন ততদিন তাঁহাদের উভয়ের সখ্যভাব অটুট ছিল। 'ভারতী' সম্পাদিকা তাঁহার রচিত "স্নেহলতা" গিরীন্দ্রমোহিনীকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, গিরীন্দ্রমোহিনীও সখীকে তদ্‌রচিত "শিখা" প্রত্যুপহার দিয়াছিলেন।

ইঁহাদের পরস্পরের প্রীতিসম্পর্কের নাম ছিল "মিলন"। একদিন গিরীন্দ্রমোহিনী ভারতী সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া আপনার মাথার চুলের কাঁটা ফেলিয়া যান; সেই ছলে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ভারতী সম্পাদিকা এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন,—

"অধরে মোহন হাসি, নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে।

কইরে মিলন কোথা, সেকি হেথা আছে আর !
রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল পরশ তার।
ফুলটি সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে,
হাসি যত নিয়ে গেছে, অশ্রুজল গেছে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা-তারা
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটি সে নিয়ে গেছে ফেলে গেছে কাঁটা দুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

গিরীন্দ্রমোহিনীও স্বীয় সখীকে লক্ষ্য করিয়া "আভাযে" লিথিয়াছিলেন :—

"মিলন মিলন কত বারই বলি,
কইরে মিলন কই ?
মিলন চাহিতে বিরহ সায়রে
ডোববে ডোববে তরী সই !
ভাসা ভাসা নদী, আশাভরা তরী
বেয়ে চলি ধীরি ধীরি,
অনন্তের কূলে মধুর মিলনে,
যদিরে মিশিতে পারি।

লইয়া বিদায় সবে চলে যায়
দেখা না হইতে শেষ—
বুঝি, তাই ভয়ে মরি, যাই সরি সরি
করিতে প্রাণে প্রবেশ।

লাগে যদি বোঝা ফেলে যেও সোজা
গিয়াছে ফেলিয়া সবে।
একা আসিয়াছি যাব চলে একা,
ভেসে ভেসে ভবার্ণবে।"

গিরীন্দ্রমোহিনীর জীবন দুঃখের জীবন। বাণীর কমল-বন, বুঝি, চির কণ্টকাকীর্ণ। তাঁহার স্বামী নরেশচন্দ্রের স্বাস্থ্য কখনো ভাল ছিল না। প্রবাসে, স্বাস্থ্য-নিবাসেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। গিরীন্দ্রমোহিনী নরেশচন্দ্রের ছায়াস্বরূপিণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পতিগতপ্রাণা হিন্দু সহধর্ম্মিণীর তিনি আদর্শস্থানীয়া। পতির জন্যই তাঁহার জীবন, নিজের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই কিছু নাই, এমন ভাবেই তিনি অনুপ্রাণিতা ছিলেন।

বালিকা বধূ দশ বৎসর বয়সে আসিয়া স্বামীর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন। কালের কঠিন বিধানে আজ সে স্বামী পাশে নাই—শরীরী হইয়া নাই, কিন্তু অশরীরী আত্মায় মিশাইয়া আছেন—এই ভাবই গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্যের মেরুদণ্ড। এইটুকু মনে রাখিয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর কাব্য পাঠ করিতে হইবে। নচেৎ কাব্য ও কবির প্রতি সুবিচার না হইতেও পারে।

ইংরাজী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে [বাঙ্গালা ১২৯০ সালে] নরেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। স্বামীকে হারাইয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয় যে বিপুল শোকে ভরিয়া উঠিল, তাহারি "অশ্রুকণা" লাভ করিয়া বাঙ্গালার কাব্য সাহিত্য ধন্য হইয়াছে। ১৩৩১ সালের ২৮শে শ্রাবণ ৬৮ বৎসর বয়সে গিরীন্দ্রমোহিনী পরলোক গমন করেন।

গিরীন্দ্রমোহিনী শৈশব রচনার পরবর্ত্তী কালে যে সকল কাব্য-গ্রন্থ লইয়া সাহিত্য সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন সেই কাব্যসমূহ বাঙ্গালা সাহিত্যের সমালোচকেরা নিশ্চয়ই একটা বিশিষ্ট স্থান দান করিবেন একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

গিরীন্দ্রমোহিনী 'গণেশ-বন্দনা' লিখিয়া প্রথম কাব্য-সাহিত্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার সেই সব শৈশব রচনা অনেক দিন হইল বিলুপ্ত হইয়া

গিয়াছে। গিরীন্দ্রমোহিনীর রচিত প্রথম কবিতা পুস্তক 'ভারত-কুসুম' ও 'কবিতাহার' প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ দুইখানি পুস্তকে লেখিকার নাম ছিল না। "জনৈক বঙ্গ মহিলা" লিখিত বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় 'কবিতাহার' পাঠে এতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, তিনি লেখিকাকে তদ্‌রচিত নাটকাবলী উপহার দান করিয়াছিলেন। সে সময়ের সমুদয় ইংরাজী পত্রিকাতে গ্রন্থের সুখ্যাতি প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা পাঠ করিয়া নারীজাতির পরমহিতৈষিণী মেরী কার্পেণ্টার মহোদয়া গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু নানা কারণে উভয়ের সাক্ষাৎকার হয় নাই।

গিরীন্দ্রমোহিনীর তৃতীয় গ্রন্থ "অশ্রুকণাই" তাঁহাকে কাব্যসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে। স্বামীর মৃত্যুতে গিরীন্দ্রমোহিনীর হৃদয়ে যে শোকের সিন্ধু জ্বলিয়া উঠিয়াছিল—"অশ্রুকণা বিন্দু আভাষ মাত্র। একজন সমালোচক লিখিয়াছেন—"সাধারণ শোকোচ্ছ্বাস ত এমন অনেক প্রকাশিত হয়, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়টি সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য! গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতা বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে শোক উদার, তাহা সঙ্কীর্ণ নহে। আজি অবধি 'অশ্রুকণার' চারিটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা হইতেই কাব্যের মর্ম্মস্পর্শিতা সকলে অনুমান করিতে পারিবেন। * * নিষ্ঠুর কাল হিন্দুনারীর ললাটের সিন্দূর ঘুচাইয়া দিল—এ শোক সান্ত্বনার অতীত—কিন্তু যখন ভাবি সেই সিন্দুর-হীন ললাট কবিযশের অম্লান মুকুটমণির ছটায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন আমরা সে শোকেও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করি। "অশ্রুকণায়" কবির

* "ভারতী" ৩৪শ বর্ষ ১৩১৭—আশ্বিন। আমরা কবির জীবনী সম্বন্ধে ভারতী পত্রে প্রকাশিত 'অশ্রুকণা'র কবি শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

আন্তরিক শোক যেন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহির হইয়াছে, তাই ইহার উচ্ছ্বাসগুলি এমন মর্ম্মস্পর্শী। তাহার মধ্যে কোন আড়ম্বর নাই, কৃত্রিমতা নাই! তাহা বিধবা নারীর হৃদয়ের গান! ''অশ্রুকণা''র মুখপত্রে কবির উদ্ধৃত উক্তিটুকু—দুই ছত্র মাত্র কাব্যের মূল সূত্রটুকু ধরিয়া দিয়াছে ;—

যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ, দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
—চির দীপ্ত রবে হুতাশন!

'অশ্রুকণা' পাঠ করিয়া সুকবি ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাহার সমালোচনা করেন ও কবির উদ্দেশে একটি কবিতা রচনা করেন। অক্ষয়চন্দ্র লিখিয়াছিলেন "তাঁহার কাব্য পড়িতে পড়িতে এমন মনে হয় না যে, তিনি কাগজ কলম লইয়া কখনো কবিতা লিখিতে বসিয়াছিলেন—যেমন শিশিরকণা দূর্ব্বাদলে পড়িয়া মুক্তারূপে ফুটিয়া উঠে, সেই রকম গিরীন্দ্র-মোহিনীর কাব্যে তাঁহার কল্পনার উচ্ছ্বাসগুলি যেন অক্ষররূপে পরিণত হইয়াছে। * * কল্পনা 'স্নিগ্ধ বিদ্যুতের' ন্যায় উজ্জ্বল, অথচ তীব্র নহে, লীলাময়ী অথচ দুরন্ত নহে, মুগ্ধকরী অথচ মর্ম্মভেদী নহে। মনস্বী ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন—"This is poetry in life and as expression of that poetry *Asrukana* is the history of the Soul of a noble Hindu woman."

গিরীন্দ্রমোহিনীর 'অশ্রুকণা' এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে এইরূপ যশঃলাভ করিয়াছিল যে, কবি ৺অক্ষয়কুমার চৌধুরী এবং স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'অশ্রুকণা'র কবির উদ্দেশে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। আমরা পাঠকের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য এখানে তাঁহাদের কবিতা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিলাম।

৺অক্ষয় চৌধুরী লিখিয়াছিলেন,—

"প্রাণে যার মর্ম্মবিদ্ধ জীবন্ত জ্বলন্ত আশা,
মিশিব পতির সনে যদি থাকে ভালবাসা,

দেহমাত্র ছাড়াছাড়ি ;—দেহ হ'লে ছারখার,
দুটী দীপশিখা মিশে উভে হ'ব একাকার ;—
এমন বিশ্বাস বজ্রে বাঁধান হৃদয় যার,
তাঁর সমা সধবা গো ভূমণ্ডলে কোথা আর !

*   *   *   *

প্রাণে প্রাণে সম্মিলন যমুনা-জাহ্নবী-পারা ;
অনন্ত বিহার ক্ষেত্র—অনন্ত অমৃত ধারা,
অনন্ত তৃপ্তির মাঝে অনন্ত বাসনা নব—
এই ত বিবাহ শুভ,—এ বিবাহ হ'বে তব।
পরলোকে দেখা হ'বে এ বিশ্বাস নহে ভুল,
নহে এ স্বপ্নের ছায়া, কল্পনা-লতিকা ফুল।

*   *   *   *

লক্ষ্য রাখ পতি-প্রতি কায়মনোবাক্য প্রাণে—
স্থিরদৃষ্টি অরুন্ধতী যেমন ধ্রুবের পানে ;
আবার মিলন হ'বে যমুনা-জাহ্নবী পারা,
অনন্ত বিহার ক্ষেত্র, অনন্ত অমৃত ধারা।
অনন্ত তৃপ্তির মাঝে অনন্ত বাসনা নব;—
এইত বিবাহ শুভ,—এ বিবাহ হ'বে তব !

স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন কবি-ভগিনী গিরীন্দ্রমোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছিলেন,—

চিনেছি ; চিনাতে আর হবে না তোমায় !
বঙ্গের বিধবা তুমি আজন্ম-দুঃখিনী !
শ্মশান হইতে আনি এক মুষ্টি চিতানল,
জ্বালিয়া রেখেছ বক্ষে দিবস যামিনী।
চিনিয়াছি ; চিনিবার নাহি কিছু বাকী।
স্বামীর চিতার পার্শ্বে দাঁড়ায়ে কৌতুকে,

পবিত্র সে চিতা রজঃ, আগ্রহে দু'ভুজে ধরি,
মাখিলে আননে বক্ষে চরণে অলকে।

*　　*　　*　　*

চিনিয়াছি; খ্যাতি তব বিশ্ব-চরাচরে!
শ্মশান মন্দির-তটে, তরঙ্গিণী-তীরে,
রূপকান্তি, সুখশান্তি, বৈচিত্র নৈবেদ্যরাশি,
ভক্তিভাবে বিসর্জ্জিলে জাহ্নবীর নীরে!

*　　*　　*　　*

চিনিয়াছি; তবে মোর কেন এ ক্রন্দন?
হে ভগিনি, এই দেখ মুছিনু নয়ন।
স্বামীর আছিলে আগে, হে সুন্দরি, এবে তুমি
বিপুল বঙ্গবাসীর আপনার জন!
চিনিয়াছি; তাই বন-তুলসীরমালা
আনিয়াছি তব তরে, দেব-তপস্বিনি;
তোমার শ্রীকণ্ঠে উঠি আমার এ বনমালা,
ধরিবে অপূর্ব্ব শোভা, হে কবি-ভগিনি!"

[সাহিত্য—দ্বিতীয় বর্ষ ১২৯৮]

ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এক সময়ে 'অশ্রুকণা' শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয়ের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। 'অশ্রুকণার' প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে বেদনার করুণ সুর প্রবাহিত। যাহা অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে স্বতঃ নিঃসৃত হয় তাহার মধ্যে যে প্রাণ, তেজ এবং শক্তি নিহিত থাকে তাহা যেমন অন্তরকে স্পর্শ করে, আর কিছুতেই সেইরূপ করে না।

'অশ্রুকণার' কথা বলিতে যাইয়া প্রথমেই কবি বলিতেছেন,—

"এ নয় সে অশ্রু-রেখা,
মানান্তে নয়ন-কোণে,

ঝরিতে যা চাহিত না
দেখা হ'লে ফুলবনে।
সে অশ্রু এ নয়, সখা,
দীর্ঘ বিরহের পরে,
ফুটিয়া উঠিত যাহা
হাসির কমল-থরে।
এ শোকাশ্রু !
নিরাশার যাতনা-গরল-ঢাকা।
এ শোকাশ্রু !
বাসনার অনন্তপিপাসা-মাখা।
এ শোকাশ্রু !
হৃদয়ের উন্মত্ত আবাহন।
এ শোকাশ্রু !
জীবনের জন্মান্ত আলিঙ্গন।

'পূর্ব্ব-ছায়া' কবিতায় কবি বিপদের আকস্মিক আবির্ভাবের আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিয়াছেন—"Coming events cast their shadows before" ছায়াপূর্ব্বগামিনী তাই—'সতত কোথায় যেন করে গো হাহাকার।' শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিতেছে! বেদনা যখন মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিল, যখন আশার স্বপ্ন ফুরাইল তখন কতদিন, আর কতদিন !

সমাপন কবে হ'বে এই দুঃখ-গান ?
কবেরে মুদিব আমি সজল নয়ান ?

কিন্তু তারপর ? কোন্ মরীচিকার উদ্দেশে ব্যর্থ পথে আমরা ছুটিয়া চলিয়াছি ? কোথায় সে কল্পনা-রঞ্জিত সুন্দর বিচিত্র দেশ ?

হেথা ত হ'লনা সুখ ; অবিরত বলি।—
জানিনা কি সুখ-আশে কোথা যাই চলি !
তবু ত এখানে—আছে দুখ শেষে সুখ, দিবা পরে রাতি ;
নিরাশায় সুখ-স্মৃতি, অন্ধকারে বাতি ;
নদীতে তরঙ্গ আছে, হৃদয়ে উচ্ছ্বাস,
পরাণে সঙ্গীত আছে, স্নেহের বাতাস।
হরষের হাসি আছে, দুখের নিশ্বাস ;
মিলন, বিচ্ছেদ আছে, স্বদেশ, প্রবাস ;
আছে বিহঙ্গের গান, কুসুম বিকাশ ;
রবি, শশী, তারা আছে, অনন্ত আকাশ।

কিন্তু যদি

জীবনের পর-পার !
যে চির-বিস্মৃতি চাও—
সেথা যদি নাহি পাও ?
সেথা যদি থাকে স্মৃতি—আর কিছু নয় !
কি করিবি—কি করিবি, তখন, হৃদয় ?

তখন কি মনে হয় না—

যদি নাই পাই, দেহান্ত না চাই,
হারাব কেন এ দুখ ?
তাহার ভাবনা, তাহার কামনা,
তা'র নামে সব সুখ।

সে সুখ হইতে কেন বঞ্চিত হইব বলত ? মন তখন এই প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যাকুল—

পাব কিনা পাব, কোথায় যাইব?
চাহি না মরণ পার।
কিন্তু তবু দিন চলিয়া যায়,
গেছে সুখ, যায় দুখ, নীরবে যেতেছে প্রাণ;
বুঝাবারে পারিনু না একটি প্রাণের গান!
এ জনমে কিছু তবে বলা হইল না কথা!
মরমে রহিল তবে, হৃদয়ে রহিল ব্যথা!

আবার শোক-দুঃখ কাতর হৃদয়ে বলিতেছেন ঃ—

এ দীর্ঘ জীবন-পথে
একেলা কি হ'বে যেতে?
পথে কি হবে না দেখা, সঙ্গে কভু তার!
কে বলে দেবে গো মোরে,
পাব কত দিন পরে?—
নিকটে কি আছে দূরে, কোথা সে আমার।

* * * *

মধুরে বাজিছে বাঁশী,
হাসিছে কুসুম রাশি,
বিশদ জোছনা-নিশি, সবি শূন্য ভায়!
রয়েছে কুসুম ঢালা,
গাঁথা হয় নাই মালা,
প্রখর নিদাঘ জ্বালা,—শুকাইয়া যায়।

মানুষের জীবনের সুখ দুঃখের ইতিহাস বৈচিত্র্যময়। কেহ জানে না কেন মানুষের জীবন নানা বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত। কেন কেহ সুখী, কেন কেহ দুঃখী হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে? কেন কেহ রাজা এবং কেহ দীনতম প্রজা হইয়া পৃথিবীতে সুখে-দুঃখে জীবন কাটায়। এ মীমাংসা

কোনকালে হয় নাই। তুমি বলিবে কর্ম্মফল, বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—মানুষ কর্ম্মানুযায়ী ফল ভোগ করিয়া থাকে। তখন অদৃষ্ট ও কর্ম্মফলে বিশ্বাস আসিয়া পড়ে। যে জীবন-রহস্যের মীমাংসা পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত হইল না—কবিও তাঁহার প্রণয় দেবতাকে হারাইয়া সেই অজ্ঞেয় তত্ত্বের মীমাংসার মূলে আসিয়া বলিতেছেন,—

আপন করমফলে দুখভাগী ধরাতলে।
না বুঝে, তোমায় লোকে নিরদয় বিধি বলে।

তখন বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকার করে। তখন মনে হয়—সবই কর্ম্মফল! তখন একান্ত বিশ্বাসভরে আর্ত্ত মানব গাহিয়া উঠে,—

তুমি সর্ব্ব-সুখ-হেতু,
তুমি ভূমানন্দ-কেতু,
তুমি সর্ব্বশান্তি সেতু,
ভাবেনাক মোহে ভুলে।

তারপর স্মৃতি কি কখন হৃদয় হইতে মুছিয়া যায়? ভালবাসা যেখানে গভীর সেখানে কি বিস্মৃতি আসিতে পারে? যতদিন যায় ততই প্রিয়তমের প্রেম উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়। কবি তাই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন,—

যতদিন দেহ রবে,
এ হৃদি রহিবে ভবে,
ততদিন সে মূরতি তেমনি রহিবে।
অতীতের প্রলেপন,
যতই পড়িবে ঘন,
ততই উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটিয়া উঠিবে।

এইভাবে পতি দেবতাকে স্মরণ করিয়া অশ্রুকণার অপূর্ব্ব সুন্দর মালাটি গাঁথিয়াছেন। 'অশ্রুকণার' শেষ কবিতায় কবি যথার্থই বলিয়াছেন :—

তবে কি লিখিব 'শেষ' গান সমাপন ?
হায়রে হবে কি কভু থাকিতে জীবন ?
লিখিব কি তবে শেষ হল অশ্রু-কণা ?
তাহলে মুহূর্ত্ততরে আর বাঁচিব না।

'অশ্রুকণার' পর গিরীন্দ্রমোহিনীর 'আভাষ' প্রকাশিত হইয়াছিল। আভাষের কবিতায়ও সেই বেদনার সুরই ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। সে কাব্যেরও ঐ সুর—

বসে ওই মেঘের'পরে সাধ করে সই যাইলো ভেসে,
হৃদয়ের ধন, প্রাণের রতন আছে যেথায় যাই সে দেশে।"

কিংবা "দূরে নীল আকাশের কোলে ভেসে আসে শুভ্র পোতখানি,
ওপারের সংবাদ কাহার আনিছে এ প্রভাতে না জানি!

এইভাবে হৃদয়ে যে সিন্ধু-উচ্ছাস উচ্ছ্বসিত, কবিতায় তাহারি বিকাশ। তাঁহার 'শিখা', তাঁহার 'সিন্ধু-গাথা', তাঁহার 'স্বদেশিনী' একদিকে ব্যথা ও বেদনা আবার অপর দিকে সতেজ সবল হৃদয়ের দেশভক্তির অপূর্ব্ব পরিচায়ক।

সিন্ধুগাঁথায়—সমুদ্রের প্রতি কবির যে সকল বিভিন্ন ভাবের কবিতা আছে তাহা বর্ণনার উজ্জ্বল বর্ণে সুচিত্রিত। তাঁহার সেই—

আমার এ কুটীর খানি সমুদ্রের ধারে,
মিশিয়ে গেছে জলের রেখা আকাশে ওপারে!

সমুদ্রের বিরাট বিশালতার কথা অতি সুন্দর ভাবে চোখের সম্মুখে উপস্থিত করে।

গিরীন্দ্রমোহিনী এইভাবে অনেকখানি কাব্যগ্রন্থ লিখিয়া যশস্বিনী হইয়া গিয়াছেন। অল্পপরিসরে এইরূপ একজন মহিলা কবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া চলে না—অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের অল্পসংখ্যক শোক-কাব্যের মধ্যে 'অশ্রুকণা' অমর হইয়া থাকিবে।

গিরীন্দ্রমোহিনী নানা বিভিন্ন শ্রেণীর কবিতা লিখিয়াছেন। প্রকৃতির অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, আকাশ, পাহাড়, সমুদ্র তাঁহার কবিতায় যেমন স্থান পাইয়াছে তেমনি বাৎসল্য রসের মধুর চিত্র এত সুন্দর ফুটিয়াছে যে নিম্নোদ্ধৃত 'চোর' কবিতাটি হইতেই পাঠক মাতৃ-হৃদয়ের অপরূপ পরিচয় পাইবেন ;

সর্ব্বস্ব লইলি হরি যাহা কিছু ছিল মোর,
কোথা হতে এলি তুই ওরে ওরে ওরে চোর ?
কোলের উপরে বসে হৃদয় লইলি চুষে,
বুকেতে কাটিয়া সিঁদ এমনি সাহস তোর !

* * *

নয়নের নিদ্রা নিলি উদরের ক্ষুধা,
তৃষার পানীয় নিলি, নিলি স্নেহ-সুধা ;
ভূত ভবিষ্যৎ নিলি, নিলি বর্ত্তমান,
হরিলি সমগ্র ধরা জগতের প্রাণ ;
আপনা হারায়ে শেষে হলি ভাবে ভোর,
কোথা হতে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর ?
নেই ভয় নেই শ্রান্তি অম্লান কুসুম কান্তি,
গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি এ ঘর ওঘর,
রক্তিম অধর পুটে দুধে দাঁত দুটি ফুটে,
পলকে পলকে ছোটে হাসির লহর ;
এই কান্না এই হাসি রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি,
গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু তোর,
সর্ব্বস্ব লইলি হরি ক্ষুদে দুধে চোর।

শ্রীযুক্তা কামিনী রায়

বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। তিনি যে শুধু মহিলা কবিদের শীর্ষস্থানীয়া তাহা নহেন, বাঙ্গলা সাহিত্যেও তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন। সে অনেক দিন পূর্ব্বে তখন শ্রীযুক্তা কামিনী সেনের "যমুনা-কল্পনা" পাঠ করিয়া কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছিলেন—"স্ত্রী কণ্ঠে এমন সুন্দর সঙ্গীত খুব কম শুনিয়াছি।"—দেবেন্দ্রনাথ "যমুনা" শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া তাঁহার করে অর্পণ করিয়াছিলেন। [সাহিত্য দ্বিতীয় বর্ষ, আষাঢ়—১২৯৮]।

ধীরে উষাকর ধরি, নামিল সুন্দরী,
নীল কালিন্দীর নীরে, আকণ্ঠ ডুবিয়া,
বিশ্বের পীরিতি নিল অঞ্জলিতে পূরি ,
অমৃত করিল পান অবাক্ হইয়া !
সহসা আঁখির জাল গেল তার সরি ;
হেরিল সে সবিস্ময়ে, বাজিছে বাঁশরি,
যমুনা উজান বহে আবেশে শিহরি,
শ্যামা-জলে ভেসে গেল গোপিনী-গাগরি !
"কোথায় গাগরি !" বলি চারু চন্দ্রাবলী
করে রঙ্গ, ব্যঙ্গ করে দিয়ে করতালি,
রাধাপদ্ম করে লয়ে, রাধার সাহলি
সাজায় শ্যামেরে, হর্ষে হাসে বনমালী !
হে সুন্দরি ও কি ওই যমুনা বহিছে ?
তোমারি কবিতা ও যে গাহিয়া চলেছে !

সত্য সত্যই এই সুদীর্ঘ কাল যাবৎ "কবির কবিতা গাহিয়াই চলিয়াছে।"

শ্রীমতী কামিনী রায় বি. এ.

"আলো ও ছায়ায়" কবির নাম বাঙ্গালার ঘরে ঘরে সুপরিচিত।

"আলো ও ছায়া" ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়, সে প্রায় একচল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। কবিবর হেমচন্দ্র উহা পাঠ করিয়া উদার প্রশংসার সহিত লিখিয়াছিলেন—"এই কবিতাগুলি আমাকে বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে; স্থানে স্থানে এমন মধুর ও গভীর ভাবে পূর্ণ যে, পড়িতে পড়িতে হৃদয় মুগ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ বাঙ্গালা ভাষায় আমি এইরূপ কবিতা অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। * * বস্তুতঃ কবিতাগুলির ভাবের গভীরতা, ভাষার সরলতা, রুচির নির্ম্মলতা, এবং সর্ব্বত্র হৃদয়গ্রাহিতাগুণে আমি নিরতিশয় মোহিত হইয়াছি। পড়িতে পড়িতে গ্রন্থকারকে মনে মনে কতই সাধুবাদ প্রদান করিয়াছি। আর বলিতে কি স্থলবিশেষে হিংসারও উদ্রেক হইয়াছে।" সে সময়ে পুস্তকে কবির নাম ছিল না। কিন্তু নাম বেশি দিন গোপন ছিল না। তারপর কতদিন চলিয়া গিয়াছে—বর্ত্তমান সময়ে কবি কামিনী রায়ের নাম সর্ব্বজন পরিচিত ও তিনি কবিকুল-বরেণ্যা।

আমরা প্রথমে কামিনী রায়ের জীবনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব এবং পরে তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্য পরিবারে কামিনী রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা স্বনামখ্যাত গ্রন্থকার চণ্ডীচরণ সেন। কামিনী রায়ের পিতামহ ৺নিমচাঁদ সেন এবং পিতামহী গৌরী দেবী অতিশয় ধর্ম্মপ্রাণ ও ভাবুক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের জীবনের প্রভাব তাঁহাদের পুত্রের ও কিয়ৎ-পরিমাণে পৌত্রীর জীবনে অনুরঞ্জিত হইয়াছে।

শিশুর কথা ফুটিবার পর হইতেই পিতামহ তাহার নিকট নানাপ্রকার শ্লোক আবৃত্তি করিতেন। প্রতিদিন শুনিয়া শুনিয়া ইহার অধিকাংশই

শিশুর মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। কেহ বাড়ীতে আসিলে পিতামহের আদেশে সেগুলি নানাপ্রকার ভঙ্গি সহকারে তিনি পুনরাবৃত্তি করিতেন।

এই সকল বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিশ্রিত শ্লোক সকল সময়ে পদের মিল না থাকিলেও প্রায় শেষ ভাগে একটি করিয়া নীতি উপদেশ থাকিত। যেমন—

"না করিব হিংসা না করিব রোষ
সভার মধ্যে পড়িব শ্লোক।"
ওহে গোরা কালা কেন নিন্দ?
কালা রজনী সভা করে ছন্দ,
কালা অক্ষর জপয়ে পণ্ডিত,
কালা কৃষ্ণ জগৎ পূজিত,
কালা কেশে উজ্জ্বল মুখ।
কালা কোকিলের বচন মধুর।"

কামিনীর প্রথম বর্ণ পরিচয় মাতার নিকটে হয়। শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই কামিনীর জননী নিজের যত্নে একটু লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াছিলেন। বাড়ীর প্রাচীনাদের ভয়ে লুকাইয়া লেখাপড়া করিতে হইত। রন্ধনগৃহের যে স্থানটি হেঁসেল বা হাঁড়িশাল বলিয়া পরিচিত তাহা কাঁচা মাটির দেয়ালে ঘেরা ছিল। তাহারি গায়ে কাষ্ঠ শলাকা দিয়া তিনি অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেন ও প্রত্যহ রন্ধন শেষে গোময় মিশ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া সব ঢাকিয়া দিতেন। তখন বাসণ্ডা গ্রামের লোকের এইরূপ ধারণা ছিল যে, স্ত্রীলোকদিগকে লেখা পড়া শিখাইলে দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হইবে, স্ত্রীলোকেরা সকলের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিবে। সুতরাং মধ্যবিত্ত পরিবারে লেখাপড়ার চর্চ্চাকে কেহ কেহ প্রশ্রয় দিত না। ধনাঢ্যগণের গৃহে দশটা সৌখীন কার্য্যের মধ্যে লেখাপড়া শেখাটাও একটি বলিয়া কোন কোন মহিলা আত্মীয়গণের নিকট লেখাপড়া শিখিতেন; কেহ বা

বালিকা বয়সে সহোদরগণের সহিত গৃহে গুরুমহাশয়ের নিকট লেখাপড়া অভ্যাস করিতেন। বাসণ্ডা গ্রামে এই শ্রেণীর কোন কোন মহিলার সুন্দর হস্তাক্ষর আদর্শস্থানীয় ছিল। কামিনীর জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার মাতৃদেবীর সন্তান সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া পিতা স্ত্রীকে একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য, মাতৃত্বের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ ছিল। পত্রখানি ডাকঘর হইতে বাটীতে না আসিয়া গ্রামের কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে গেল, তাহারা চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া কামিনীর পিতামহের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র বধূকে চিঠি লিখিয়াছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইলেন, পত্র লইয়া তাঁহার বৈবাহিকের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার কার্য্যে বড় অপ্রতিভ হইলেন। চিঠিখানা লইয়া বাড়ীতে খুব একটা হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়া গিয়াছিল।

কামিনীর চারিবৎসর বয়সে লেখাপড়া আরম্ভ হয়। মাতার নিকটেই তিনি বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ ও শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগ শেষ করেন। দেড় বৎসর ধরিয়া শিশুশিক্ষাখানি ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে আদ্যোপান্ত তাঁহার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। মাতা যখন রন্ধনশালে রাঁধিতেন বা শ্বশুরের পরিচর্য্যায় ব্যস্ত থাকিতেন, কামিনী তখন মাটির দোয়াতে স্বগৃহে স্বহস্তে নির্ম্মিত এক দোয়াতে কালি ও এক তাড়া তালপাতা ও একটা থাকের কলম লইয়া লিখিতে বসিতেন। লেখাপড়া শেষ হইলে তালপাতাগুলি গুছাইয়া একটা বন্ধনীর মধ্যে ভরিয়া তদুপরি কলম রাখিয়া ও কলমের উপর ললাট রাখিয়া নিম্নলিখিত কবিতা আবৃত্তি করিতেন।

"লাগ্ লাগ্ সরস্বতী মোর কণ্ঠে লাগ্
যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্
আমার ভাগ্যে গুরুর যশ
দিনে দিনে বিদ্যা বাড়িতে থাক।"

"ত্বং ত্বং সরস্বতী নির্ম্মল বরণে
রত্ন বিভূষিত কুণ্ডল করণে
উজ্জ্বল মুকুতা গজমতিহারে
দেবী সরস্বতী বর দেও আমারে
বীণা পুস্তক রঞ্জিত হস্তে
ভগবতি ভারতি দেবি নমস্তে।"

স্কুলে আসিবার কিছুদিন পরেই আপার প্রাইমারী পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগের প্রথম স্থান পাইলেন। পিতা তাঁহাকে গণিত এমন সুন্দর শিখাইয়াছিলেন যে, ক্লাসে সে সময়ে গণিতে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। তাঁহাদের গণিতের শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ বসু তাঁহাকে গণিতের পারদর্শিতার জন্য লীলাবতী আখ্যা দিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই সময় পিতা চণ্ডীচরণ জলপাইগুড়ির মুন্সেফ ছিলেন। তিনি চিরকালই অধ্যয়নশীল ছিলেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি নানা বিষয়ক গ্রন্থরাশি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ রুচি থাকাতে এই সম্বন্ধীয় পুস্তক তাঁহার পুস্তকাগারে ছিল। মাইনর পরীক্ষা দিয়া বাড়ীতে আসিয়া কামিনী সমস্ত সময়ই এই পুস্তকাগারে কাটাইতেন। বাল্যকাল হইতেই কামিনী ভাবুকতাপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয় ছিলেন।

অষ্টম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কামিনী প্রথম কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। পদ্য রচনা দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত উপহার দিলেন। তাঁহার যখন নয় বৎসর তখন তাঁহার পিতা দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুরগাঁ সবডিভিসনে মুন্সেফ হইয়া যান। সে সময়ে সে স্থানে যাইতে কতকটা পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত ; সপরিবারে তথায় যাওয়া সুবিধাজনক নহে বলিয়া স্ত্রী ও

কন্যাগণকে কেশব বাবুর 'ভারতাশ্রমে' রাখিয়া পিতা একাই গেলেন। ইহার কিছুদিন পরে কামিনী হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ে বোর্ডার হন। ছয় মাসকাল এখানে থাকিয়া তাহার পর আবার পিতার কর্ম্মস্থান মাণিকগঞ্জে ফিরিয়া আইসেন। ইহার পরবর্ত্তী দেড় বৎসর কাল পিতাই কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। প্রতিদিন উপাসনার পর হয় বাইবেল না হয় অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে অংশ বিশেষ কন্যার পাঠের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। Morning and Evening Meditations নামক পুস্তক হইতেও প্রতিদিন একটি করিয়া কবিতা মুখস্থ করিতে দিতেন। যেখানে যাহা কিছু সুন্দর পড়িতেন, কন্যাকেও সেগুলি পড়াইতেন।

ইংরাজী, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল, সব বিষয়ই নিজে পড়াইতেন। বার বৎসর বয়সের সময় আবার কামিনীকে বোর্ডিংএ পাঠান হইল। স্কুলে পাঠাইবার সময় পিতা কন্যাকে বলিয়া দিলেন যে সর্ব্বদাই মনে রাখিবে—"My life has a mission".

ষোড়শ বর্ষে কামিনী প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাই দ্বিতীয় ভাষারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পর দুই বৎসর পড়িয়াই F. A পরীক্ষা দেন এবং সংস্কৃত ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। আবার দুই বৎসর পরে B. A পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় সংস্কৃত ভাষায় দ্বিতীয় ক্লাস অনার পাইয়াছিলেন। এই সময়ে বেথুন কলেজের Lady superintendent Miss Lipsombe কর্ম্ম পরিত্যাগ করাতে Miss Bose, M. A Lady supt. হইলেন। সেই কাজ লইবার জন্য কামিনীকে প্রথমে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাঁহার পিতা কন্যাকে কার্য্য লইতে দিলেন না।

"বেশীর ভাগ পুরুষেরা আজকাল চাকরী পাইবার আশায় লেখাপড়া

শেখে” বলিয়া তিনি সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন; কাজেই কন্যার চাকরীর নামে তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন “জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য ও জ্ঞানের নির্ম্মল আনন্দ সম্ভোগ করিবার জন্যই আমি কন্যাকে শিক্ষা দান করিয়াছি। চাকরী আমি কখনই করিতে দিব না।” কতিপয় বন্ধু তখন বলিলেন যে “আপনার কন্যার নিজের জীবিকার জন্য অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক নাই, সুতরাং মেয়ে অর্থের জন্য চাকরী করিতেছে এরূপ ভুল করা কাহারও সম্ভব নহে। কিন্তু এমন অনেক ভদ্র রমণী আছেন যাহাদের মধ্যে স্বাবলম্বন প্রয়োজন। কিন্তু দৃষ্টান্তের অভাবে এইরূপ রমণীরাও স্বাধীন ভাবে কোন কাজ করিতে পারিতেছেন না। আপনি যদি ইহাকে কাজ করিতে দেন তাহা হইলে পরে আরও দশজন স্ত্রীলোক কার্য্য করিতে অগ্রসর হইবে।” কামিনীর পিতার এই কথাগুলি যুক্তিসঙ্গত মনে হইল।

১৮৮৬ সালে কামিনী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার প্রণীত ‘আলো ও ছায়া’ ১৮৮৯ সালে বাহির হয়। অধিকাংশ কবিতাই অনেক বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল।

কামিনীর পিতা ও তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে অনেকবার কবিতাগুলি ছাপাইতে অনুরোধ করিয়াছেন কিন্তু তিনি কোন মতেই সম্মত হন নাই। অবশেষে তাঁহার পিতার কোন বন্ধু কবিতাগুলি কবিবর হেমচন্দ্রকে দেখান ও লেখিকার নাম গোপন করিয়া কবিতাগুলি সম্বন্ধে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করেন। তিনি কি মত প্রকাশ করিয়াছিলেন ‘আলো ও ছায়া’র ভূমিকাতে তাহা লিপিবদ্ধ আছে।

কোন সমাজের কোন দিকেই কামিনীর ভাল করিয়া দেখিবার অবসর বা সুবিধা ঘটে নাই, সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁহার বড়ই কম। তাঁহার আদর্শ বেশির ভাগ ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্য

জগৎ হইতে লব্ধ ও কল্পনা-প্রসূত। কাজেই তাঁহার কবিতাগুলি পুরাতন ছাঁচে ঢালা হইতে পারে নাই। কামিনী রায় তাঁহার ছাত্র জীবনে যেরূপ কঠোরতার সহিত সাধনা করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি লিখিয়াছেন—"গ্রীষ্মের ছুটিতে আমার অবসর যথেষ্ট ছিল, আমি ইংরাজী নবেল পড়ি নাই, ইচ্ছা করিয়াই দূরে রাখিয়াছি। স্কুলে মেয়েদের কাছে শুনিতাম অল্প বয়সে নবেল পড়া ভাল নয়। মিস্ লাহিড়ীর সঙ্গে যখন সহজ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতাম তিনি মাঝে মাঝে জানিতে দিতেন, যেন আমি নবেলি ভাবে নবেলি ভাষায় কথা বলি। এই রকম কথা শুনিয়া বড় কষ্ট বোধ করিতাম। কারণ নবেল পড়ার অভ্যাস আমার ছিল না। * * "মেদিনী" নামে মেদিনীপুরে একখানি সাপ্তাহিক কাগজ ছিল। পিতা তাহার জন্য আমাকে কবিতা দিতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে "প্রার্থনা" ও "উদাসিনী" শীর্ষক দুইটী কবিতা দিয়াছিলাম, ইহাদের একটিও "আলো ও ছায়ায়" স্থান পায় নাই। * * "আলোচনা" নামক মাসিক পত্রিকায় প্রসন্নময়ী দেবীর লিখিত "কেন মালা গাঁথি" —"কুমারী চিন্তা" শীর্ষক কবিতা পড়িয়া আসিয়া পর দিন "সঞ্জীবনী-মালা" লিখি। প্রসন্নময়ী প্রবীণা বিবাহিতা—কুমারীর চিন্তা লিখিলেন, আমি কুমারী হইয়া প্রবীণার মত তাহার উত্তর দিলাম। এ এক তামাসা!"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ষ্ট্যাটুটরী সিভিলিয়ান কেদারনাথ রায়ের সহিত কামিনীর বিবাহ হয়। ইনি বহু পূর্ব্ব হইতেই কামিনীর গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। ''আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হইলে পর তিনি ইংরাজীতে তাহার এক বিস্তৃত সমালোচনা প্রকাশ করেন। বিবাহের পর কামিনীর কেবল একখানি ''গুঞ্জন'' নামে কবিতা পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সময়ে কবিতা লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন বলিয়া কোন বন্ধু অনুযোগ দিলে তিনি

বলিয়াছিলেন—"এই গুলিই আমার জীবন্ত কবিতা।" সে সময়ে স্বামি-সেবা, গৃহকর্ম্ম ও সন্তানপালনই তিনি পত্নী ও জননীর প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন এবং তাহাতেই আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে তাঁহার জীবনে শোকদুঃখের ঘন অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার একটি সন্তানের মৃত্যু হইল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে একটি ঘোড়ার গাড়ী উল্টাইয়া যাওয়ার দারুণ আঘাতে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইল। তাহার পর কন্যা লীলা, পুত্র অশোকের ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হইল। এই শোকের আঘাতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। এ সময়ে 'অশোক-সঙ্গীত' বাহির হইল। পুত্র-শোকাতুরা জননীর শোকের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। এইরূপ নানা শোক দুঃখ আঘাতের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক, ও ধর্ম্মসম্পর্কিত কার্য্য-পদ্ধতির ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন অগ্রসর হইতেছে এবং কাব্য রচনায়ও তাঁহাকে পুনরায় মনোযোগী দেখিতে পাইতেছি।

এইবার আমরা তাঁহার কবিতার ও কাব্যের বিষয় আলোচনা করিব। তাঁহার কবিতাপুস্তকাবলী নিম্নলিখিত সময়ে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলো ও ছায়া	প্রথম সংস্করণ	১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর
	দ্বিতীয় সংস্করণ	১৮৯০
	তৃতীয় সংস্করণ	তারিখ অজ্ঞাত
	চতুর্থ সংস্করণ	
	পঞ্চম সংস্করণ	১৯০৯
	অষ্টম সংস্করণ	১৯২৫

এই সংস্করণের হিসাব হইতেই "আলো ও ছায়া" জনসমাজে কিরূপ সমাদৃত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

নির্ম্মাল্য	১৮৯০ অক্টোবর
পৌরাণিকী	১৮৯১-১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত
	১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।
মাল্য ও নির্ম্মাল্য	১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ „
অম্বা	১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত
	১৯১৫ „ „

রচিত হইবার চব্বিশ বৎসর পরে অম্বা প্রকাশিত হইয়াছিল।

অশোক-সঙ্গীত	[১৯১৩—১৯১৪]	১৯১৪
ঠাকুরমার চিঠি	[১৯২১]	১৯২৩ ,
সিতিমা		১৯১৬
শ্রাদ্ধিকী		১৯১৩
দীপ ও ধূপ		১৯২৯
জীবন-পথে		১৯৩০ .

একজন সমালোচক কামিনী রায়ের কবিতার আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন,—"কামিনী রায়ের কবিতাগুলির প্রধান গুণ, তাহার কোনখানে অস্পষ্টতা দোষ নাই, ভাবের জটিলতা নাই—ছন্দের আড়ষ্টভাব নাই—তাহা অবান্তর চিন্তাতরঙ্গে পাঠকের চিত্ত-পীড়ার উদ্রেক করে না, তাহা লঘু, স্বচ্ছ, নির্ম্মল। চটুলতা বা অসংলগ্নতা দোষ হইতে মুক্ত এবং তাঁহার কবিতা যে অনুকরণ নহে, একথাও মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে।

'আলো ও ছায়ার' কবিতা ভাব-সম্পদে পূর্ণ। উহাতে বিশ্বসাহিত্যের অপূর্ব্ব বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে এমন সব কবিতা আছে যাহা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অনেক বিখ্যাত কবিতারও পূর্ব্বে বিরচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কবি আমাকে একখানা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—"আমার মনে হয় আমি কিছু অকাল-পক্ক ছিলাম।

কতকগুলি বিষয় আমি রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, কিন্তু তিনি যখন লিখিয়াছেন অনেক সুন্দর করিয়া লিখিয়াছেন। যাহা শীঘ্র বাড়ে, তাহা শীঘ্রই নষ্ট হয়, প্রকৃতির মধ্যে ইহা সর্ব্বদাই দেখি। অশ্বত্থ বটাদি বনস্পতি ধীরে বাড়ে, যত দীর্ঘায়ু হয়, লাউ, কুমড়া, শশা অন্য শাকাদি সে রকম হয় না। দু' দিনে বাড়ে দু' দিন বাদে মরে। যে সব ছেলে Precocious তাহাদের মধ্যে কেহই বড় হইয়া বড়লোক হয় না। আমার মধ্যেও একটা precocity ছিল, কিন্তু বয়সের সঙ্গে শক্তি বৃদ্ধি দেখা গেল না। অবশ্য সারাজীবন কতকগুলি প্রতিকূল ঘটনার মধ্যদিয়াই আসিতে হইয়াছে। সাহিত্যের সাধনা ও অনুশীলনের সুযোগ ঘটে নাই। মনের জড়তাও ছিল।"

অনেকেই বোধ হয় কবির এ উক্তির সমর্থন করিবেন না। গীতি-কবিতার সহজ সরল করুণ সুরলহরী যেমন অনেক কবিতার প্রাণ তেমনি উহার মধ্যে স্বদেশ প্রেম, সমাজ, সেবা ও প্রণয়মুগ্ধ নারীহৃদয়ের রহস্যময় চিত্র পাওয়া যায়। আর সবগুলিই মানব হৃদয়ের চিরন্তন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোথাও কবি 'যৌবনতপস্যায়' বিভোর, কখনও 'মুগ্ধ প্রণয়ে' বিহ্বল। কখনও বলিতেছেন—

আমি যৌবনের লাগি তপস্যা করিব ঘোর,
কালে না করিবে জয় জীবন-বসন্ত মোর;
জীবনের অবসান হোক্ যেই দিন হবে,
যাবৎ জীবন মম তাবৎ যৌবন রবে;
এই আমি করিয়াছি পণ।

* * * *

তরুণ হৃদয়গুলি নিকটে আসিবে যবে,
আমারে বয়স্য ভাবি আশার স্বপন কবে;

নির্ব্বাণ প্রদীপ যার—কেহ যদি থাকে হেন—
বিধাতার আশীর্ব্বাদে হেথা আলো পায় যেন,
হস্ত পায়, ধরিয়া দাঁড়াতে।

তাঁহার কাছে—

"পাষাণের প্রতিমাটি যবে
প্রাণময়ী নারীরূপ ধরে,
নারী তব পারেনা কি তবে
দেবী হ'তে বিধাতার বরে?"

আবার সমাজের নিপীড়িতা নারীদের বেদনায়—'পিশাচ পীড়িতা নারীর স্বরে' কবির 'রমণী শকতি অসুরদলনী' এই বিশ্বাস জ্বলন্তভাবে বিকশিত হইয়াছে, তাই কবি বলিতেছেন—

"সীতা সাবিত্রীর জনমে পাবিত,
ভারতে রমণী হারায় মান,
শুনিয়া নিশ্চিন্ত রয়েছিস্ সবে,
তোদের সতীত্ব শুধু কি ভাণ?"

"রমণীর তরে কাঁদে না রমণী,
লাজে অপমানে জ্বলে না হিয়া?
রমণী শকতি অসুরদলনী,
তোরা নিরমিত কি ধাতু দিয়া?"

সংসারে পতিতা নারীর বেদনায় কি পাশ্চাত্য কি দেশীয় অনেক কবি অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু পতিতা নারীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া কবি করুণ সুরে প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে যেরূপ আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—তেমন কেহ করিয়াছেন কি?

"বর্ত্তিকা লইয়া হাতে, চলেছিল এক সাথে,
পথে নিবে গেছে আলো, পড়িয়াছে তাই,
তোমরা কি দয়া ক'রে, তুলিবে না হাত ধ'রে,
অর্দ্ধদণ্ড তার লাগি থামিবে না, ভাই ?

তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি হোক্ অগ্রসর ;
পঙ্ক-মাঝে অন্ধকারে, ফেলে যদি যাও তারে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর !"

কেন না— "দিনেকের অবহেলা, দিনেকের ঘৃণাক্রোধ,
একটি জীবন তোরা হারাবি জনম শোধ ।
তোরা না জীবন দিবি ? উপেক্ষা যে বিষ-বাণ,
দুঃখভরা ক্ষমা লয়ে, আন্ ওরে ডেকে আন্ ।"

পাপকে ঘৃণা করিলেও পাপীকে ঘৃণা করা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে 'আলো ও ছায়ায়' এশিক্ষা পূর্ণমাত্রায় দেখিতে পাই,—

"পতিত মানব তরে নাহি কিগো এ সংসারে
একটি ব্যথিত প্রাণ, দুটি অশ্রুধার ?
পথে পড়ে' অসহায়, পদে তারে দলে যায়,
দু'খানি স্নেহের কর নাহি বাড়াবার ?
সত্য, দোষে আপনার চরণ স্খলিত তা'র
তাই তোমাদের পদ উঠিবে ও শিরে ?
তাই তার আর্ত্তরবে সকলে বধির হবে,
যে যাহার চলে যাবে—চাহিবে না ফিরে ?

তোমাদের বাতি দিয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া নিয়া,
তোমাদেরি হাত ধরি' হোক্ অগ্রসর,
পঙ্কমাঝে অন্ধকারে ফেলে যদি যাও তা'রে,
আঁধার রজনী তার রবে নিরন্তর।"

আবার "পথ ভুলে গিয়াছিল, আবার এসেছে ফিরে,
দাঁড়ায়ে রয়েছে দূরে, লাজে ভয়ে নত শিরে;
সম্মুখে চলেনা পদ, তুলিতে পারে না আঁখি,
কাছে গিয়ে হাত ধরে, ওরে তোরা আন্ ডাকি।"

ইংরাজ কবি বার্ণস ব্যতীত এইরূপ বেদনাপূর্ণ করুণার উচ্ছ্বাস আর কাহারও কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

'আলো ও ছায়ার' কবির বাণী, ত্যাগের, সাহসের ও মনুষ্যত্ব জ্ঞাপক। তাঁহার শিক্ষা—

"কার্য্যক্ষেত্র ওই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ
যে জিনিবে সুখ লভিবে সেই।

* * * *

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি
এ জীবন মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।"

কামিনী রায়ের 'সুখ' কবিতাটি লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। এই কবিতাটি লিখিবার ইতিহাস সম্বন্ধে কবি আমাকে লিখিয়া জানাইয়াছেন—"১৮৮০ সালের জুন মাসের ৩০ শে

তারিখ মীরজাফার্স লেনের বাড়ীতে রচিত। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার ছয় মাস পূর্ব্বের লেখা। পরে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত—সর্ব্বদাই জানাইতেন যে, তাঁহার জীবন দুঃখময় এবং ভবিষ্যতের ভাবনায় অন্ধকার। তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ছলেই এবং তিনি প্রবাসে যাইবার পূর্ব্বে আমার নিকট একটি কবিতা চাহিয়াছিলেন, সেজন্যও বটে, আমি এই কবিতা রচনা করি। "গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি" সে আমার—আমার বীণা নহে। সকলের ভাল লাগিয়াছে বলিয়া এটা রাখিয়া দিয়াছিলাম। নতুবা বয়সের অনুচিত 'পাকামি' হইয়াছে বলিয়া কবে ছিঁড়িয়া ফেলিতাম। সাড়ে পনের বৎসর ছিল তখন আমার বয়স। তৎপূর্ব্বে আমি কবে সংসারে প্রবেশ করিলাম আমার বিশেষ দুঃখ কি নৈরাশ্য কেন? এ সকল প্রশ্ন অনেকে করিয়াছেন, উত্তর দিবার ছিল না। বন্ধু অবলা (বর্ত্তমানে লেডি বসু—বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর পত্নী) সুশীলকুমার গুপ্ত নাম দিয়া এই কবিতা আমার অজ্ঞাতসারে ঢাকায় "বান্ধবে" পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু সম্পাদক উহা প্রকাশ করেন নাই। আমি নিজে বিভূতিগুপ্ত নাম দিয়া ইহা আর্য্যদর্শনে পাঠাইয়াছিলাম ছাপা হয় নাই। সহপাঠিনী কুমুদিনী তখন খাস্তগীর পরে মিসেস্ দাস, বেথুন কলেজের Lady Principal উহা "বঙ্গদর্শনে" দিবার জন্য কোন আত্মীয়কে দিয়া বঙ্কিম বাবুর নিকট পাঠান। বঙ্কিম বাবু বলিলেন তিনি 'বঙ্গদর্শনের' ভার ছাড়িয়া দিয়াছেন। আজ কাল দেখি কতকগুলি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থেও এই 'সুখ' খানিকটা স্থল জুড়িয়া বসিয়া আছে।"

সম্পাদকদের বিচারক্ষমতা যে কতদূর গ্রহণীয় তাহা এইরূপ অনেক প্রতিভাশালী লেখক ও লেখিকার রচনার ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায়।

কবির জীবনের পথ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে নিজেই লিখিয়াছেন ঃ—

"বিশাল গগন মাঝে এক জ্যোতির্ম্ময়ী তারা,
তাহারেই লক্ষ্য করি চলিয়াছি অবিরাম।
ঘন ঘোর তমোজালে জগৎ হয়েছে হারা,
পরবাসী আত্মা মম চাহে সে আলোক ধাম।

* * * *

কঠোর বসুধা-বুকে ভ্রমিতেছি শুষ্কমুখে,
থামিব কি এইখানে ? কোন্ স্থানে, কোন্‌দিন
ধরারে ধরিয়া হাতে স্বরগ লইবে সাথে,
আলোক নীরধি মাঝে আঁধার হইবে লীন।"

'লক্ষ্যতারা' কবিতাটির ইতিহাসও সুন্দর। সেইটির রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে কবি আমাকে জানাইয়াছেন—"যে দিন বেথুন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীরূপে প্রবেশ করিলাম, সেই দিন সন্ধ্যাকালে Lady Superintendent এর বাড়ীতে আমি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া এই কবিতাটি লিখি। পুরাতন স্থানে নূতন জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, অনেক দিন পরে আবার পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলাম, বড়ই একলা মনে হইতেছিল। কিছু কাজ করিব—জীবনটা নষ্ট হইতে দিব না, এই একটা আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই ছিল। জীবনে আদর্শ ছিল কাজে লাগা। সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়া বেথুন কলেজে চাকরী লই। বাড়ীতে স্বজন পরিবেষ্টিত হইয়া কি কাজে আসিতাম না ? রুলকরা Exercise book এর পাতা ছিঁড়িয়া তাহার উপর কবিতাটি লিখিয়াছিলাম পেন্সিল দিয়া, এখনও বেশ মনে পড়ে। আকাঙ্ক্ষা—"এ জীবন শুধু কি স্বপন ?" আঠার বৎসর বয়সে লিখিয়াছিলাম নিজের ডায়রীতে।" এইরূপ ভাবে কবির নিকট হইতে তাঁহার লিখিত কয়েকটী কবিতার ইতিহাস জানিয়া লইয়াছিলাম।

কবির স্বদেশ প্রেম—বর্ষার উচ্ছ্বসিত জলধারার ন্যায় প্রবাহিত। তাঁহার 'শুনে যা আমার আশার স্বপন' কিংবা 'মা আমার' বাঙ্গালা-সাহিত্যে অতুলনীয়। আমরা 'মা আমার' কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

মা আমার

"যে দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার।
অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়ামাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে,
ছোট খাটো সুখ দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার
তুমি যবে চাহ কাজ—মা আমার, মা আমার।
অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায়;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার
মরিব তোমারি তরে,—মা আমার, মা আমার।
মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে?
যত দিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ, মা আমার, মা আমার।"

কবি এই কবিতাটির সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"মা আমার মা আমার" গানটাতে আমি 'মা' ভাবটাকে সমস্ত অনুরাগ

ও ব্যাকুলতা দিয়া ভরিতে চাহিয়াছিলাম, কিন্তু সঙ্গীতজ্ঞ নই বলিয়া দিয়াছিলাম একটা সহজ সুর—আমার নির্দ্দেশ মত ৺উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় দিয়াছিলেন। অনেক বৎসর পরে রবিবাবু যখন তাঁহার "অয়ি ভুবন মনমোহিনী মা" রচনা করিয়া গাহিলেন, সে ভাষা, সে সুর, সে বর্ণনা-সৌন্দর্য্য আমার গানটাকে কতদূর ফেলিয়া গেল। তবু আমার গানটাকে একেবারে মূল্যহীন মনে করি না। ইহার মূল্য ভিতরের ভাবে—অন্তরে যে সাধনা, যে তপস্যার শিখা একটু প্রকাশ করিতেছে ও অপর প্রাণে সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছে তাহাতেই।"

বিলাতে একটি ভদ্রলোক কামিনী রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে কথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আপনার 'মা আমার' 'মা আমার' গানটাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র হইয়া আমাকে চালাইয়াছে।" একদিন যে সংক্ষেপমন্ত্র কবির কবিতায় প্রথম প্রকাশ পাইয়াছিল সেই মন্ত্রগুলিই পরবর্ত্তী কালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের হাতে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য মণ্ডিত হইয়া উচ্চ কবিতালোকে স্থান পাইয়াছে।

আলো ও ছায়ায় যে কয়টি প্রণয় কবিতা আছে, তাহার মধ্যে একটা বেদনার সুর দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক মহিলা কবির কবিতার মধ্যেই এই সুর পূর্ণভাবে বিকশিত। "প্রণয়ে ব্যথা" কবিতায় তাহা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

"কেন যন্ত্রণার কথা, কেন নিরাশার ব্যথা,
জড়িত রহিল ভবে ভালবাসা সাথে ?
কেন এত হাহাকার, এত ঝ'রে অশ্রুধার ?
কেন কণ্টকের স্তূপ প্রণয়ের পথে ?
বিস্তীর্ণ প্রান্তর মাঝে প্রাণ যবে খোঁজে
আকুল ব্যাকুল হয়ে সাথী একজন,

তখন তখন তারে, নিয়তি কেনরে বারে
কেন না মিশাতে দেয় দুইটী জীবন ?

ভ্রমি বহু অতি দূরে, পায় যবে দেখিবারে,
একটি পথিক প্রাণ মনেরি মতন ;—
অনুলজ্ঘ্য বাধারাশি—সম্মুখে দাঁড়ায় আসি।
কেন দুই দিকে আহা যায় দুই জন ?

অথবা, একটি প্রাণ, আপনারে করে দান
আপনারে দেয় ফেলে অপরের পায় ;
সে না বারেকের তরে, ভুলেও ভ্রূক্ষেপ করে,
সবলে চরণতলে দ'লে চ'লে যায়।"

এ প্রশ্নের উত্তর কে দিবে ? 'আলো ও ছায়ার' পরিশিষ্ট ভাগে 'মহাশ্বেতা' ও 'পুণ্ডরীক' এ দুইটি খণ্ড কাব্য। এই দুইটিকে আমরা রোমান্টিক আখ্যা দিতে পারি। এ দুইটী কবিতা ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছে। 'পৌরাণিকীতে' 'একলব্য' নাটিকার সহিত "ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রতি দ্রোণ" ও 'রামের প্রতি অহল্যা' শীর্ষক কবিতা আছে। 'রামের প্রতি অহল্যা' কবিতাটি অতি সুন্দর—মর্ম্মস্পর্শী। ব্যথিতা অহল্যা বলিতেছেন,—

"নরদেব, কিছু ভুলি নাই,
কাল যাহা পাপ ছিল, আজো আছে তাই,
শুধু সেই পাপী নাই। পাপী চিরদিন
থাকে না পাপের পঙ্কে বিকৃত, মলিন,
অস্পৃশ্য। প্রভাতালোকে ধরণী তেয়াগি
যায় যথা অন্ধকার, পুণ্যালোক লাগি
দুষ্কৃতি কালিমা হয় চির অন্তর্হিত ;

তাই অহল্যার নাম রমণী ঘৃণিত,
রবে না ঘৃণিত আর।

*　　*　　*　　*

নারীর সতীত্ব যায় মানব ভাষায়
শোনা ছিল, নারী কভু সতীত্ব যে পায়
তুমি তা দেখালে প্রভু, সে কারণে রাম
চিরস্মরণীয় হবে অহল্যার নাম।"

'গুঞ্জন' শিশু কবিতা পুস্তক। জননী কামিনী রায়ের মাতৃ হৃদয়ের অপূর্ব্ব সুধা পরিবেষণ। সুমধুর ছড়ার সুরটুকু কবিতাগুলির মধ্য দিয়া ফুটিয়াছে।

প্রেম নারী হৃদয়ের অপূর্ব্ব দান। নারী চিরদিন বেদনা-ব্যথিত হৃদয়ে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াও প্রিয়তমের মুক্তি দিতে প্রস্তুত। আমাদের সমাজে পৃথিবীর ইতিহাসে 'আত্মদানই রমণীর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম' বলিয়া বিবেচিত হয়। 'নিরুপায়' কবিতায় নারীর এই যে একান্ত অসহায় ভাব, আত্ম নিবেদনে তাহা কেমন কোমল ও মধুররূপে প্রতিভাত হইয়াছে—

"প্রিয়তম, কহ তুমি যাহা ইচ্ছা তব,
যত রুক্ষ তীক্ষ্ণ বাণী আছে গো ভাষায়
সব আনি হান প্রাণে, আমি সয়ে রব
সিক্ত চোখে, মৌন মুখে, আমি নিরুপায়।
তুমি পতি, তুমি প্রভু; মন, মান মম
সকলি তোমার হাতে; দল যদি হায়,
এই রমণীর মন, তাহা, প্রিয়তম,
তোমারি চরণ প্রান্তে লুটাবে ধরায়।

করি যদি অপরাধ, তার যথোচিত
বিধান তোমারি কাছে ; তোমার উপরে।
কেহ নাই, যার দ্বারে হব উপনীত
তব অধিকার হ'তে বিচারের তরে।

*　　*　　*　　*

কর তুমি, প্রিয়তম, যা হয় বিহিত
তোমার বিচারে ; মোর কেহ নাহি আর
এ ধরায় যার দ্বারে হব উপনীত
তব অবিচার হতে লভিতে বিচার।”

রমণীর প্রেম—রমণীর প্রাণ। তাহার অভিব্যক্তি 'মাল্য ও নির্ম্মাল্যের' অনেক কবিতায় আছে ;—

ভালবাসা জীবনের মধু, ভালবাসা নয়নের আলো।

'স্মৃতি-চিহ্ন' কবিতাটির ভাব অতি সুন্দর। কবি বলিতেছেন—

“আপনার নাম

মনোহর হর্ম্ম্যরূপ বিশাল অক্ষরে
ইষ্টক প্রস্তরে রচি, চিরদিন তরে
রেখে যাবে! মূঢ় ওরা, ব্যর্থ মনস্কাম।
প্রস্তর ঘসিছে ভূমে প্রস্তরের পরে,
চারিদিকে ভগ্নস্তূপ, তাহাদের তলে
লুপ্ত স্মৃতি ; শুষ্ক তৃণ কাল-নদী-জলে
ভেসে যায় নামগুলি, কেবা রক্ষা করে।
মানব হৃদয় ভূমি করি অধিকার,
করেছে প্রতিষ্ঠা যারা দৃঢ় সিংহাসন,

দরিদ্র আছিল তারা, ছিল না সম্বল
প্রস্তরের এত বোঝা জড়ো করিবার ;
তাদের রাজত্ব হের অক্ষুণ্ণ কেমন,
কালস্রোত ধৌত নাম নিত্য সমুজ্জ্বল।

'যমুনা-কল্পনা' শীর্ষক কবিতাটিও মাল্য ও নির্ম্মাল্যে স্থান পাইয়াছে, আমরা উক্ত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

তার কূলে কূলে বুঝি বকুল তমাল
করে ফুলছায়া দান
তার জলে জলে ছুটে প্রেমের স্মিরিতি
কল্লোলে বিরহ গান ;
সেথা সমীর-হিল্লোলে বাজে বা বাঁশরী
পরাণ উদাসী করা,
সেথা দিবসের আলো গোধূলি কোমল
আঁধার কৌমুদী-ভরা।

* * * *

আমি কেহ না উঠিতে ত্যজিব শয়ন
জাগিবে না উষা আগে ;
ধীরে উষাকর ধরি সেই পুণ্যজলে
নামিয়া করিব স্নান।
আমি সেই বারিপানে বিশ্বের পিরীতি
অমিয় করিব পান।
কাল প্রভাত-মারুতে, অরুণ-কিরণে
কালিন্দীর শ্যাম-কূলে।

বুঝি ধরার বাঁধন আঁখি হ'তে মোর
সহসা যাইবে খুলে।"

'দীপ ও ধূপ' কবির এই অভিনব কাব্যগ্রন্থখানি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। নিবেদনে প্রকাশক লিখিয়াছেন—"নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত, অযত্নে নষ্টপ্রায় 'আলো ও ছায়া' রচয়িত্রীর বিভিন্ন সময়ের লিখিত, বিভিন্ন ভাবের কতকগুলি কবিতা দীপ ও ধূপ নামে প্রকাশিত হইল। নানা কারণে সঙ্কলন কার্য্যে অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। রচনাকালের ক্রমানুসারে অথবা বিষয় অনুসারে কবিতাগুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, তারিখ থাকা সত্ত্বেও অনেক স্থানে অনবধানতাবশতঃ তাহা মুদ্রিত হয় নাই। মুদ্রণের পূর্ব্বে সংগৃহীত কবিতা হইতে নির্ব্বাচনেরও কোন চেষ্টা হয় নাই। শেষোক্ত বিষয়ে কবি স্বয়ং নিরুৎসুক ছিলেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"যে যাত্রার পর প্রত্যাবর্ত্তন নাই, তাহার জন্য উন্মুখ হইয়া আছি; বাছাবাছির দিকে এখন মন দিতে পারিতেছি না। দেশান্তরে যাইবার সময় কেহ যেমন বহুদিনের সঞ্চিত অনেক কাজের এবং অকাজের সখের জিনিষ প্রতিবাসীদের মধ্যে বিলাইয়া যায়, তাহাদের দামের কথা ভাবে না, অন্ততঃ কিছুদিন কাজে আসিবে বা ভাল লাগিবে এই মনে করিয়াই খুসী হয়, আমার এই কবিতাগুলিও সেইভাবেই দিয়া আমি খুসী।" প্রকাশক জীর্ণ খাতা ও ছিন্ন পত্রাদি হইতে কবির বিচ্ছিন্ন চিন্তাগুলি গ্রন্থবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন।" এই পুস্তকে কবির কতকগুলি অপ্রকাশিত 'সনেট' ব্যতীত, ইংরাজী ১৮৯৩ সন হইতে বিগত ১৯২৯ সন পর্য্যন্ত লিখিত কবিতা ও সনেট স্থান পাইয়াছে।

দীপ ও ধূপের প্রদীপ্ত জ্যোতিঃ ও সৌরভে আমরা সুরভিত হইয়াছি। এই কাব্যের গীতি কবিতাগুলি প্রাণের নিবেদন। কবিই যে বিশ্বমানবের

কাছে অমৃতের সুধাপাত্র আনিয়া দেন 'অমৃতের পথে' আমরা সেই সুরই শুনিতে পাই—

"কবি সে বিশ্বের প্রাণে মিলাইয়া প্রাণ
সুখে দুঃখে সকলেরে শুনাইছে গান ;
তার বুকে বাজে যাহা শুধু নহে তার,
শুনি তাহে শত প্রাণে উঠিছে ঝঙ্কার।
রুদ্রেরে সুন্দর করে, তিক্তে সুমধুর,
ব্যথারে আনন্দ, তার অন্তরের সুর ;
তার অন্তরের আলো মৃত্যুমুখে পড়ি,
অমৃতের জ্যোতিমূর্ত্তি দেখাইছে গড়ি।
চলে যেন স্বপ্নাবেশে, সুপ্ত কিন্তু নহে,
অপরে যা শোনে নাই তাই শোনে, কহে—
অজানার, অনন্তের অফুরন্ত বাণী ;
ধরারে সে ত্রিদিবের কাছে দেয় আনি।"

কবি এই অমৃতের বাণী চিরদিনই পৃথিবীর নরনারীর কাণে শুনাইয়া থাকেন। সেই অমৃতের বাণী আশা ও উৎসাহে জাতির প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া দেয়। মনের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিয়া হৃদয়ে ধ্বনিত হইয়া উঠে,

"কিছু ক'রে যাব, যেতে দিব না বিফলে
দুর্লভ এ জন্ম মম।—"

তখন ভগ্ন, দুর্ব্বল, অশক্ত হৃদয় শক্তি ও বলে বলীয়ান হইয়া দেখিতে পায়—

"অবারিত অসীম প্রসার
মহাকাশে শুনিলাম বচন তোমার

মেঘমন্দ্রে, বৃষ্টিধারে, নদী কলতানে
বৃক্ষপত্রে ফুলে-ফলে বিহঙ্গের গানে।
ভ্রমর গুঞ্জনে আর উজ্জ্বল তারায়—
সার্থক জীবন তার আপনা হারায়
জগৎ জীবনে যেই, জীবনের কাজ
জীবন জাগায়ে রাখা।"

এই সত্য উপলব্ধি করিয়া থাকে। তখন বুঝিতে পারে, চিত্তে এই সত্য প্রকাশিত হয় যে কথায় ও কাজে অনেক প্রভেদ। কথা সে যে—

"ফেনিল উচ্ছ্বাসে
রাশি রাশি শূন্যগর্ভ কথা ভেসে আসে
সমুদ্রের ঢেউ যেন, লয় ভাসাইয়া
কূল হতে, কভু ফিরে যায় তীরে দিয়া
কভু বা অকূলে লয়ে ডুবাইয়া মারে।"

'দীপ ও ধূপের' কবিতা জাতীয় জাগরণের নব প্রদীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় প্রদীপ—নূতন আলোকে সকলকে আহ্বান করিয়াছে।

নূতন সুরে সকলকে বলিতেছে,—ভবিষ্যতের দলকে সম্বোধন করিয়া কবির বাণী দৃপ্ত কণ্ঠে আহ্বান করিতেছে—

"মৃত্যু বরণ করি' যারা মৃত্যুরে জয় করে,
কাঁটার মুকুট হ'তে যাদের নিত্য আলো ঝরে,
তাদের মত ভাষা তোদের, তাদের মত হাস,
তাদের জয়মাল্য গন্ধে শৃঙ্খল সুবাস।
থাক্‌না হাতে হাত কড়া, থাক্‌না বেড়ি পায়ে,
থাক্‌না নিয়ে কারাগারে, দিক্ না ধুলা গায়ে,

পিছে যারা আস্‌ছে তারা উদ্দেশে নমিয়া,
বলবে-ধন্য জন্মভূমি এদের জনম দিয়া।”

‘মুক্তবন্দী’ কবিতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাস বসুকে কারাগারে দেখিয়া লিখিত—

“লৌহদ্বার কারাগারে আজি অকস্মাৎ
মনে হয় ভবিষ্যের পেয়েছি সাক্ষাৎ,
মনে হয় ভারতের ভাগ্য-লিপি খানি
বিধাতার হস্ত হতে ক্ষণতরে আনি
কে মোরে দেখায়ে গেল। এ কি দৃশ্য নব!
কল্পনা স্বপন সব মানে পরাভব।

* * * *

হে চিত্তরঞ্জন আজ, উদ্বেলিত চিতে
স্নেহ আশীর্ব্বাদ সহ আসিয়াছি দিতে
তোমারে আমার শ্রদ্ধা। মতে বা চিন্তায়
নাও যদি দিতে পারি পরিপূর্ণ সায়।

তবু তব হৃদয়ের মহত্ত্বের স্বাদ
লভিয়াছি, অমৃত সে, করি ধন্যবাদ।
ভীতিহীন চিত্ত তব, বিত্ত তুচ্ছ করি,
প্রীতি তব দারিদ্র্যেরে লইয়াছে বরি;
কোন দিন ভোগে মুক্তি ভেবেছিলে মনে,
আজ তুমি ত্যাগে মুক্ত, বসি দেবাসনে।”

দেশের সম্বন্ধে বিবিধ সাময়িক ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক কবিতা ইহাতে লিখিত আছে। তারপর নারী জাতির নব উদ্বোধনের শুভ

শঙ্খধ্বনি কবির কণ্ঠে বজ্র গম্ভীর সুরে ধ্বনিত হইয়াছে। কবি আশাভরা সুরে গাহিয়াছেন—

"নারী-আত্মা এইবার জাগে,
প্রলয় আগুন বুঝি লাগে!
রেখেছিলে যারে অন্ধকূপে,
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রূপে
দাঁড়াবে সে সন্তানের আগে,
এইবার নারী আত্মা জাগে।

*　　*　　*

দাসত্বের ভেঙ্গে হাত কড়া
শাসনের ছিঁড়ে দড়িদড়া
ছুটিয়াছে মুক্তি অনুরাগে
যজ্ঞের বেদীর পুরোভাগে।"

কবির এই বাণী সার্থক হইয়াছে। আজ ভারতের ঘরে ঘরে নারীর অসুরদলনী শক্তি নবীন তেজে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ ভারতের নারী ভারতের প্রাণময়ী শক্তিরূপে আপনার বিশ্ববিজয়িনী মূর্ত্তিতে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

'ঠাকুরমার চিঠি'—নাতিনীর জবাব, নাত্‌বৌর জবাব আমরা সকলকে পড়িতে বলি। তাঁহার রচিত—অম্বা নাটক নানাস্থানের বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভায় বহুবার অভিনীত হইয়াছে।

কামিনী রায়ের কবিতার মূলসুর—বিশ্বাস ও আশ্বাস। জীবন-সমস্যার জটিলতা, সংসার সংগ্রামের যাতনা, মনুষ্য জীবনের বিপদের মধ্যে তাঁহার কবিতা আশ্বাস আনে, নিরাশার অসীম অন্ধকারের মধ্যে আলোকের দীপ্তি আনে, সাধনা আনে, সিদ্ধির পথ প্রদর্শন করে। কাব্যের

অশেষ সৌন্দর্য্যের মধ্যে তাঁহার এই শিক্ষা মহৎ ও সুন্দর। যিনি জগতে সান্ত্বনার দ্বারা নির্জীব প্রাণে সজীবতা আনয়ন করিতে পারেন, যিনি বিশ্ব মানবকে আপনার করিতে পারেন, নীচকেও ভালবাসিতে পারেন, তিনিই শুধু বলিতে পারেন—

"ওরে ক্ষুদ্র, অবজ্ঞাত, ওরে শূদ্র ভাই,
দেবত্বের পথে যেতে কা'রো বাধা নাই।
নিজ দোষে, পর রোষে, পাপে কিম্বা শাপে
জন্মিয়াছ হীন কূলে—এ হেন প্রলাপে
পাতিও না কর্ণ তব। চন্দ্র সূর্য্য যাঁর
জ্ঞানের রচনা, সেই বিশ্ব বিধাতার
পুত্র তুমি, আছে তব উত্তরাধিকার
তাঁর জ্ঞানধনে, প্রেম পুণ্যধনে আর।"

বহুর ভিতরে এই ভাব ও বিশ্বাস আরও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। সেখানে কবি বলিয়াছেন ঃ—

"পেয়েছিনু আশীর্ব্বাদ, করেছিনু আশা
আমার জীবনে হবে পূর্ণ কোন দিন
সেই সুমঙ্গল বাণী। যত স্নেহ ঋণ
আনন্দে করিব শোধ। মোর চিন্তা, ভাষা
বহি লয়ে যাবে দূরে মোর ভালবাসা
পশি বৃহত্তর স্রোতে, যদিও সে ক্ষীণ
পার্ব্বত্য সরিৎ যথা, নিজ নাম হীন,
নগণ্য, মিটাবে তবু বহুর পিপাসা।
আপনার যতটুকু ঢালিব নিঃশেষ,
লুপ্ত ক্ষুদ্র স্বার্থ-সুখ, বহুর ভিতরে

বাড়াইয়া শক্তি, ভক্তি, চেতনা, সাধন,
নাম ধাম, জ্ঞাতি গোত্র, জাতি জন্ম দেশ
সব ভেসে গিয়ে, রবে শুদ্ধ, অনশ্বর
বিপুল জীবন নদ, সত্য সনাতন।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্য চিত্রচয়নেও কবির অসাধারণ দক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়। 'নিশানা' কবিতাটি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ধীরে ধীরে বাও, মাঝি, ধীরে ধীরে বাও,
বলে দেব, কোন্ ঘাটে লাগাবে এ নাও।
দিকে দিকে গেছে খাল, দেখি নাই কত কাল,
নিশানা যা ছিল, জলে ভেসে গেছে তা' ও—
ধীরে ধীরে বাও, মাঝি, ধীরে ধীরে বাও।
গাছে ভরা দুই কূল, দিনেতে হ'তনা ভুল,
দেখা যেত ফাঁকে ফাঁকে আমাদের গাঁও;
চতুর্থী চাঁদের আলো, ঠাহর হয় না ভালো,
সুধাব এমন জন দেখিনা কোথাও;
ছিল লোক যত চেনা, কেহ পথ চলিছে না,
ধীরে বাও, দুই পারে চেয়ে চেয়ে যাও।
দেখতো কেয়ার ঝাড়, আর পূর্ব্ব দিকে তার
বড় শিমূলের দেখা পাও কি না পাও।
সর্ব্বাঙ্গ সাজায়ে ফুলে, হিজল দাঁড়ায়ে দুলে,
ঝুঁকে মুখে দেখে জলে? ভাল করে' চাও;—
বাঁকা হিজলের মূলে বাঁধিব এ নাও।
এ আঁধারে ধীরে মাঝি, কিছু ধীরে বাও।

শ্রীমতী কামিনী রায় বি. এ.

গ্রাম্য ভাষায় বিরচিত দুই একটী কবিতা পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি। 'গাঙ্গ যে মোরে বোলায়'—অতি সুন্দর! এই কবিতার ইতিহাসটি এইরূপ—বাখরগঞ্জের কোন মুসলমান মাঝি নৌকা-ডুবি হইয়া মারা যাইবার পর তাহার বিধবা তাহার বালক পুত্রকে নৌকার মাঝির কাজে যাইতে দিত না। কোন এক রাত্রে যখন সমুদ্রের সন্নিহিত নদীতে জোয়ারের জল প্রবেশ করিতেছে, বানের শব্দে জাগিয়া উঠিয়া বালক এইরূপ বলিতেছে—

ঘুম ভাঙ্গ্‌লো দুফর রাইতে বুকটা ধড়ফড়ায়
দুই চক্ষু আন্ধার ঠেল্যা গাঙ্গের দিকে চায়,
বাঁশের খুঁটি লড়্যা ওঠে, ব্যাড়ায় ব্যাতের বাঁধন ছোটে,
তোমার কাঁদন কাঁটার মত ফোটে আমার গায়,
এমন কালে বোলায় গাঙ্গ্‌—"আয়রে মানিক আয়।"
মাগো গাঙ্গ্‌ যে মোরে বোলায়!

*   *   *   *

আমি যখন পুছি তোরে কোথায় বাপজান,
তুই কও যে পোড়া গাঙ্গে নিছে তান্‌ পরাণ,
তাইনে তুই ডরে মোরে ধর‍্যা রাখ ঘরে,
যাইতে মোরে যাইতে দ্যাওনা রাঙ্গা মিঞার নায়,
তুই সেন মোরে যাইতে দ্যাওনা, কত পোলা যায়।
মাগো গাঙ্গ যে মোরে বোলায়!

*   *   *   *

আমি যখন সারেঙ্গ হমু, চালামু জাহাজ.
তোমার দিলটা ঠাণ্ডা হৈবে দেখ্যা মোর কাজ,

আমার মনে লয় বাপজান যেন কয়,
"মায়ের দুঃখ ঘুচাবি তো ঘর ছাড়্যা আয়—"
মাগো আবার শোনা যায়—
আয়রে মাণিক, দোল খাবিরে ধলা ঢেউ দোলায়।
গাঙ্গই মোরে বোলায়, নাকি বাপজানই বোলায়?
মাগো বাপজানই বোলায়?"

এই করুণ সুরটী প্রাণে বেদনা জাগাইয়া তোলে।

'জীবনের পথে' ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে তাঁহার জীবনের সুখ দুঃখ পূর্ণ কাহিনী আছে। আমাদের দেশে এই বরেণ্যা মহিলা কবির প্রতি দেশবাসীর যেরূপ শ্রদ্ধা, নিবেদন অর্পণ করা উচিত ছিল তাহা হয় নাই। বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির সভ্যবৃন্দ ১৩৩২ সালের ৭ই চৈত্র তারিখে তাঁহাকে এক অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন এবং সাহিত্যপরিষদের বরিশাল শাখা তাঁহাকে ১৩৩০ সালের ৭ই পৌষ এক অভিনন্দন প্রদান করেন। ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রবৃন্দও ১৯৩০ সালের অক্টোবর মাসে তাঁহাকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তাঁহাকে "জগত্তারিণী" পদক প্রদত্ত হইয়াছে।

কবি এক দিন 'আশার স্বপনে' গাহিয়াছিলেন—

আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী—
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।
আর দেখিনু যতেক ভারত সন্তান,
একতায় বলী, জ্ঞানে গরীয়ান,

আসিছে যেন গো তেজো মূর্ত্তিমান্,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।
ঘরে ভারত রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা
গাহিছে উল্লাসে বিজয় গাঁথা।"

কবির এই স্বপ্ন জয়যুক্ত হইতেছে। কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী সার্থক হইতে চলিয়াছে। প্রথম যে দিন কবি মৃদু সুরে গাহিয়াছিলেন—

"আমারে দিওনা দোষ, নূতন সঙ্গীত
উন্মাদক নাহি যদি হয়;
শান্তি সে গোধূলি আলো মৃদু সান্ধ্যানিলে,
নহে ঝড় বজ্র-বিদ্যুন্ময়।

* * *

ধীরে ধীরে চলি, আর ধীরে ধীরে গাহি গান,
চারিদিকে চেয়ে চলে যাই;
মুমূর্ষু পথিক যারা তাহাদেরি কাছে
এ আমার সঙ্গীত শুনাই।"

সত্য সত্যই তাঁহার আশার মধুর ঝঙ্কারে শত সহস্র মুমূর্ষু পথিকের প্রাণ নব বলে সঞ্জীবিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু

যাঁহারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর জীবনকাহিনী পড়িয়াছেন, তাঁহারা উক্ত কবিবরের জ্যেষ্ঠতাত ৺ রাধামোহন দত্ত চৌধুরীর কথা অবশ্য মনে রাখিয়াছেন ; কারণ, তিনিই সাগরদাঁড়ির দত্ত-বংশের সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠাকারী। তিনিই আমার পিতামহ দেব। তাঁহার প্রথমা পত্নী বালিকা বয়সে গতাসু হইলে, দ্বিতীয়বার যে পত্নী গ্রহণ করেন, সেই পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র, আমার পিতৃদেব ৺আনন্দমোহন দত্ত-চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

আমাদের যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামের জমিদার ৺বনমালী বসু আমার মাতামহ দেব। আমার জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী শান্তমণি দেবী তাঁহার আটটি সন্তানের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা।

অতি বাল্যকালে (তখনকার প্রথামত) আমার মাতা-পিতা বিবাহিত হন। বিবাহকালে পিতৃদেবের বয়স এগার, মাতৃদেবীর বয়স পাঁচ বৎসর।

আমার মাতার চারিটি মাত্র সন্তান হয়। দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা। প্রথম, মন্মথমোহন দত্ত-চৌধুরী, দ্বিতীয়, প্রমথমোহন দত্ত-চৌধুরী, তৃতীয় মনোমোহিনী, চতুর্থ আমি—মানকুমারী সর্ব্বকনিষ্ঠা।

আমার জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্বে আমার সহোদরা বসন্ত রোগে মারা যান। কন্যা-বিয়োগে মা বড়ই শোকাকুলা হন। সেই জন্য আমার মাতামহী ঠাকুরাণী এবং দুই বিধবা মাতৃস্বসা, আমার মায়ের পুনরায় একটি কন্যা হইবার জন্য ঠাকুর দেবতাকে অনেক “মানসিক” করেন।

১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ রাত্রিকালে, মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর জন্ম হয়। দেবতার কৃপায় সেই মৃতা কন্যা আবার আসিয়াছে, এই

বিবেচনায় আত্মীয়গণ যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং "যথোচিতের উপরে"ও আমার আদর-যত্ন হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর মেয়ের অদৃষ্টে ইহা ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে।

আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা দূর হইলে আমার জন্য দেবতার পূজা ও ৺হরিঠাকুরের লুট দেওয়া হইয়াছিল। শিশুকালে আমাকে "অভিমানিনী" বুঝিয়াই নাকি আমার নামকরণ হইয়াছিল মানকুমারী।

আমি মায়ের নিকটে বড় থাকিতে চাহিতাম না; বাবার কাছে থাকিতেই ভালবাসিতাম।

ছেলে ভুলানো শক্তি বাবার খুব বেশি ছিল; বাবা কত গান গাহিয়া, গল্প বলিয়া, খেলা শিখাইয়া, পোষা পাখীদের খেলা দেখাইয়া আমাদিগকে একান্ত বশীভূত করিতেন। "আমাদিগকে", কেন না বাড়ীর, পাড়ার এবং গ্রামের অনেক শিশুই বাবার কাছে আসিয়া থাকিত।

যখন আমার জ্ঞানের উদ্রেক হইল তখনই আমি দেখিলাম, আমার বাবা—আমার ঋষিপ্রতিম বাবা ধর্ম্মাচরণ ও জ্ঞানানুশীলন লইয়াই দিন যাপন করেন। বৈষয়িক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে ন্যায়-ধর্ম্মের সীমা পাছে অতিক্রম হয়, এই আশঙ্কায় তরুণ বয়সেই বাবা বিষয়-কর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইলেন। তখন কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বৈষয়িক সমস্ত কার্য্যের ভার দিয়া তিনি জ্ঞান-ধর্ম্মালোচনায় নিরত থাকিতেন। ইহার ফলে বাবার অনেক ভূ-সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আমার মাতৃ-দেবীর বুদ্ধিবলে, আমার মাতুল মহাশয়দিগের আনুকূল্যে সেই সম্পত্তি আবার উদ্ধার করা হয়।

যাহা হউক, আমি অতি বাল্যকাল হইতে আমার মাতা-পিতাকে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি অথবা পুরাণের প্রণব-শক্তির মতই দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাবা পুস্তক-পাঠ, পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনা,

শিবপূজা, পুরমহিলাদিগের নিকটে পুরাণ পাঠ, বালিকাদিগকে সদুপদেশ দান এবং শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া এই সব করিতেন। আর মা কার্য্য-কারকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রের উন্নতি-চেষ্টা, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন, গৃহকর্ম্মে অসাধারণ নৈপুণ্য, এই সব করিতেন। বাবা মা দুজনেরই অপত্য-স্নেহ বড়ই প্রবল দেখিয়াছি।

প্রায় প্রতিদিন বিকালে বাবা পুর-মহিলাদিগকে পুরাণ শুনাইতেন; বালিকাদিগকে সদুপদেশ দিতেন। বাবা বলিতেন, "মিথ্যা কথা বলিও না, পরের জিনিষ চুরি করিও না, কখনও কুপথে যাইও না"—ইত্যাদি। আমি সকলের অপেক্ষা ছোট; সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু কথাগুলি আমার খুব মনে থাকিত।

আমাদের বাহিরের বাগানে একটি বড় বকুল গাছ ছিল। আমি সকাল বেলায় সাথীদের সহিত মিলিয়া ফুল কুড়াইতে যাইতাম। একদিন আমাকে ফেলিয়া সাথীরা আগে ফিরিয়াছিল, আমি আসিবার সময়ে দেখি পথে এক শিংওয়ালা গরু। তখন ভয়ে পড়িয়া নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে, বনের উপর দিয়া অন্য পথে বাড়ী আসিলাম। আসিয়াই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাবাকে বলিলাম, "বাবা! আজ আমি কুপথে গিয়াছিলাম।" বাবা আমার চোখের জল মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন করিয়া কুপথে গিয়েছিলে মা?" আমি বলিতে লাগিলাম, "আপনি ওদের কুপথে যাইতে মানা করিয়াছেন, আমিও কুপথে যাই না, আজ রাস্তার উপরে একটা গরু ছিল বলিয়া কুপথ দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।"

"কুপথ" বিষয়ে কন্যার অভিজ্ঞতা দেখিয়া বাবা কি ভাবিলেন জানি না; আমাকে বলিলেন "আচ্ছা, ভাল পথে যাওয়া আসা করিও!" বাবা সেই দিন হইতে আমাকে লেখাপড়া শিখাইতে মনোযোগ করিলেন।

আমি বাবার কাছে, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীর কাছে এবং আমার

শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু

এক দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম। ঔকার বানান শেষ হইলেই দ্বিতীয় ভাগ ধরিলাম।

দ্বিতীয় ভাগের যুক্তাক্ষর শীঘ্র মুখস্থ হইবে বলিয়া বাবা আমার সহিত সর্ব্বদা বানান করিয়া কথা কহিতেন। যুক্তাক্ষর পড়া শেষ হইলে আমাদের বাহির বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কথামালা লইয়া পড়িতে স্কুলে চলিলাম। আমার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ দুই মাসের পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল—এরূপ স্বেচ্ছাচারিতায় বাবা কিছুই বলিলেন না।

বিদ্যালয়ে যাইবার সময়ে বাবার আদেশ মত ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপায় পাঠ আমি খুব শীঘ্র শিখিতে লাগিলাম; কিন্তু হাতের লেখার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতাম না। পণ্ডিত মহাশয় আমার পাঠনা বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়াই হউক, আর বাবার আদুরে মেয়ে বলিয়াই হউক, আমার লেখার জন্য বা অন্য কোন কারণে আমাকে কোনদিন রুক্ষ শাসন করিতেন না।

এই সময়ে আমি ঘরে বসিয়া বাবার পুস্তক সকল অর্থাৎ কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীখণ্ড, হর-পার্ব্বতী-মঙ্গল প্রভৃতি পড়িতাম আর পুরবাসিনীদিগের অনুকরণে, বাবা মা দাদা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের উদ্দেশে কৃত্রিম পত্র লিখিতাম। সেই সকল পত্র সাথী-দিগের পড়িয়া শুনাইতাম; সে লেখা এত অস্পষ্ট, যে অন্য কেহ তাহা পড়িতে পারিত না।

আমার দাদা স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তখন তিনি আমাদের মাতুলালয়স্থ এনট্রান্স স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন এবং মাতুল মহাশয়-দিগের নিকট হইতে জমিদারী কার্য্য-কলাপ শিক্ষা করিতেন। তিনি সেখান হইতেও আমার ভ্রাতৃজায়ার লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি

আমার ভ্রাতৃজায়াকে নারী-শিক্ষা, সুশীলার উপাখ্যান, গৃহকর্ম্ম, কুমুদিনী চরিত, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ প্রভৃতি পুস্তক পাঠাইয়া দিতেন। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ও অন্যান্য সমবয়স্কাগণ সেই সকল পুস্তক পাঠ করিতেন। দ্বিপ্রহর সময়ে আমাদের অন্তঃপুরে বিলক্ষণ বিদ্যানুশীলন হইত। আমার সধবা ভ্রাতৃজায়া "বামাবোধিনীর" গ্রাহিকা ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় বামা রচনা দেখিয়া তাঁহারাও গদ্য পদ্য রচনা করিতেন। এই সব দেখিয়া আমারও "রচনা" করিতে মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত। কিন্তু উহারা কি বলিবেন, এই লজ্জা ও সঙ্কোচে সে ইচ্ছা আমি প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

আমার মনে হয়, একদিন আমার এক ভগিনীকে দিয়া একখানি ছোট খাতা বাঁধিয়া লইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "খাতাখানা আমার কাছে দে, আমি তো'কে গান লিখিয়া দিব।" আমি তাহা দিলাম না। অতি নির্জ্জনে বসিয়া সেই খাতা এবং দোয়াত কলম লইয়া তাহার নামকরণ করিলাম "লাইবাইটের উপাখ্যান।" চরিতাবলীর "অদ্ভুত" নামগুলি শুনিয়াই "লাইবাইট্" নাম আমার মাথায় আসিয়াছিল। কিন্তু সে লাইবাইট্ "পুস্তকে" কি লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার ভাল মনে নাই। বোধ হয় যেন যে সব উপকথা শুনিতাম, তাহারই এক "সংস্করণ" করিয়াছিলাম। যাহা হউক সেই লাইবাইট্ই আমার প্রথন রচনা। মনে হয়, তাহা গদ্য। তারপর আমি পদ্য রচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। বাড়ীর লোকে জানিতে পারিলে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবেন, আমিও রচনা করিতেছি এমনতর অস্বাভাবিক কথা শুনিলে লোকে কি বলিবে, এই সব ভয়ে এতটা গোপন করিতাম। তখন আমার বয়স সাত বৎসরের অধিক নহে। সে সব রচনাও অবশ্য মাথা-মুণ্ড রকমের।

আমি গান শুনিতে বড় ভালবাসিতাম। গান শুনিতে শুনিতে আমার

মন এত আকৃষ্ট হইত যে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। উপকথা শুনিতেও আমি ঐ রকম ভালবাসিতাম। বাবা আমাকে উপকথারূপে রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। বাবার কর্ম্মচারী গোবিন্দ কাকা, পুরাতন ভৃত্য মধুদাদা, মা এবং অন্যান্য সকলে খাঁটি উপকথা বলিতেন। আমি উহা তন্ময়রূপে শুনিতাম। তখন আমার মন বড় নরম ছিল; কাহারও কোন বিপদ শুনিলে আমার হৃদয়ে ভয়ানক যন্ত্রণা হইত। বাড়ীর কাহারও কোন অসুখ হইলে আমি আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া, যথাশক্তি তাহার শুশ্রূষা করিতাম; বাবার পুরাতন ভৃত্য আমার মধুদাদা মরিয়া গেলে আমি তাঁহার জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত লুকাইয়া কাঁদিতাম।—কেননা মানুষের সাক্ষাতে সহজে কাঁদিতে আমার লজ্জা করিত। এইরূপ প্রবৃত্তি বশতঃ উপকথার "লোক" দিগের কোন বিপদ শুনিলেও আমার প্রাণ বড় আকুল হইত। অভিমন্যুর মৃত্যু-কথা শুনিয়া, রাজকন্যার পিতৃবংশ রাক্ষসে খাইল শুনিয়া, অথবা "চীল-মাকে" গরম জলে পোড়াইল শুনিয়া, আমি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতাম; কয়দিন পর্য্যন্ত মনে মনে সেই বেদনা অনুভব করিতাম। সেই জন্য বাবা নিষেধ করিয়াছিলেন, যেন কেহ আমাকে ঐ রকম "বিয়োগান্ত" উপাখ্যান না

আকাশে মেঘোদয় হইলে আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। আমি ভাবিতাম, উপকথায় যাঁহাদের কথা শুনি, সেই সব লোক এখন স্বর্গে গিয়া ঐ মেঘের ভিতরে ঘর-বাড়ী করিয়া আছেন। কোন মেঘ দেখিয়া ভাবিতাম, ঐ নীলধ্বজ রাজার বাড়ী—উহার মধ্যে জনা, প্রবীর প্রভৃতি আছেন; কোনও মেঘ দেখিয়া ভাবিতাম, উহা গিরিরাজের বাড়ী—মধ্যে মেনকা উমাকে খেলনা দিতেছেন, কোনও মেঘে, রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সভায় বসিয়া আছেন, এই সব কল্পনা করিতাম। আবার এই

কল্পনা সাথীদিগকে বলিতাম, আমি সত্য দেখিয়াছি বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। আমিও সত্য বলিয়া ভাবিতাম।

এই সময়ে অর্থাৎ আমার বয়স যখন আট বৎসর তখন আমার স্মরণ-শক্তি প্রবলা হইয়াছিল। পদ্যপাঠ, চারুপাঠ, বস্তুবিচার, শিশুবোধ ব্যাকরণ, এই সকল পাঠ্য গ্রন্থ অতি সহজে আমার মুখস্থ হইয়া যাইত। হস্তাক্ষর তখনও ভাল ছিল না।

আমি চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসিয়া উপকথা রচনা করিয়া খাতায় লিখিতাম। সেই লেখা দুই একজন বালক দেখিয়াছিল, আমাকে বলিয়াছিল, "ইহা কখনও তোমার রচনা নয়"—আমার বড় রাগ হইল; আমি ইহার পরে পদ্য বা গদ্য অর্থাৎ উপকথা যাহা লিখিতাম, কাহাকেও দেখাইতাম না, বাবাও জানিতেন না। একদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া দেখিলাম বাবার হাতে আমার পদ্যের খাতা। আমি লজ্জা, সংকোচ, আরও কি জানি কি "অদ্ভুত" ভাবে যেন মরিয়া গেলাম—আমার কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু বাবা খুব স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! এ খাতায় কার রচনা?" আমি বাবার আদেশে মিথ্যাকথা বলিতাম না; অনেক ভয়ে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলাম, "আমার রচনা বাবা!" বাবা বড় আনন্দিত হইয়া আমাকে বুকে টানিয়া লইয়া খুব আদর করিলেন। বাবা বিশ্বাস করিলেন, আমাকে ধমক দিলেন না, ইহাতে আমি বাঁচিলাম।

যে খাতার জন্য আমার বুকের ভিতরে এমন মহাপ্রলয় হইতেছিল, তাহার ভিতর রচনার দুইটী ছত্র মাত্র আমার স্মরণ আছে, তাহা এই :—

"রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার,
ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।"

গদ্য রচনারও একটু নমুনা দিলাম; "এক রাজ-কন্যার বারাণ্ডায় এক ঝাঁক পাখী আসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে রাজকন্যা একটি পাখী

ধরিয়াছিলেন ; তাহার গায়ের রং লাল, সবুজ, হলুদে আর কালো ; এমন সুন্দর পাখী কেহ কখনও দেখে নাই ; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটী বাদুড় !”

এই রচনা দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়াদ্বয় হাসিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, আমি ভয়ানক অপ্রতিভ হইয়াছিলাম ; সৌন্দর্য্যের শেষ উপমেয় “বাদুড়” হওয়া যে এত হাসিবার কথা তাহা আমি মোটেই বুঝি নাই, কারণ “বাদুড়” আমি তখন মোটেই দেখি নাই।

যাহা হউক আমার পদ্য রচনা দেখিয়া বাবা বলিলেন—“মা! তোমার পদ্য বেশ হইয়াছে ; এখন হইতে প্রত্যহ যাহা নূতন দেখিবে, তাহাই একটী পদ্য করিয়া আমাকে দিবে”—আমি বড়ই উৎসাহ পাইলাম।

ইহার দুই একদিন পরে বাবার বৈঠকখানার খোলা ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া আমার তৎকালোচিত বুদ্ধির হিসাবে এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে ঘটনাটি এই ঃ—

আমাদের এক প্রতিবাসিনী “সখী তেলিনী”র বাড়ীর নিকটে একটি ডোবা ছিল, লোকে তাহাকে “সখীর কূয়া” বলিত। তখন গ্রীষ্মকাল, সে ডোবার জল শুকাইয়া সেখানে সুন্দর দূর্ব্বা ঘাস হইয়াছিল, একটি গাভ তাহা খাইতেছে দেখিয়া সখী সে গাভীকে খুব গালি-গালাজ দিল ; কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করিল না দেখিয়া ছোট একগাছি লাঠি দিয়া তাহাকে তাড়াইতে লাগিল। ঐ প্রহার দেখিয়া আমার বুকে একটু বাজিল। আমি ঘরের ভিতরে গিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বাবা! ভাল কথায় কূয়াকে কি বলিতে হয় ?” বাবা বলিলেন, “কূপ বলিতে হয়।” তখন আমি ছাদে আসিয়া কবিতা লিখিলাম।

“জল শুকাইয়া কূপ হয়ে গেছে মাটি ;
গাভীতে খেতেছে তাহে ঘাস চাটি চাটি ;

আসিয়া সখী তেলিনী মারে ঝাঁটা লাঠি ;
মোর মনে হয় বাবা; তার নাক কাটি।"

এই কবিতা বাবার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া আমি দৌড়িয়া পলাইলাম। একদিন শুনিলাম, বাবা তাঁহার বন্ধুদিগের কাছে বলিতেছেন, "আমার মেয়েটির উপরে মা সরস্বতী দয়া করিবেন এমন ভরসা হইতেছে; আমার মেয়ে এই বয়সেই কবিতা রচনা করিতে শিখিতেছে।" তাঁহারা কেহ কেহ বলিলেন, "আপনাদের বংশে তো মা সরস্বতীর দয়া মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।" *

বাবা শিশুকাল হইতেই আমাকে দীনদুঃখীদিগকে দান করিতে শিক্ষা দিতেন এবং বিপন্নকে দয়া করিতে বলিতেন। সেজন্য কাণা, খোঁড়া, বৃদ্ধ ও ভিক্ষুকদিগকে দেখিলে আমি যথাশক্তি তাহাদের উপকার করিতাম। শেষে যখন অভ্যাস হইল, তখন আর "বাবার আদেশ বলিয়া নহে; দুঃখী বা বিপন্ন দেখিলে আমার হৃদয় সহানুভূতি-পূর্ণ হইত। তাহাদের জন্য মা'র কাছে পয়সা কাপড়, চাউল প্রভৃতি প্রার্থনা করিতাম; আমার মা চিরদিনই দান করিতে মুক্তহস্তা; আনন্দের সহিত আমার সেই সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।

আত্মীয়দিগের অত্যধিক যত্ন আদর পাইয়া আমার স্বভাবে কতকগুলি দোষ জন্মিয়াছিল। আমি যখন যে বাহানা করিতাম, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হইত, সেজন্য আমি বড় "একগুঁয়ে" হইয়াছিলাম; যাহা ধরিতাম, তাহা সম্পন্ন হইলে তবে ছাড়িতাম। প্রায় সকল বিষয়ে ঐ রকম ছিলাম। সহজে

---

* যাঁহারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন আমার এক পিতামহ ৺মাণিকরাম দত্ত সুকবি ছিলেন। আমাদের বংশে আরও কেহ কেহ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আমার পিতৃদেব দুর্গাস্তব, শিবস্তব, গণেশ-বন্দনা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন (মাইকেল) কাকা মহাশয়ের কবিত্ব-শক্তি তো তাঁহাকে অমরতা দিয়াছে।

কেহ আমাকে রুক্ষ শাসন করিতেন না। কদাচিৎ আমার বাহানায় অধীরা হইয়া মা একটু ধমক চমক করিতেন, কিন্তু বাবার কাছে আমার সাতখুন মাপ; আমার সেই বিরক্তিকর বাহানাও বাবার কাছে খুব আমোদ বলিয়া বোধ হইত। সেই জন্য কেহ আমাকে একটু কটূক্তি বা কুব্যবহার করিলে আমার বড়ই অভিমান হইত।* আরও দোষ ছিল, আমি "স্নেহনীড়ে" পালিতা বলিয়া লোক ব্যবহার বুঝিতাম না—আমার সামাজিক বুদ্ধির অভাব ছিল। সেজন্য কত দুষ্ট মেয়ে আমাকে ফাঁকি দিয়া আমার খেলনা চুরি করিত, কত রকম চাতুরী করিয়া আমার অনিষ্ট করিত, আমি কিছুই বুঝিতাম না, শেষে মা ভর্ৎসনা করিলে কাঁদিতে বসিতাম। আরও এক দোষ ছিল, আমি গৃহকর্ম্ম কিছুই করিতাম না—শিখিতাম না; আমার মা, ভ্রাতৃজায়াদ্বয়, পিসিমা, ঝি, চাকর প্রভৃতি কোন দিন ঘড়া হইতে আমাকে এক গেলাস জল ঢালিতে দেন নাই, কি একটি সলিতা পাকাইতে দেন নাই। আমিও সে-সব কিছু করিতে ইচ্ছা করি নাই। এক পীড়িতের শুশ্রূষা ভিন্ন আর কোনও কাজ করিতে জানিতাম না।

আমার দাদা প্রবাসে থাকিতেন, তাহা বলিয়াছি। একমাত্র অনুজা বলিয়া তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন বটে, কিন্তু মাতা-পিতার অত্যধিক আদরে আমার "পরকাল নষ্ট হইল" বলিয়া অনেক সময় আমাকে বিশেষ

---

* আমার সেই অভিমান ও একগুঁয়েমী হইতে একটি বিশেষ উপকার হইয়াছিল। আমার হস্তাক্ষর অতি জঘন্য ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমাদের স্কুলে একজন নূতন শিক্ষক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিকটে আমরা সকল ছাত্রী হস্তলিপি দেখাইতে-ছিলাম; শিক্ষক আমার হস্তাক্ষর সকলের অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখিয়া অবজ্ঞাভরে ফেলিয়া দিলেন। আমার বড় অভিমান হইল। আমি একগুঁয়ে ছিলাম কি না, তাই প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক ঘরে বসিয়া কেবলই লিখিতে লাগিলাম। এক সপ্তাহ পরে আবার যেদিন সকলে লেখা দেখাইলাম সেদিন শিক্ষক মহাশয় আমার হস্তাক্ষর সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিলেন।

শাসন করিতেন। দাদা বাড়ী আসিলে আমি "চোরের" মত হইয়া থাকিতাম। সকলের চেয়ে তাঁহাকে বেশি ভয় করিতাম।

আমার পিত্রালয় সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঁচ-ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিত্যানন্দ-কাটী গ্রাম। সেখানকার বসু মহাশয়েরা ধন, মান, বিত্যাবত্তা এবং লোকহিতকর কাজের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার এক পিতৃব্যের দুইটি কন্যা ঐ বসু মহাশয়দিগের গৃহে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। আমার সেই দিদিদিগের কয়টি দেবর কার্য্যোপলক্ষে একদিন আমার সেই পিতৃব্যের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজনকে দেখিয়া আমার মাতৃদেবী, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং সচ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া, নিজ জামাতা করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। ক্রমে সেই পাত্রের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেন।

এই বিবাহের সম্বন্ধ শুনিয়া হিংসা দ্বেষাদি প্রযুক্ত অনেক আত্মীয়-কুটুম্ব এই বিবাহ যাহাতে না হইতে পারে, এমন চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিকূলে মানুষে কি করিতে পারে? আমার মাতা-পিতা, সহোদর, মাতুল প্রভৃতি আত্মীয়দিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, বাবা তাঁহার স্নেহের কন্যাকে মহাসমারোহপূর্ব্বক, ১২৭৯ সালে ৭ই মাঘ তারিখে, সেই মনোনীত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

"বিবাহ" রূপে হিন্দু-সমাজে বালিকাদিগকে এক অন্ধকার-পূর্ণ ভবিষ্যৎ-রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সেখানে হয় তাহার ভাগ্যে সুখের চন্দ্রমা না হয় দুঃখের অমানিশা উপস্থিত হইয়া থাকে। ভগবানের দয়াকে সহস্র ধন্যবাদ, আমি যে মাতা-পিতার সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিলাম, তাঁহা-দিগের স্নেহ ও সুবিবেচনায় সহস্র ধন্যবাদ, আর আমার দাদা এবং আত্মীয়-বন্ধু যাঁহারা আমার সেই বিবাহে অত আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সদাশয়তাকেও সহস্র ধন্যবাদ। বাবা আমাকে সেই বালিকা

বয়সে যাঁহার হাতে দিয়াছিলেন তিনি ধার্ম্মিক, কৃতবিদ্য, সংযত, সুশীল ও চরিত্রবান।—আমার মনে হয় আমি কোন প্রকারেই তাঁহার যোগ্যা পাত্রী ছিলাম না!—তার পরে আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি যে রকম অদ্ভুত রকমের ছিল তাহাতে যদি কোন অধর্ম্মাচারী, অসহিষ্ণু, নির্ম্মম, স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়িতাম, তাহা হইলে আমার দুঃখের পরিসীমা থাকিত না।

বাল্য বিবাহের ফলে আমি তাঁহার গুণের মর্ম্ম বুঝিবার অবকাশ পাই নাই, জল, বায়ু, আলোকাদির মত তাঁহার স্নেহ, দয়া ও শুভাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সহজপ্রাপ্য বলিয়া আমি তাঁহার বিশেষত্ব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার প্রতি আমার মাতা-পিতার একান্ত আদর ও যত্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম; তাঁহাকে খুব সম্ভ্রম করিতাম; শিক্ষকের নিকটে ছাত্রী যেমন বিনীতা, আমিও তাঁহার কাছে সেইরূপ বিনীতা থাকিতাম। আমি যে কবিতা রচনা করিতে পারি, এ কথা যাহাতে তাঁহার কর্ণ-গোচর না হয়, সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতাম। তিনি উহা জানিলে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইব, ইহাই আমার ধারণা ছিল।

বিবাহের সময়ে চারি পাঁচ দিন শ্বশুরালয় গিয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, ননন্দা, যা প্রভৃতি নূতন আত্মীয়দিগের যথেষ্ট আদর পাইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। তখনও আমার লেখাপড়া চলিতেছিল। বাবার বৈঠক-খানায় বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাকে পড়াইয়া যাইতেন। আমি বারো বৎসরে পড়িতেই সেই শিক্ষক অন্যত্র চলিয়া গেলেন; অন্য নূতন শিক্ষকের কাছে আমাকে আর পড়িতে দিলেন না। তখন আমি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতাম।

তেরো বৎসর বয়সে পড়িয়াই অর্থাৎ বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইবামাত্র আমাকে দ্বিতীয় বার শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল। আমার এক-গুঁয়েমী

এবং অভিমানাদির জন্য পাছে সেখানে গঞ্জনা পাই, সেই ভয়ে মা আকুল হইয়াছিলেন। মা'র আকুলতা দেখিয়া ঐ সকল দোষ পরিত্যাগ করিব—অন্ততঃ আমার শ্বশুর বাড়ীতে কেহই আমার ঐ-সকল দোষের পরিচয় পাইবেন না ইহা আমি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম।

আমার শ্বশুরালয়ে গিয়া দেখি, তাঁহারা বৃহৎ পরিবার। তাঁহাদের বাটির মধ্যে একটি বারান্দায় বালিকা-বিদ্যালয় হইত। একজন অতি সচ্চরিত্র আত্মীয় শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ীর এবং পাড়ার প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা সেখানে পড়া-শুনা করিত; তাহার মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিতাও ছিলেন। আমার অন্যতম শ্বশুর স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি এবং লোকহিতকর কার্য্যে একান্ত মনোযোগী ছিলেন। * তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় আমার শ্বশুর পরিবারে, অন্যান্য পরিবার অপেক্ষা গৃহ-শিক্ষা বিশেষরূপে হইয়াছিল। মেয়েদের মধ্যে পরিচ্ছদের উন্নতি দেখিয়াছিলাম। মিশনরী মহিলাদিগকে বিদ্যানন্দকাটীতে আনিয়া মেয়েদিগকে সেলাই শিখান হইত। আমি দেখিলাম আমার প্রাচীনা শাশুড়ীরাও চস্‌মা চোখে দিয়া মহাভারত, রামায়ণাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। বাড়ীতে মাইনর স্কুল, পোষ্টাপিস ছিল। এ-সব আমার সেই দেবতুল্য শ্বশুর ঠাকুরের যত্ন ও চেষ্টায় হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম সেখানটা আমার ভাল লাগিত না। আমার পিতার সেই স্নেহ-ভবন—সেখানে আমার জন্য মাতা-পিতার প্রাণ-ভরা স্নেহ, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়াদিগের দয়া-মমতা, সঙ্গিনীদিগের প্রীতি, সকলেরই আত্মীয়তা-পরিপূর্ণ আশ্বাস, সেই গৃহে ফিরিয়া যাইতেই ইচ্ছা যাইত। তার পরে সেখানে অনেক লোক ছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃতিও নানা রকম। আমাকে "অদ্ভুত জীব" দেখিয়া অর্থাৎ আত্ম-গোপন করিতে অক্ষম, ছলনা-চাতুরীতে অনভ্যস্ত এবং গৃহ-কর্ম্মে অশক্ত, এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া অনেকে

* ৺রাসবিহারী বসু। ইনি ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কেবল আমি বলিয়া নহি, বঙ্গ-গৃহের অনেক বালিকা বধূকেই এইরূপে "মানুষ" হইতে হয়।

যাহা হউক ক্রমে ক্রমে আমাকে বিনীতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দেখিয়া গুরুজনেরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। আর আমার তখনকার সরলতা ও কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া ননন্দা প্রভৃতি সমবয়স্কাগণ আমাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন। এখানে আমি এক-গুঁয়েমী ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলকে প্রসন্ন করিতে এবং গৃহকর্ম্ম শিখিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার জ্যেষ্ঠা জা শিল্প কাজে সুনিপুণা, তাঁহার নিকটে সেলাই শিখিলাম।

তখন পতি-দেব কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটিতে বাটী আসিয়া আমার ননন্দাদিগের নিকটে আমার কবিতা রচনার কথা শুনিলেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ এক একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। তিনি যে আমার পরম সুহৃদ্ শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া তাহাই আমার বিশ্বাস হইল। ক্রমশঃ তাঁহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে আমি সহস্র গৃহ-কর্ম্মের মধ্যে দিনের বেলায় এক একটি পদ্য লিখিয়া রাত্রিতে তাঁহাকে "উপহার" দিতাম। এই কাজ খুব গোপনে করিতে হইত। কারণ, তখনকার দিনে এরূপ কাজ বড়ই "লজ্জার," বড়ই "অসমসাহসের" এবং "বিরক্তি"র বিষয় হইত। যাহা হউক স্বামী ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইতেন এবং পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত উহা পাঠ করিতেন। বন্ধুগণ সেই কবিতার সুখ্যাতি করিতেন; কিন্তু আমি পাছে সুখ্যাতি শুনিয়া অহঙ্কৃতা হইয়া উঠি, এজন্য স্বামী অত্যন্ত সতর্ক হইতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি আমার নিকটে—যিনি আমাদের বঙ্গ-মহিলা-কুলের

শীর্ষস্থানীয়া সেই "দীপনির্ব্বাণ" "ছিন্নমুকুল" রচয়িত্রী, সুকবি স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণের আদর্শ রচনা শক্তি আমার সম্মুখে ধারণ করিতেন। আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে তাঁহার মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত, কিন্তু তিনি সময় ও সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার নিজের পাঠ্যাবস্থা, সেজন্য অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায়ই থাকিতেন; যে সময়ে বাটী আসিতেন, তখন গুরুজনদিগের শাসনে, লজ্জার অনুরোধে দিনের বেলায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত না। রাত্রি ১২টা ১টার সময়ে যখন শয়ন গৃহে যাইতাম, তখন আমি পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি আমার অসুস্থতার আশঙ্কায় নিষেধ করিতেন; সেইজন্য তাঁহার কাছে আমার লেখাপড়া হইত না।

আমার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন আমি "পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা" শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে, বীররস-পূর্ণ একটি কবিতা লিখিয়া স্বামীকে দিয়াছিলাম; তাহার প্রথম কয়েক ছত্র এই—

"দুরন্ত যবন যবে ভারত ভিতরে
পশিল আসিয়া, পুরন্দর মহাবলী
কেমনে সাজিলা রণে, প্রিয়তমা তার
ইন্দুবালা কেমনে বা করিলা বিদায়?
কৃপাকরি কহ মোরে হে কল্পনা দেবী!
কেমনে বিদায় বীর হ'ল প্রিয়া কাছে।"

পদ্যটি সুদীর্ঘ হইয়াছিল। স্বামী এবং তাঁহার কলিকাতার বন্ধুগণ ইহা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হন। কিছুদিন পরে একজন বন্ধু এই কবিতাটি "সংবাদ-প্রভাকর" পত্রে মুদ্রিত করেন। ইহাই আমার প্রথম প্রকাশ্য লেখা।

কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া উক্ত কাগজের সম্পাদক টীকায় লিখিয়াছিলেন, "আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন

দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী ; ইনি ইঁহার পিতৃব্য-সৃষ্ট বাঙ্গালা অমিত্রাক্ষরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শত-নরী হার পরাইলাম। চর্চ্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব করিবে।"

ইহা দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্ব্বিতা হইও না। দেখ দেখি, তোমার কাকা কত বড় ক্ষমতাপন্ন কবি ছিলেন ; তুমি তাঁহার উপযুক্তা ভ্রাতুষ্পুত্রী হইলে তবে আমার মুখোজ্জ্বল হইবে। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়াই সকলে এতটা প্রশংসা করে।"

যাহা হউক, আমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়া দুই বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং উপন্যাস লিখিয়াছিলাম। তাহা স্বামীর কাছে দিয়াছিলাম ; তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর একান্ত প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্বামী আমাকে কলিকাতা হইতে ইংরাজী শিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আদেশে আমি আনন্দের সহিত আমার একখানা খাতাকে সঙ্গিনী করিয়া বাটীর বালকদিগের নিকটে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।

আমার বয়স যখন সতর বৎসর তখনই আমার একমাত্র সন্তান—আমার কন্যাটি ভূমিষ্ঠা হয়। তখন আমি পিত্রালয়ে ছিলাম।

আমার কন্যার বয়স যখন কুড়ি দিন তখন আমার পরমারাধ্যতম স্নেহময় বাবা আমাদিগকে অকূল শোক-সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশে আমি একটি শোক-গাথা লিখিয়াছিলাম। তারপর অনেকদিন আর লেখাপড়া করিতে পারি নাই।

পর বৎসর স্বামী মেডিকেল কলেজ হইতে এল্, এম্, এস্ (L. M. S.)

উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে এবং কলিকাতা থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিয়া উপাধি লইয়া বাটী আসিলে কিছুদিন পরে আমাদের কন্যাটী এবং বাটীর অনেকে পীড়িত হন। তাঁহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা তিনিই করিতে লাগিলেন।

সেই বৎসর আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার স্ত্রী কতকগুলি শিশু-সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতেও আমি যারপর-নাই আকুল হইয়াছিলাম। সেদিন পতিদেব আমাকে যে স্নেহপরিপূর্ণ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহা আজিও মনে হইলে আমার প্রাণ লোকাতীত রাজ্যের আরাম উপভোগ করে।

কিন্তু আমার অদৃষ্টে এত সুখ ও সৌভাগ্য বেশী দিন সহিল না! আমার শ্বশুরঠাকুরের অনুরোধে এবং কয়েকটী সম্ভ্রান্ত বন্ধুবান্ধবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে স্বামী সাতক্ষীরা মহকুমায় ডাক্তারি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে "সুদক্ষ চিকিৎসক" বলিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইলেন। তু'জনেই মনে করিয়াছিলাম, এইবারে আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইল। তিনি আমাকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "এইবার আশ্বিন মাস হইতে তোমাকে, খুকিকে এবং আমার ছোট ভাই তু'টীকে আমার কাছে লইয়া যাইব।" আমার এক ননন্দা পীড়িতা হওয়াতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। তুই তিনদিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া ২৭শে বৈশাখ সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। আমরা উভয়েই আশ্বিনমাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

শ্রাবণ মাসে তাঁহার দারুণ পীড়ার সংবাদ আসিল। আমার শ্বশুর, আমার অন্যতর ডাক্তার দেবর, আমার দাদা প্রভৃতি একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। কেহ আমাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন না। আমি হিন্দু কুলবধূ, লজ্জায় ভয়ে কিছুই বলিলাম না। কেবল

তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইবাব জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম; কেবল তাঁহার মঙ্গল-কামনায় ভগবানকে ডাকিলাম। এই সময়ে এক সদাশয়া সহৃদয়া বিধবা মহিলা আমাকে যে রকম আশ্বাস ও শক্তি দিতেন, তাহা আমার মনে চিরদিনই মুদ্রিত হইয়া আছে।

তারপরে আর কি বলিব? সংবাদ পাইলাম, যিনি আমার রমণী-জীবনের অবলম্বন, আমার সেই পরোপকারী, দয়ালু দেবপ্রতিম পতিরত্ন, তিনি ২৯শে শ্রাবণ সোমবারের রাত্রিতে আমাকে জগতের দুয়ারে হতভাগিনী করিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া গিয়াছেন! ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যানন্দকাটীর বাটীতে থাকিয়া আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।*

তখন আমার বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই—সাড়ে আঠারো।

অতি বাল্যকাল হইতে ভগবানকে আমি ভক্তি-বিশ্বাস করিতাম। আমার পিতৃদেব এই ভক্তি-বিশ্বাসের বীজ বপন করেন এবং স্বামী ইহার বিকাশ সাধন করেন। যে কোন বিপদ বা ভয়ের সম্ভাবনায় আমি সেই বিপদ-ভঞ্জন দেবতার অভয়চরণে শরণ লইতাম। কিন্তু যখন সেই সর্ব্ব-শক্তিমান দেবতা থাকিতে আমার এমন সর্ব্বনাশ হইল, তখন তাঁহার করুণার উপরে আমি অবিশ্বাসিনী হইলাম। তাঁহার উপরে আমার ভয়ানক রাগ হইল।

অতি বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এইরূপ হইয়াছিল যে, কোনরূপ সুখ-দুঃখাদি কর্ত্তৃক আমার মন একটু উত্তেজিত হইলে আমার একটি কবিতা হইত। এই কবিতা প্রায়ই পদ্য, সময়ান্তরে গদ্য কবিতাও লিখিতাম। আমি যখন সেই তরুণ বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার হৃদয় পিষিয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে

* আমার স্বামীদেব পরলোক গমন করা অবধি আমি তাঁহার বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য অথচ সত্যবিষয়ক স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমার পারিবারিক আত্মীয়দিগের মধ্যে অনেকে তাহা জানেন।

লাগিল। এই শোকোন্মাদ অবস্থায় আমার গদ্য-কাব্য "প্রিয়-প্রসঙ্গ" রচিত হইয়াছিল। উহা কেবল নিজের মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই লিখিতাম; বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য কোন চিন্তা করি নাই।

আমার একজন কৃতবিদ্য আত্মীয় তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে ঐ হস্ত-লিপি দেখিতে পান, এবং উহা ছাপাইলে বিধবা রমণীগণের একটা সান্ত্বনার জিনিস হইবে এইরূপ পরামর্শ দেন। আমার স্বর্গীয় পতিদেবের একটি স্মৃতি রক্ষা হইবে, ইহা মনে করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আমি একান্ত উৎসুক হই। আমার স্বামীর পরলোক গমনান্তে আমার আত্মীয়গণ, তাঁহার কিছু অর্থ আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই অর্থ দিয়া আত্মীয়ের নিকটে উহার মুদ্রাঙ্কনের ভার প্রদান করি। পুস্তকে আমার নাম এবং পরিচয় দিতে নিষেধ করি। এই কাজ খুব গোপনে করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয়, তখন আমার যে রকম লজ্জা সঙ্কোচাদি ছিল, তাহাতে যদি আমার মন সেরূপ অপ্রকৃতিস্থ না হইত, তবে আমি "প্রিয়-প্রসঙ্গ" ছাপাইতে পারিতাম না। যাহা হউক, "প্রিয়-প্রসঙ্গ" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে, আমার আত্মগোপনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অনেকে বুঝিতে পারিলেন আমিই উহার রচয়িত্রী। তখন অনেক হিংসা, দ্বেষ, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আমাকে সহিতে হইয়াছিল। আমার এত আদরের "প্রিয়-প্রসঙ্গ"ও সাধারণের কাছে আদৃত হয় নাই। বিজ্ঞাপনাদি অভাবে অনেকে উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনেক দিন জানিতে পারিলেন না। সেই সময়ে আমার স্বর্গীয় পতিদেবের স্নেহময় অগ্রজ, আমার সদাশয় দেবপ্রতিম ভাশুর মহাশয়, উহা বিশেষ আদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়াছিলেন।

যখন ক্রমশঃ দিন যাইতে লাগিল, তখন কেবল গুরুজনের সেবা, শিশু-পালন অথবা সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না।

বাকী জীবনটি কি করিয়া কাটাইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। ভগবান এ অধম সন্তানকে যে বিদ্যানুরাগ ও একটু কবিত্বশক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমে মনে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ব-বিধাতার কাজে আত্মোৎসর্গ করা উচিত। বলা বাহুল্য, তখন ভগবানের স্নেহে অবিশ্বাস বা তাঁহার উপরে আমার অভিমান দূর হইয়াছিল। আমার অদৃষ্টফল আমি পাইলাম, ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

আমি মনে করিলাম, সধবা মহিলাদিগের যেমন সংসারের কাজ করা কর্ত্তব্য, বিধবা মহিলাদিগের সেইরূপ সমাজের কাজ করা কর্ত্তব্য। ইহা যখন আমার "সত্য" বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

এই সময়ে আমি পুরাতন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিতা এবং সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গ্রন্থ পড়িতাম। নবজীবন, প্রচার, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্র এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের হৃদয়োচ্ছ্বাস পড়িতে আমার স্বদেশ ও স্বজাতীয়া ভগিনীদিগের জন্য অনেক চিন্তা উপস্থিত হইত; সেই সকল চিন্তা আমি অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিতাম। যখন পিত্রালয়ে থাকিতাম, তখন আমি দাদার নিকট অনেক মিনতি করিয়া তাঁহার কাছে একটু ইংরাজি পড়া শিখিয়া লইতাম। একখানি উপক্রমণিকা ব্যাকরণ হইতে শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি মুখস্থ করিতাম। আমার দাদার প্রথমা পত্নী-বিয়োগ ঘটিলে তাঁহার পূর্ব্বতন উৎসাহ, স্ত্রী-শিক্ষানুরাগ প্রভৃতি হ্রাস হইয়াছিল; সেই জন্য আমার বড় অসুবিধা হইত। এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত কোন পুরুষের সম্মুখীনা হইতাম না; কোনরূপ আমোদ বা উৎসাহে যোগ দিতাম না;

এবং স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ মিশামিশি বা রহস্যালাপ করিতাম না। আমার স্বর্গীয় স্বামীর দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার উপরে নিপতিত আছে, ইহাই আমার ধারণা ছিল।

আমাদের বাড়ীতে "সখা" নামক মাসিকপত্র আসিত। সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন দেশের বালক বালিকাদিগকে জ্ঞানানুশীলন এবং নীতি-শিক্ষা দান করিয়া গঠিত-চরিত্র করিবেন এই উদ্দেশ্যে "সখা" প্রবর্ত্তন করেন। আমি তাঁহার এই সাধু কাজের সহায়তা করিতে একান্ত ব্যগ্র হইলাম। "সখা"র উপযুক্ত কবিতা লিখিয়া প্রমদা বাবুর নিকটে পাঠাইয়া দিলাম। তিনি যত্নপূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত "সখা"য় লিখিতে লাগিলাম।

কিছুদিন পরে প্রমদাবাবু ইহ-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই অ-দৃষ্ট বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে আমি মনে মনে বড় শোকাকুলা হইলাম। এরূপ দুঃখে কেহ সহানুভূতি করিবে না বলিয়া কাহাকেও বলিলাম না। তখন "শোক-সঙ্গীত"-শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া সখার উদ্দেশে প্রেরণ করিলাম। প্রমদাবাবুর ভ্রাতা এবং "সখা"র রক্ষক বাবু অন্নদাচরণ সেন তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেকগুলি প্রাপ্ত কবিতা হইতে কেবল আমার সেই কবিতাটি "সখা"য় প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে একখানি অতি সুন্দর ছবির পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন।

আমার জাতীয় ভগিনীগণের জন্য কিছু কাজ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল হইল। সেই জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আমি বামাবোধিনীর লেখিকা শ্রেণীভুক্তা হইলাম। কিছুদিন বামাবোধিনীতে কবিতা লিখিয়া-ছিলাম। তাহার অধিকাংশ আমার স্বর্গীয় পতিদেবের উদ্দেশে রচিত।

বামাবোধিনীর ২৫শ বর্ষ পূর্ণ হইলে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় উহার জন্য "জুবিলী" করেন। সেই

সময়ে অনেকগুলি পুরস্কার প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেন। আমি তিন চারিটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। বামাবোধিনীর বিজ্ঞাপনানুসারে "বনবাসিনী" নামক এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। তিনি উহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বামাবোধিনীর জুবিলীতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিধবা রমণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম। সেই চিন্তার ফলে আমার মনে হইল, জ্ঞানধর্ম্মে আত্মগঠন করিয়া ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গীয় স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, জাতীয় ভগিনীগণের উন্নতি সাধন, শিশুদিগকে উপযুক্ত রূপে গঠন এবং অনাথ আতুরদিগকে সেবা, ইহাই বিধবা রমণীদিগের কর্ত্তব্য। আমার এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে "বনবাসিনী" লিখিয়াছিলাম। ইহা বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় স্বতঃই বুঝিয়াছিলেন। বনবাসিনীর প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় "দাসাশ্রম" প্রতিষ্ঠা হয়, তখন উক্ত মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখেন, "মা! তোমার 'বনবাসিনী' কল্পনা সফল হইয়াছে, কলিকাতায় দাসাশ্রম নামক এক 'স্নেহভবন' স্থাপিত হইয়াছে"—ইত্যাদি। ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণের নিকটে খুব আদৃত হইয়াছিল।

এই "জুবিলী" সময় হইতে বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় আমাকে নিজ কন্যারূপে স্নেহ করেন। আমার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণ সাধন, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমার লেখা তিনি সাগ্রহে, সমাদরে সাম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিষয়ে কোন ত্রুটি হইলে তাহাও স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিতেন।

আমাকে যেরূপ সদুপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেন, আমার জীবনে তাহা যেরূপ প্রার্থনীয় সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য। তিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য এবং দেবতুল্য চরিত্রবান জানিয়া তাঁহার কাছে পত্রাদি লিখিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সঙ্কোচ হইত না। আমি মনে মনে তাঁহাকে আমার পিতৃদেবের মত ভক্তি করিতাম।

এই সময় হইতে বামাবোধিনীতে আমি পদ্য অপেক্ষা গদ্য প্রবন্ধ অধিকাংশ লিখিতে লাগিলাম। আমাদের অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামের স্ত্রী-চিকিৎসক এবং ধাত্রীর আবশ্যকতা বিষয়ে আমি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একাধিকবার প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বাল্য-বিবাহ নিবারণ এবং বরপক্ষের অর্থলুব্ধতা নিবারণ জন্যও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম।

অতঃপর আমি নব্যভারত পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাসিক পত্রে দুই চারিটি কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

৺ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের পুরস্কার প্রবন্ধ "বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম" রচনার প্রতিযোগিতা পরীক্ষায়, আমি ১২৯৬ সালে পুরস্কার পাইয়াছিলাম। ঐ কথা শুনিয়া আমার কয়জন আত্মীয় "যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী" সভার বিজ্ঞাপনানুসারে "বিবাহিতা রমণীর কর্ত্তব্য" বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় আমি প্রথম হইয়াছিলাম এবং মিসেস্ বি, দে প্রদত্ত রৌপ্য মেডেল পাইয়াছিলাম।

সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই প্রবন্ধটি উক্ত সম্মিলনীর কার্য্য-বিবরণীতে প্রকাশ করেন। বামা-হিতৈষী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় তাহা দেখিয়া নিজ সহৃদয়তায় একান্ত আনন্দিত হন, এবং আমাকে

বিশেষ উৎসাহজনক পত্র লিখিয়া কতকগুলি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া মহাত্মা ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ধাত্রী-শিক্ষা-প্রণেতা) তাঁহার "বাঙ্গালীর মেয়ের নীতিশিক্ষা" পুস্তকে আমার নাম মুদ্রিত করিয়া, বিশেষ গৌরবসূচক এক পত্র মুদ্রিত করিয়া, উহা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন।

ইহার পরে আরও দুইবারে আমি যশোহর-খুলনা-সম্মিলনীতে "সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য" এবং "মহৎ জীবনী" নামক প্রবন্ধ রচনায় প্রথম বিবেচিত হই এবং শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার পাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ও আমাকে যারপর-নাই স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতে থাকেন। তাঁহার এবং বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি অধিকতর মনোযোগপূর্ব্বক ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে চেষ্টা করি। তখন আমার শিক্ষক বিশেষ কেহই ছিল না। আমি ভগবানের উপরে নির্ভরপূর্ব্বক একান্ত চেষ্টা করিতে-ছিলাম। একদিন ইংরাজী পড়িতাম আর একদিন সংস্কৃত পড়িতাম। ইংরাজী এবং দেবনাগর অক্ষর লিখিতেও শিখিতাম। যেদিন আমার ইংরাজী হস্তাক্ষর বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম, আর যে দিন টীকা দেখিয়া কুমার-সম্ভব পড়িতে পারিয়াছিলাম, সেই দিন ঐ মহাশয়দ্বয় যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমার চিরস্মরণীয়। মানবের মাতৃ-পিতৃ-স্নেহঋণ যেমন অপরিশোধনীয়, ঐ দুই আরাধ্যতমের স্নেহের ঋণও আমার সেইরূপ অপরিশোধ্য।

আমার পূজনীয় পিতৃব্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্থলে যখন স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ভক্তিভাজন বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের আদেশক্রমে আমি একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। তিনি তাহা নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া উক্ত কার্য্যস্থলে বিতরণ করেন। সেই সূত্রে উক্ত কবিবরের

জীবনী-প্রণেতা আমার অগ্রজ-প্রতিম ভক্তিভাজন যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকটে আমি পরিচিতা হই।

এই সকল সময়ে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গীতাপাঠ করিতাম। আমার গীতাপাঠ শেষ হইলে তখন বাড়ীর সকলে উঠিতেন। তখন আমি ব্যাকরণ কৌমুদীর খানিকটা মুখস্থ করিতে করিতে, অথবা ইংরাজী বানান শিখিতে শিখিতে গৃহকর্ম্ম করিতাম। আহারের সময়ে বেশী খাইলে পাছে শরীরে আলস্য হয় সেই ভয়ে সামান্য রূপ আহার করিতাম। দিনের বেলায় ৩।৪ ঘণ্টা এবং রাত্রিতে ৫।৬ ঘণ্টা লেখাপড়ার সময় পাইতাম। আহার নিদ্রা বিষয়ে বিশেষ সংযত হইয়াছিলাম। কিন্তু বেশী দিন ইহা সহিল না—সাহিত্য গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আমার "শারীরিক বৃত্তি সকল যথোচিত অনুশীলিত" হইয়াছিল না, তাই কিছুদিন মধ্যে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল।

বলিয়াছি, বামাবোধিনী, নব্য-ভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রে আমি কবিতা লিখিতাম। পূজনীয় কবিরত্ন মহাশয় স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল সংগ্রহপূর্ব্বক "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তিনি স্বয়ং উহার বিজ্ঞাপন লিখিয়া দেন। দেশের অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তিগণ—সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমবাবু, কবিবর হেমবাবু ও নবীনবাবু, মনীষী চন্দ্রনাথবাবু, জাষ্টিস্ গুরুদাসবাবু, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি কাব্য-কুসুমাঞ্জলি পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে যারপর-নাই উৎসাহ দিয়াছিলেন।

ইহার পরেও স্নেহময় কবিরত্ন মহাশয়ের আগ্রহ ও অনুগ্রহে আমার "কনকাঞ্জলি", "প্রিয়-প্রসঙ্গ" (২য় সংস্করণ), "বীরকুমার-বধ কাব্য" জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।

বামাবোধিনীর ত্রিশ বৎসর বয়সেও এক জুবিলী হইয়াছিল ; আমি তাহাতে বিজ্ঞাপনানুসারে "বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা"-শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় তাহার পরীক্ষক ছিলেন ; সেবারেও আমি কয়েকজন পুরুষ ও রমণীর সহিত প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হই।

যাঁহারা দেশ-হিতৈষী, নারী-হিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক, তাঁহাদিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। বরিশালের শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের "ভক্তিযোগ" পড়িয়া অবধি প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতাম।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি জীবনে কখনও না দেখিলেও তাঁহাকে একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার মৃত্যু সময়ে আমি আমার জনৈক ডাক্তার দেবরের বাসায় কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। সেই ১৩০১ সালের ১৪ই শ্রাবণ আমার অন্যতমা শাশুড়ীর সহিত নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া বঙ্গবাসিনীগণের পিতৃতুল্য সুহৃদ,, বঙ্গভূমির উজ্জ্বলতম রত্ন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত দেহ দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে মৃত দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে কি আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমি বাড়ীতে ফিরিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে তখনই 'শোকোচ্ছ্বাস' শীর্ষক এক গদ্য কবিতা লিখিয়া চির সুহৃদ্ বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে আরও তিন চারিটি কবিতা লিখিলে বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় এবং কবিরত্ন মহাশয় উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন।

"কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে আমরা দেওঘরে গিয়াছিলাম। সেখানে ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে প্রণাম

করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে যে আদর ও স্নেহ করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে চিরদিনই জাগিয়া আছে। আমি আসিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, "মা! আমাকে মনে রাখিও, তোমার কবিতা আমি মুখস্থ করিয়া থাকি",—লজ্জা ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করিতে যাই। সেই নর-দেবতা যখন আমার মাথায় হাত দিয়া আমাকে অমৃতময় আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তখন আমার জীবন যেন পবিত্র হইয়াছিল।

যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান মহিলা-কুলের গৌরব, সেই সকল বঙ্গবাসিনী দেবীদিগকে আমি চিরদিনই ভক্তিশ্রদ্ধাসহ পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।

এই বঙ্গদেশে যাঁহারা সমাজ-শিক্ষক রূপে পরিগণিত,—যাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, নীতিবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সুকবি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মনুষ্যত্ব লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্যক্তিগত ভাবে না হইলেও শক্তিগত ভাবে)। আমি এই সকল লোকের নিকটে ঋণী। এই রূপে নব্য-ভারতের অন্যতম সুকবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্বশক্তি এবং ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী মহাশয়ের সাহিত্যিক শক্তির নিকটে আমি বহুল পরিমাণে ঋণী। সকলের অপেক্ষা সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণই আমার গুরুতর। কেবল সাহিত্য-শিক্ষা বিষয়ে নহে। আমার চির অপ্রত্যক্ষ, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রণেতা আচার্য্য দেবকে আমি গুরুদেবের আসনে বসাইয়া, তাঁহারই উপদেশানুসারে আত্ম-গঠন-চেষ্টা করিয়াছি।

আমরা মানকুমারীর জীবন-কথা তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতেই প্রকাশ করিলাম।

মহিলা কবিগণের মধ্যে মানকুমারী বসুর নামও সর্ব্বজন পরিচিত। একটা বিষয় দেখিতে পাইতেছি যে, মহিলা কবিগণের মধ্যে দুই একজন

ছাড়া কেহই দীর্ঘকাল স্বামী-সঙ্গ-সুখ লাভ করিতে পারেন নাই। রজকিনী রামীর মন্ত্রতন্ত্রের বিধানানুসারে পতি না হইলেও তিনি প্রাণপ্রিয়তম চণ্ডীদাসকে হারাইলেন। আনন্দময়ী পতি-বিয়োগে অনুমৃতা হইলেন, গঙ্গামণিও বিধবা হইলেন। শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায় সকলেই ভারতের পতিহীনা নারীর সংজ্ঞাভুক্ত। মানকুমারীও যৌবনেই স্বামীকে হারাইয়াছিলেন। অনেকের কবিপ্রতিভা আবার স্বামীর জীবিতকালে স্ফূর্ত্তি লাভ করে নাই। পতি-বিয়োগ-বিধুরা নারীর হৃদয় নিঃসৃত বেদনাই পরে কবিত্বের রূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। তাঁহার প্রথম কবিতা গ্রন্থ "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" তাঁহাকে কবি-যশঃ-গৌরবের বরমাল্যখানি পরাইয়া দিয়াছিল। কাব্য-কুসুমাঞ্জলির প্রথম প্রকাশের তারিখ ১৩০০ সাল—প্রকাশক স্বর্গীয় সুকবি ও সুপণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন। ছত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদন ও প্রকাশের ভার বিদ্যারত্ন মহাশয় লইয়াছিলেন। প্রকাশকের নিবেদনে তিনি যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাহার দুই একটি কথা উদ্ধৃত করিলাম। কবিরত্ন মহাশয়ের মতে যাঁহারা সত্ত্বপ্রধান ধাতুর লোক, এবং নিয়ত সত্ত্বগুণেই অবস্থান করিতে অভ্যাস করিয়াছেন, সময়ে সময়ে তাঁহারা ভক্তি, মৈত্রী ও করুণা প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেকে "দশা" প্রাপ্ত হন—একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যান। তখন তাঁহাদের হৃদয়শায়ী অন্তঃপুরুষ যেন হঠাৎ জাগরিত হইয়া উঠেন এবং তাঁহাদিগকে যা বলেন, তাঁহারা ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাই বলেন। ভূতভাবন্ ভগবান্ ভূতকল্যাণের জন্য ব্যক্তিবিশেষের মুখ দিয়া এইরূপ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের মুখস্বরূপ সেই ব্যক্তিবিশেষকে আমরা "নরদেবতা" বলিয়া পূজা করি। এই গ্রন্থ-কর্ত্রীকে নরদেবতা বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছে। ইঁহার প্রবন্ধ সকল যতই পাঠ

করিতেছি, আমার বিশ্বাস ভক্তি ততই ঘনীভূত হইতেছে। "ইঁহার 'শিবপূজা', 'ভাঙ্গিওনা ভুল' প্রভৃতি পদ্যগুলি দৈববাণীর ন্যায় মানব-মাত্রেরই সেবনীয়। এই সকল পদ্য ধর্ম্ম-জগতের চূড়ান্ত কাব্য, বঙ্গ সাহিত্যের গীতা।" এই গ্রন্থ যথেচ্ছ সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিবার ভার আমার উপর ছিল। কিন্তু মুদ্রাঙ্কনের ভুল ছাড়া আর কিছুই সংশোধন করি নাই। * * গঙ্গার জল আর আগুন স্বভাবতঃই শুদ্ধ, তাহা আবার অন্যে শুদ্ধ করিবে কি? তারপর মানকুমারীর শিক্ষা সম্বন্ধে প্রকাশক বলিয়াছেন, "আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে. ইনি কোনও শিক্ষকের কাছে শিক্ষা পান নাই। সদা সহস্র গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া এবং কোনও শিক্ষকের সাহায্য না পাইয়া কেবল ঈশ্বর-নিষ্ঠা ও আত্মাবলম্বনের গুণেই এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন।" মানকুমারী কবি মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী। যে বংশে মাইকেলের ন্যায় অমর প্রতিভাশালী মহাপুরুষের অভ্যুদয় হয়, সেই বংশে মানকুমারীর ন্যায় কবিত্বপ্রভাবশালিনী মহিলার অভ্যুদয় হওয়া কোনরূপেই অসম্ভব বা বিচিত্র নহে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা যুগে গদ্য ও পদ্য সাহিত্য—উভয় দিক দিয়াই বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির অভ্যুদয় হইয়াছিল।

কবি ও কাব্যের আলোচনার দুইটা দিক আছে। একটা দিক কবির কাব্যের ভিতর দিয়া তাহার জীবন-বীণার সুরের সুরে যে বিচিত্র বাণী ধ্বনিত হইয়া কোথা হইতে—কোন উৎস-মুখ হইতে তাহা আপনাকে প্রকাশ করিল তাহার সতর্ক অনুসন্ধান। আর দ্বিতীয়টি হইতেছে তাহার রচিত কাব্যের আলোচনা করিয়া কবির জন্য সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া। যুগের পর যুগ ধ্রুবতারার ন্যায় স্থির নিশ্চল ভাবে আপনার আসনখানি অবিচলিত রাখিয়া বাঁচিয়া থাকার মত কবি পৃথিবীতেই বা কয়জন জন্মগ্রহণ করেন? প্রত্যেক কবিরই এক একটী

নিজস্ব প্রতিভা থাকে। কয়জন কবি অসামান্য দূরদৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন? যাঁহারা করেন তাঁহারাত ঋষি। অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, শুধু সেই যুগের কথাই বলেন, সেই যুগেই বাঁচিয়া থাকেন, সে যুগের লোকের হৃদয়েই আনন্দ দান করিয়া ধীরে ধীরে কৃষ্ণ-পক্ষের চাঁদের মত অনন্ত অন্ধকারের বুকে চিরদিনের জন্য ডুবিয়া যান। প্রকৃত কবিত্ব সেখানে যেখান হইতে হৃদয়ের আনন্দের ধারা স্বতঃ উৎসারিত হয় এবং সত্য কথা বলিতে কি Who tells us what we are and may be, how we can live free, joyous, and harmonious lives; what grand elements of thought, feeling and action lie around us; what field there is for the various activities fermenting with us. আমাদের জীবনের সমস্যার সমাধান করিয়া জীবনকে পরিপূর্ণ আনন্দ-রসে মগ্ন করিতে এবং তাহার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়ন করিয়া মুক্তির বিরাট ক্ষেত্রের মধ্যেও বিবিধ কর্ম্ম-কেন্দ্রের স্থান নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা যাঁহার আছে তিনিই প্রকৃত কবি। মানকুমারী স্রষ্টা নহেন, আর্টিষ্টও নহেন। মানকুমারীর অধিকাংশ কবিতাই Narrative বা বর্ণনাত্মক। তাঁহাকে আর্টিষ্ট বলা যায় না। যুগপ্রভাবানুযায়ী সাধারণ ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই তাঁহার কবিতাসুন্দরী আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশে পয়ার, লঘু ত্রিপদী এবং ত্রিপদীর যে ধারা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছিল, ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শানুকরণে ক্রমশঃ তাহার মধ্যে ছন্দের বৈচিত্র দেখা দিয়াছিল। মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রচলন দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অভিনব যুগের প্রবর্ত্তন করেন। বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা শব্দ রচনা করিয়া মালা গাঁথিলে যে তাহার মধ্যে কেবল যূঁথিকার মৃদু গন্ধই ভাসিয়া আসিবে তাহাও নহে—বীণার সুরে কেবল সাহানার

করুণ রাগিণীই বাজে না, দীপকের দীপ্ত সুরও বাজিয়া উঠে। ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন প্রভৃতির কবিতায় ভাববৈচিত্র্য থাকিতে পারে কিন্তু ছন্দো-বৈচিত্র বলিয়া কোন জিনিষই ছিল না। মানকুমারী প্রভৃতি রবীন্দ্র যুগের কবি হইলেও তাহাদের উপর হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দ দাশ প্রভৃতির যে প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের সেইরূপ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় নাই। নবরস, নবধারা, নব উদ্দীপনার তীব্রতা নাই, আছে শান্ত কোমল স্নিগ্ধ সজল ভাবটি—তাহাই আমাদের ভাল লাগে, সেখানেই বাঙ্গালী মহিলার আপনার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘনিষ্ঠ পরিচয় না হইলে তাহার কবিতায় হাত দেওয়া উচিত নয়। দিন দিন সময়, সমাজ এবং কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ছবিটীর আবহাওয়া বদলাইয়া যাইতেছে এবং জটীল হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান যুগের কবির অন্তর মধ্যে বিশ্বজগতকে, বিশ্বমানবকে উপলব্ধি করিবার মত যোগ্যতা না থাকিলে তাঁহার কবিতা, তাঁহার রচনা বেশী দিন বাঁচিতে পারে না। বাইরণ ও গেটের তুলনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উভয়েই কবি ছিলেন কিন্তু বাইরণ যেমন উচ্ছ্বাস জিনিষটাকেই আশ্রয় করিয়া তরল বহ্নি-প্রবাহের ন্যায় কবিতার স্রোতধারা বিশ্বজগতে বিলাইয়া দিয়াছেন অথচ Productive powerএর দিক্ দিয়া তেমন কিছুই করেন নাই, গেটের সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। গেটে—Knew life and the world, the poet's necessary subjects, much more comprehensively and thoroughly than Byron. এতগুলি কথার আলোচনা করিলাম এই জন্য যে, আমাদের দেশে এই যে পয়ার বাঁধিলেই কবি হওয়া যায়, কিংবা 'নদী বহে কুল্ কুল্ আমার প্রাণ হ'ল আকুল' ইত্যাদি লিখিলেই কবিসংজ্ঞাভুক্ত হইবেন এ বিশ্বাসটা আছে তাহা আমাদের দূর করিয়া প্রকৃত কবিত্বের রসাস্বাদ করিবার মত যোগ্যতা লাভ করা আবশ্যক।

এখন আমাদের আসল বিষয়ের আলোচনা করা যাক্। মানকুমারী গীতি কবিতাই সাধারণতঃ রচনা করিয়া আসিতেছেন। গীতিকবিতার সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্য দিয়াই কবি ও তাহার কাব্যকে বুঝিতে পারি। তাঁহার কবিতাগুলিকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় (১) সামাজিক (২) প্রাকৃতিক (৩) জাতীয়তা বা স্বাদেশিকতা (৪) সাময়িক ঘটনা (৫) পৌরাণিক শিশু কবিতা—এ কয়টিই প্রধান। বীরকুমার-বধ-কাব্য নামক তাঁহার একখানা কাব্যগ্রন্থও আছে। 'The Epic is in the past tense." অভিমন্যু-বধ কাহিনীটি লইয়া বীরকুমার-বধ রচিত। আমার মনে হয় তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থই হইতেছে 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি'। প্রথমতঃ হৃদয়ের ভক্তি ও বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁহার লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে 'ঈশ্বর', 'শিবপূজা', 'মা' ইত্যাদি কবিতার নাম করা যাইতে পারে। ঈশ্বর কবিতাটির মধ্যে কোন অন্তর্দৃষ্টি কিংবা বিরাটের আভাস অনুভূত না হইলেও—

"আঁধার গগনে যবে
কোটি তারা দেয় দেখা,
তোমার মহিমা যেন
জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা।
বিহগে ললিত গীতি
শিখায়েছ ভালবাসি;
ঢেলেছ ফুলের দলে
স্বরগের শোভা রাশি।
ভূধর, সাগর, মেঘ,
বসন্ত, বরিষা ধারা,
বিচিত্র কৌশল তব
মরমে জাগায় তারা।"

"এই মাত্র মাগি ভিক্ষা
যে ভাবে যখন থাকি,
তুমিই আমার, তাই
সদা যেন মনে রাখি।"

একটী সরলা ভক্তিমতী বঙ্গনারীর হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। 'শিবপূজা' কবিতাটির মধ্যে কবির অনেকখানি প্রাণের পরিচয় পাই—সর্ব্বজীবে সমপ্রীতিময় ও প্রেমিক শিবের উদার উন্মুক্ত প্রাণখোলা প্রীতি ও প্রেমনিষ্ঠা বেশ প্রকাশ পাইয়াছে—সত্য সত্যই—

"এমন আপনা ভোলা
এমন পরাণ খোলা,
এমন রজতগিরি—শ্বেত শতদল,
পবিত্র শঙ্কর কোথা দেখিনি কেবল!"

সেই শঙ্করের পরিচয়ে কবি আমাদের সম্মুখে অতি মনোরম চিত্রটি লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন—

"দেখিনি কে সুধা বলি কালকূট খায়,
দেখিনি কে কৃত্তিবাস,
শ্মশানে সুখের বাস,
ভূত পিশাচের পালে প্রীতি মমতায়;
দেখিনি মড়ার হাড়
কে করে গলার হার,
কাল বিষধর স্নেহে হৃদয়ে দোলায়,
কার বুকে এত স্নেহ,
প্রণয়িনী-শব-দেহ,
হৃদয়ে তুলিয়া মাতে মহা তপস্যায়?

অমৃতান্ন পরিপূর্ণা,
কার ঘরে অন্নপূর্ণা,
সতীর গরব তরে কেবা পড়ে পা'য় ?
কার প্রেম হেন সাধা,
কে দেয় জায়ারে আধা,
"অর্দ্ধনারীশ্বর" কোথা মিলে দেবতায় ?"

এই কবিতার মধ্যে ভক্তি আছে, বিশ্বাস আছে, সাধারণ হিন্দু-হৃদয়ের পরিচয় আছে এই মাত্র। কিন্তু প্রকৃত কবিত্ব বলিয়া যে জিনিষ তাহার কিছুই নাই। এই শ্রেণীর কতগুলি কবিতা মানকুমারী লিখিয়াছেন সেগুলি ঠিক যেন বদ্ধ জলাশয়ের মত আপনার মধ্যেই আপনাকে সংযত করিয়া রাখিয়াছে—সীমার মধ্যে আবদ্ধ, অসীমের কোন সুরের আনা-গোনা তথায় নাই।

'ভাঙ্গিওনা ভুলের' মধ্য দিয়া কবি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তির পরিচয়ই দিতেছেন। কবি তাঁহার সরল বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়াই জীবন কাটাইতে চান, কোনরূপ তর্ক মীমাংসা চান না। মানুষ ঈশ্বরকে জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া অপরায় সরল বিশ্বাস ও ভক্তি এই দুই ভাবে অনুভব করে, কবি সরল বিশ্বাসকেই আশ্রয় করিয়া সংসার-পথে চলিতে চাহিতেছেন—তাই তাঁহার সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—

"প্রভো! ভাঙ্গিওনা ভুল,
তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পিতা,
তুমি মোর রচয়িতা,
কি কাজ খুঁজিয়া মম সৃষ্টিতত্ত্ব মূল,
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙ্গিওনা ভুল!

আবার— ভাঙ্গিওনা ভুল প্রভো! ভাঙ্গিওনা ভুল,
এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গ-ভূমি,
এক অভিনেতা তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল,
ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যাক্,
এ প্রাণ তোমাতে থাক্
ও চরণ বুকে থাক্ হয়ে বদ্ধ-মূল,
জীব-লীলা অবসানে,
ওই প্রেম-সিন্ধু পানে,
ছুটিবে জীবন-গঙ্গা করি কুল কুল
ভুলে যদি থাকি প্রভো! ভাঙ্গিওনা ভুল!”

এ সকল কবিতা সাধারণ হইলেও সরল সরস অভিব্যক্তির জন্য পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করে। কবিতার দুই শ্রেণীর পাঠক আছেন, এক শ্রেণীর লোকের কাছে—অবশ্য তাঁহারা সাধারণ শ্রেণীর—তাঁহাদের নিকট এইরূপ সরল সোজা কথার কবিতাই ভাল লাগে। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা উচ্চাঙ্গের কবিতা বুঝিবার অধিকারী নহেন। মানকুমারী প্রথম শ্রেণীর পাঠকের নিকট বরাবরই সমাদর লাভ করিয়া আসিয়াছেন।

নারীর হৃদয়, নারীর বেদনা মহিলা কবির কাব্যে যেমন ফুটিয়া উঠিতে পারে তেমন পুরুষ লেখকের প্রাণে কদাচিৎ সরল অভিব্যক্তির সহিত ফুটিয়া উঠিতে পারে না, পারিলেও তেমন চিত্ত স্পর্শ করে না। এমন কবি জগতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন যিনি পুরাতন সংস্কারের হাত হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া জগতের বুকে বজ্রমন্দ্রে ঘোষণা করিতে পারিয়াছেন—পুরুষ ও নারী সকলই সমান। একমাত্র মার্কিণ কবি ওয়াল্ট

হুইটম্যানের কবিতার সুরে এই বাণী ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে—The female equally with the male I sing" তিনিই বলিয়াছেন—

"I am the poet of the woman
the same as the man.
And I say it is as great to be a
woman as to be a man."

এই সাহসিকতা ওয়াল্ট হুইটম্যানকে ধন্য করিয়া দিয়াছে। যেখানে নারীর কথা, নারীর বেদনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না, সেখানে যে পুরুষ ও নারীর কবিতার মধ্যে আমরা তাহার প্রকাশ দেখিতে পাই, সেখানেই বিস্মিত হই। ঘোমটায় ঢাকা লজ্জাবনতা সঙ্কুচিতা বঙ্গমহিলা কবির হৃদয়ের পরিচয় যদি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া পাই তাহা হইলেই বুঝিতে পারি আমাদের সামাজিক জীবন কোন্ পথে কতদূরে কেমন করিয়া চলিয়াছে, আমরা কোথায় আছি এবং আমরা এই যে পুরুষ নামক জীব আমরা সমাজে কোথায় নারীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিয়াছি! সেই সেন্টিমেণ্টটীর বিকাশ আমরা মহিলা কবিদের কাব্যে খুঁজিয়া পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের ভ্রমরকে লক্ষ্য করিয়া কবি বলিতেছেন—

"হায় অভাগী ভ্রমর!
বঙ্গের সরলা বধূ,
কে দিল গরল মেখে মরম ভিতর!
দেবতা পুরুষজাতি,
সে কেন বিশ্বাসঘাতী?
অনা'সে অবলা নাশে নাহি ভয় ডর?
কার মুখ চেয়েছিলি অভাগী ভ্রমর!

পুরুষ যে দেবতা তাহাতে সন্দেহ নাই, অন্ততঃ আমাদের দেশের

মহিলাদের কাছে ! কিন্তু কয়জন পুরুষ নারীকে দেবীরূপে বরণ করিতে পারেন ? যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে—

"অনন্ত বিশ্বাস আশা,
সীমা-শূন্য ভালবাসা,
যে পতি-চরণে সতী ঢালে নিরন্তর,
সেই কিনা 'কালো' বলে,
চলে যায় পায়ে দলে,
সে খোঁজে—কাহার রূপে আলো করে ঘর ঃ
কার এ কপাল পোড়ে, অভাগী ভ্রমর !"

সে কি বুঝিল, সে কি জানিল ভ্রমরের দেবতা কি অন্তরে উপলব্ধি করিল—

"ও কালো বুকের তলে
স্বর্গ মন্দাকিনী চলে,
বুঝিল না একবারো নিঠুর বর্ব্বর !"

যদি বুঝিত, তাহা হইলে নারীর উপাস্য প্রেম কি কখনও উপেক্ষিত হইত ? রূপের নেশায় উন্মত্ত গোবিন্দলাল আপনাকে সম্ভোগের উন্মাদনায় এমন করিয়া নিমজ্জিত করিত না। বুঝিতে পারিত—

"উজল তড়িত বুকে
অশনি রয়েছে রুখে,
কলঙ্ক মেখেছে গায় রাঙা শশধর !

আর— মরতে যাহার নাম—
ধর্ম্ম-অর্থ-মোক্ষ ধাম
পরশি যে পদধূলি পূত কলেবর—

সেই পতি অপবিত্র,
উহু কি ভীষণ চিত্র!
কোথায় লুকাবি আত্মা—কোথা পাবি ঘর?
জীবনের মহামরু, এই তো ভ্রমর!"

যে সর্ব্বস্ব দিয়া জীবন আরাধ্য পতি-দেবতাকে ভালবাসিয়াছিল সেই পতিদেবতার অধঃপতনে নারীর হৃদয়ে কি বেদনা বাড়িয়া উঠে, হৃদয় যাতনা কেমন করিয়া রক্তে রাঙ্গা হইয়া উঠে, সেই বেদনার অনুভূতি মহিলা কবি পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই বলিতেছেন—

"কোন্ ছার ধন প্রাণ!
বড় আদরের মান,
পতির সম্মান ধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ সুন্দর;
সে যদি কলঙ্কী হবে,
দশে অপযশ কবে,
বিধাতা জানিবে তারে পাষণ্ড পামর;
সে হিংসা, সে শোকানলে
এ ব্রহ্মাণ্ড পোড়ে জ্বলে,
কি সাধ্য পুষিবে নারী বুকের ভিতর?"

অতি সুন্দর! তখন আপনা হইতেই মনে হয়,—

"Love, that is first and last of
all things made.
The light that has the living
world for shade."

সংসারের সর্ব্বসুখবর্জ্জিতা কবির মনোবেদনা প্রত্যেক কবিতার মধ্যেই নিবিড়ভাবে জড়িত রহিয়াছে! ক্ষুদ্র আমি ক্ষুদ্র ফুলটির মত বিজনে রূপ

ফুটিয়া গিয়া নীরবে ঝড়িয়া পড়িব, একথা কবি সর্ব্বত্র বলিতেছেন। কখনও বলিতেছেন—

"নীরবে ফুটাব সাধ,
নীরবে শুকাব আশা,
নীরবে কবিতা যত
গাহিবে প্রাণের ভাষা!
জীবনের যত সবি
নীরবে নীরবে হবে,
মরণেরো গায়ে মোর
নীরবতা মাখা রবে।
নীরবে সে দিবে দেখা,
নীরবে ডাকিয়া নিব,
প্রাণখানি তার হাতে
নীরবে নীরবে দিব।
নীরবে মুদিব আঁখি
সে মুখে হেরিয়া হাসি,
নীরবে জনম, সখি!
নীরবতা ভালবাসি।"

আবার বলিতেছেন—

"আঁধার আঁধারতম
জীবন মরণ মম
অন্ধের যামিনী!
প্লাবনে ডুবিলে গিরি,
কাঁদে লোকে "আহা" করি

বড় ব্যথা পেয়ে,
ক্ষুদ্র এক বালিকণা
ডুবিল কি ডুবিল না
কে দেখিবে চেয়ে ?”

আমি ক্ষুদ্র, আমি নগণ্য ধূলির ধূলি, অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় আমার গর্ব্ব—কেমন করিয়াই বা গর্ব্ব থাকিতে পারে ? তাই কবি বলিতেছেন—

“কোটি বিশ্ব-পূর্ণ এ মহা ব্রহ্মাণ্ড,
কোটি মহাসূর্য্যে সৌর কি প্রকাণ্ড।
কোটি কোটি তারা, কি বিশাল তা'রা,
প্রতিক্ষণ গতি কি দূর প্রকাণ্ড !

সে বিরাট বিশ্ব, পরমাণু-কণা,
জড়পিণ্ড বই আর তো কিছুনা,
পলকে ডুবিছে পলকে জাগিছে,
ভাবিতে নয়নে পলক পড়ে না।

কত তলে আমি কত ক্ষুদ্রতম,
অণু রেণু কণা পরমাণু সম !
সংসারের অঙ্গে ভেসে যাই রঙ্গে
এ গরব দাপ কিসে আসে মম।”

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগ হইতে আমাদের দেশের লোকের মধ্যে স্বদেশপ্রীতি জাগরণের দিকে অনেক কবিতা, গান ইত্যাদি রচিত হইয়াছিল। 'কতকাল পরে বল ভারতরে' 'বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,' 'মিলে সব ভারত সন্তান,' এমন ধারা বহু সঙ্গীত সে যুগে রচিত, গীত ও

আলোচিত হইতে শুনা যাইত। মানকুমারীও সেই যুগের শেষ দিকের কবি। তাঁহার কবিতায়ও সেই সুরের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই—

"আমরা কা'রা ?
নিশীথে উঠিয়াছে ধ্বনি
প্রাণে হয় প্রতিধ্বনি,
শুনি শুনি হইলাম স্তব্ধ পারা,
ওই শুন গায় গীতি—"আমরা কা'রা ?

* * * *

আমরা কা'রা ?
ভিক্ষা মাগি আনি দুটো
ছাই ভস্ম এক মুঠো
ক্ষুধায় উদর পোড়ে, নয়নে ধারা,
কেমনে বলিব হায় ! আমরা কা'রা ?
আমরা কা'রা ?
শিখিতে বিদেশী বুলি
জাতি ভাষা গেছি ভুলি,
ভাই বোনে পরিহরি,—সাহেবী ধারা,
কেমনে জানাব আজি—আমরা কা'রা ?
আমরা কা'রা ?—
সভার সমক্ষে বলি
'হণ্টারের' বংশাবলি
জানিনে দাদার নাম কি গোত্র তাঁরা,
কি ক'ব লাজের কথা—আমরা কা'রা ?

* * *

আমরা কা'রা ?—
এই যে জীবনে মরা
এই যে "আঁচল ধরা"
এই যে অধম দীন পতিত যা'রা,
সেই অমর মহাপ্রাণ—আমরা তা'রা।

মুছ ভাই! আঁখি জল
শূন্য বক্ষে কর বল,
বিশকোটি একেবারে যাবে না মারা
কলমে জনমে তরু—আমরা তা'রা।"

'সাধের মরণ' কবিতাটি এই জাতীয় কবিতার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে। বঙ্গীয় কবিগণের স্বদেশ প্রেমজ্ঞাপক কবিতাবলি সংগৃহীত হইলে 'সাধের মরণ'ও নিঃসন্দেহে একটি উচ্চস্থান লাভ করিবে।

"এক বীণা গাহিছে কি গান!
আকাশ ছাপায়ে দেছে তান,
এ গান শুনিতে হায়!
লক্ষ তারা কেন চায়!
শিহরি উঠিছে কেন এ নির্জীব প্রাণ?

জননী জনম-ভূমি!
শুনিছ কি গান তুমি,
যে গীতি ঢালিছে তব স্নেহের সন্তান?"

ওই শুন—

"মরণের বায়ু বয়ে যায়,
কে তোরা মরিতে যাবি আয়!

ওই দেখ! ঘরে ঘরে—
কত কে কাঁদিয়া মরে,
অনেক কাঁদিছে ওরা অসহ্য জ্বালায়
নীরবে কাঁদিবে যারা,
বিজনে কাঁদুক তারা,
আয়! কে ডুবিতে যাবি সাগর-তলায়?
মরিবার সাধ কার আছে?
মায়ের নয়ন জল,
ভাই বোন হতবল
খেতে না পাইয়া শিশু ভূমে পড়ি আছে;
মুখেতে তুলিতে গ্রাস
মরমে জনমে ত্রাস,
আগে তো মরিব আমি তোরা আয় পাছে!"

কবি উদ্বোধন সঙ্গীতে দেশবাসীর অন্তরে প্রেরণা জাগাইতে যাইয়া বলিতেছেন—

"কর দেখি অতীত স্মরণ,
তোমাদেরি অধীন মরণ,
'সপ্ত সিন্ধুময়ী ধরা'
ছিল যার কীর্ত্তি ভরা
সেই পুণ্য আদি-কুলে তোদের জনম!
আজিরে মরণ তরে,
কত জন কেঁপে মরে,
সেই মৃত্যু ছিল তাঁর প্রিয় আভরণ!

ওই দেখ! জীবন বেলায়
এ ক্ষুদ্র বালুকা-কণা
এ স্রোতে কি ডুবিবে না
রাখিবি এ পরমায়ু বেঁধে কি ভেলায়?
জানে না অবোধ হায়!
তবুও ফিরিতে চায়।
কি জানি কিসের নেশা এতই ভুলায়!"

কবিতাটির কতিপয় অংশ বেশ কবিত্বপূর্ণ, কিন্তু যেখানে পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক কাহিনী সংযোজিত হইয়াছে, সেখানে কবিতার সেই মোহিনী শক্তি আর নাই। 'মায়ের সাধ' কবিতায়ও দেশজননীর দুঃখ-কাহিনী নিবেদিত হইয়াছে। জননী বলিতেছেন—

"আগে ছিনু আমি রাজ-রাজেন্দ্রাণী,
আমার গৌরবে পূরিত ধরা,
আজি ভিখারিণী তোদের জননী
বেঁচে থাকা আজ মরমে মরা।

নিতি মারামারি ভাই ভাই সনে,
নিতি গালি, নিতি বিবাদে রত,
এ দুরন্তপনা আর তো সহে না—
বাজে মোর বুকে বাজের মত।

তোর বোন্‌গুলি আমারি দুহিতা,
তাদেরো কারণে পরাণ কাঁদে,
কেউ চাও তারা উড়ুক বিমানে,
কেউ চাও বাঁধা থাকুক ফাঁদে!

তোদের করম কহিতে সরম,
ঘৃণায় উপহাস ভগিনী 'পরে!—
স্নেহের লতায়—পবিত্র বালায়
আঁকিছ গড়িছ ভীষণা করে।"

দুঃখ-দৈন্য-নিপীড়িত রোগযাতনায় নির্য্যাতিত হতভাগ্য দেশের কথা বলিতে যাইয়া কবি দেশের অন্তরমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেশের নরনারীর জীবন-পেয়ালা যে কি রসে ভরিয়া উঠিতেছে, কেমন করিয়া সে মদিরাময় নারীর জীবনকে বিষাক্ত করিয়া, অক্ষম ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে, সে দু'টি চিত্র স্বাভাবিক ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, রং বেশী পড়ে নাই।

"ভাই ভাই দলাদলি সদা হিংসা দ্বেষ;
চারু কান্তি সুকুমার,
গায়ে মাখে ল্যাবেণ্ডার,
চুলে করে আলবার্ট, মাধুরী অশেষ,
কোট সার্ট শোভে গায়,
ডসনের বুট পায়,
হাতে ছড়ি বুকে ঘড়ি দেখা যায় বেশ!
গৃহিণী গহনা চায়,
অবোধ বলেন তায়,
বিলাস নাশিতে দেন শত উপদেশ,
এমনি মানবে ভরা আমাদের দেশ।
'মলয়জ শীতলা' সে আমাদের দেশ,
আমাদের দেশী লোক,
বুক-ভরা কত শোক,
নাই সুখ, নাই যেন আরামের লেশ!

সদা ভোগে কর্ম্ম-ভোগ,
দেহে ভরা নানা রোগ,
বয়স না হ'তে কুড়ি, আগে পাকে কেশ !
জাতিতে পুরুষ যারা,
লিখি পড়ি হাড় সারা,
আমাদের দেশে নারী বিচিত্র-মূরতি।
লক্ষ্মীরূপা হয় কেহ,
কেহ অলক্ষ্মীর গেহ,
কারো বা সপক্ষ কারো বিপক্ষ ভারতী।
জ্ঞানে অন্ধ, ধর্ম্মে কাণা,
যুক্তিহীন তর্ক নানা,
উপধর্ম্মে রত সদা অকর্ম্মে ভকতি ;
কেউ বড় সাদা সোজা
বহেন সংসার বোঝা,
কেউ বা বিদ্বেষী বড় 'ঘরকন্না' প্রতি ;
কেউ হন 'মিস্‌ট্রেস্‌'
কেউ বা শ্রীমতী বেশ,
কারো বা গাউন, কারো শাড়ীতেই গতি ;
কেউবা স্বাধীনা হয়,
কারে বা 'অসভ্য' কয়,
কেউ বা কোণের বউ—যা করেন পতি,
যে পথে চালান প্রভু,
সেই পথে চলে তবু—
যোগাইতে মন তাঁর হয় না শকতি !

সদা তাঁর আঁখি রাঙ্গা,
কথাগুলা হাড় ভাঙ্গা
দিবারাতি উপদেশ অযুক্ত যুকতি,
ক্ষণে প্রীতি ক্ষণে রোষ,
দোষে গুণ, গুণে দোষ,
রমণী জানে না কিসে মিলিবে মুকতি,
আমাদের দেশে এই নারীর বসতি !

তার পর— 'মায়েরে' অসভ্য বলি
মাতৃ-ভাষা পায় দলি
আপনার গুণপণা চায় দেখাইতে ।"

ভাবকি এখন অনেকটা হ্রাস পায় নাই ? এইরূপ আরও কতিপয় কবিতা দেশাত্মবোধ উদ্দীপ্ত করিবার জন্য লিখিত হইয়াছে। 'ভ্রাতার প্রতি ভগ্নী' কবিতাটির নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যের বিষয় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গালা ও বর্ত্তমান বাঙ্গালায় অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের সমাজ-সংস্কার-সম্পর্কে কর্ম্মীর সংখ্যা অতি বিরল। সমাজের দুষ্ট ক্ষত উপশম না হইলে আমাদের উন্নতির পক্ষে যে কিরূপ বাধা আসিয়া দাঁড়ায় প্রতি পদে তাহা আমরা অনুভব করিয়া আসিতেছি। এমন একদিন ছিল—অনেক আগের কথা বলিতেছি না—যখন অভাগিনী কুলীন কুমারীগণের প্রতি সমাজের নিষ্ঠুর পীড়ন অবাধে প্রচলিত ছিল। মৎ-প্রণীত বিক্রমপুরের ইতিহাসে এবিষয়ে বেশ বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। তখন ব্রাহ্ম সমাজ পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে কুলীন কুমারীগণের দুঃখ-বেদনা ও সামাজিক পীড়ন দূর করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্

হইয়াছিলেন এবং বহুস্থলে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সেই সময়ে কবিবর হেমচন্দ্র জলদ-মন্দ্রে আহ্বান করিয়াছিলেন—

"অরে কুলাঙ্গার হিন্দু দুরাচার,
এই কি তোদের দয়া সদাচার,
হয়ে আর্য্যবংশ অবনীর সার,
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!"

বিক্রমপুরের রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় জঘন্য কৌলীন্য-প্রথার অপনোদন-মানসে যে প্রচণ্ড যত্ন করিয়াছেন তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার নাম বাঙ্গালার স্বল্পসংখ্যক সমাজসংস্কারকগণের মধ্যে অমর হইয়া থাকিবে। তাঁহার সেই—

"বহুদিন পরে এসেছি শ্বশুর বাড়ী'
কোন্ পথে যাইব মাগো! বিশ্বনাথ বাড়রীর বাড়ী!
যারা ছিল ছেলে পিলে, তাদের হ'ল ছেলে পিলে,
বিয়ে করে গেলাম দেশে বয়ে গেল বছর কুড়ি।" ইত্যাদি

গানটি সর্ব্বজনপরিচিত। আপনার পত্নীকেই মাতৃ-সম্বোধন! বিচিত্রও ছিলনা এবং আশ্চর্য্যও নহে। কবি মানকুমারীও সেই সময়ে কুলীন-কুমারীগণকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"অই শুকানো মুকুল!
বিধাতা ঘুমের ঘোরে
পাঠিয়ে দিয়েছে ও'রে,
কপালে লিখিতে 'সুখ' হয়েছিল ভুল!
ও'র বুকে শুধু জ্বালা
শুধুই আগুন ঢালা,
সরমে মরমে মরা, বিষাদে আকুল,
কি দেখিবি, ও তো ভাই শুকানো মুকুল!"

নারীর প্রাণ—নারীর বেদনা স্বাভাবিক ভাবেই সমবেদনায় কাঁদিয়া উঠে, তাই কুলীন কুমারীগণের মর্ম্মবেদনায় কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল—

"এ জনমে ফুটিল না— তরু ছিন্নমূল,
'কুলীনের মেয়ে' হায়! শুকানো মুকুল।"

তাই শুনিতে পাই—

কাঁদ তোরা অভাগিনি! আমিও কাঁদিব,
আর কিছু নাহি পারি,
ক'ফোঁটা নয়ন-বারি—
ভগিনি! তোদেরি তরে বিজনে ঢালিব।
যখন দেখিব চেয়ে—
অনূঢ়া "প্রাচীনা মেয়ে,"
কপালে যোটেনি বিয়ে—তখনি কাঁদিব।
যখন দেখিব বালা
সহিছে সতিনী-জ্বালা,
তখনি নয়ন-জলে বুক ভাসাইব।
সধবা বিধবা-প্রায়
পরান্ন মাগিয়া খায়—
দেখিলে কাঁদিয়া তার যমেরে ডাকিব।
এ তুচ্ছ এ হীন প্রাণ
দিতে পারি বলিদান—
তোদেরি কল্যাণে বোন্! কিন্তু কি করিব?
কাঁদিতে শকতি আছে, কাঁদিয়া মরিব।"

এই অশ্রুজল বিসর্জ্জন, এই ক্রন্দনটুকুই পবিত্রতার বরমাল্যে সুরভি-

মণ্ডিত। এখানেই নারীর প্রাণ করুণার দীপ্ত-শ্রীতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় এখন কুলীন কুমারীদের জন্য বিলাপ করিয়া কবিতা লিখিবার প্রয়োজন কোন বঙ্গীয় কবিরই আবশ্যক নাই। 'সহমরণ' 'অভাগিনী' ইত্যাদি কবিতায়ও সমাজের অতীত ও বর্ত্তমান নির্ম্মম অত্যাচার-কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। সহমরণের কথা বলিব না—কেননা—আমাদের দুর্ভাগ্য নিশ্চয়ই। যেহেতু এখন আমরা মরিলে আমাদের পত্নীরা পতিভক্তির পরিচয় দিবার জন্য কোনক্রমেই জীবনটাকে চিতানলে বিসর্জ্জন দিবেন না! সহমরণ প্রভৃতির কথা এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ই বাঁচিয়া আছে। 'অভাগিনী', কবিতাটি এক বিধবা বালিকা-দর্শনে লিখিত।

যে সময়ে মহাপ্রাণ বিদ্যাসাগরের হৃদয়-সমুদ্রে বালিকা বিধবার মর্ম্ম-বেদনার তরঙ্গ উঠিয়াছিল সে যুগে বিধবা মানকুমারীর বেদনা-জড়িত অন্তর হইতে ভোগবতীর উৎসারিত পুণ্যসলিলধারার ন্যায় মর্ম্ম-কথা বাহির হইয়া আসিয়াছিল। সে যুগে কবি হেমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কবি আনন্দ-চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সকলেই বিধবা নারীকে লক্ষ্য করিয়া কবিতা লিখিয়াছেন। এক সময়ে ভাবপ্রবণ বাঙ্গালীর মুখে শুনিতাম—'ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ঐরে', কখনও কখনও মৌন সন্ধ্যার ম্লানিমার মধ্যে মাঠের পথে সাধারণ কৃষক বালকের কণ্ঠে পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইত—'ভারত শ্মশান মাঝে আমি রে বিধবা বালা'। সেই সময়ে পতি-বিয়োগবিধুরা মানকুমারীও গাহিয়াছিলেন—

"সাঁজের বাতাস ওই ধীরে ব'য়ে যায়
কেরে তুই এলোচুল!
কচি মেয়ে বেল ফুল,
তোর মা বাঁধেনি খোপা অমন মাথায়!

অমন সোণার দেহ,
সে অভাগী ক'রে স্নেহ
দেয়নি সাজায়ে আহা! মণি-মুকুতায় ?"

*   *   *   *

"সীঁথিতে সিঁদুর নাই, ছাই—সব সুখে!
উহু হু! একটি মেয়ে,
কে দিয়েছে মাথা খেয়ে ?
কেমনে কাটাবে কাল চিতা রাখি বুকে!
জ্বলন্ত আগুন-জ্বালা
কেমনে স'বে রে! বালা,
জীবন্তে পুড়িবে বাছা মা'বাপ সম্মুখে!
বোঝে না যে 'বিয়ে' হায়!
তার আজি এ কি দায়!
'বিধবা' কহিতে বুক ফেটে যায় দুখে,
বিধি হে! এ পোড়া বিধি কে আনিল মুখে ?"

সকলের চেয়ে মর্ম্মস্পর্শী হইতেছে—

"কারে গো সা'জাস ভাই' মূক সন্ন্যাসিনী,
না বাঁধিতে হাতে হাত,
আগে 'হবিষ্যান্ন' ভাত,
না হ'তে 'সম্রাজ্ঞী' আগে পথ-ভিখারিণী ;
কে তোরা হৃদয় হারা,
কি বলিলি—'ধ্রুবতারা',
পাখীরে পড়ালি কেন 'হরে কৃষ্ণ' বাণী ?

বয় আট নয় দশে,
সীঁথির সিঁদূর খসে,
বালিকা বধিতে তোর শাস্ত্র টানাটানি!
বোঝে না যে খাদ্যাখাদ্য,
"ব্রহ্মচর্য্য" তার সাধ্য ?
না হ'লে থাকে না মান, লোকে কাণাকাণি,
এই তোর শাস্ত্রতত্ত্ব—হায় অভিমানী!"

এই অবস্থার কি এখনও কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে? তাহা ত নহে। এখনও আমরা দেখিতে পাই সমাজে আমাদেরই সম্মুখে কত বালিকা বিধবা অত্যাচারের নির্য্যাতন সহিতেছে। কত তরুণী বিধবা আপনার জীবনকে শুধু একটা সংস্কারের গণ্ডীর মধ্যে টানিয়া আনিয়া লজ্জা ও সংস্কারের ভয়ে পুনরায় বিবাহ করিতেছেন না। সে দিন আদম সুমারীর পাতা উল্টাইয়া দেখিলাম, আমাদের দেশে এক বৎসর বয়স্ক অপোগণ্ড শিশু বিধবার সংখ্যা দশ লক্ষের উপর। এখনও সমাজে গৌরীদান চলিতেছে।

এখনও— "অধর্ম্মে ধর্ম্মের নাম
হতেছে তো অবিরাম,
ভারত! ভারত! তোর কি হবে মা গতি?
এদের নিঠুর প্রাণ,
মুখে করুণার ভাণ,
শুনায় অধ্যাত্মযোগ তপস্যা মুকতি,
বিজ্ঞেও বুঝিতে নারে,
সে কি তা বুঝিতে পারে?
দশ বছরের মেয়ে, বোঝে কি সে গতি?
বোঝে কি সে ধর্ম্ম মোক্ষ, বোঝে কি সে পতি?"

দিন যাইতেছে—ভারত আগত তবু কই? মানুষ তখনই বড় হয় যখন সে সর্ব্ববন্ধন মুক্ত হইয়া আপনার স্বাধীন চিন্তা ও ভাবকে বড় করিয়া দেখিয়া আপনার পথে আপনি চলিতে পারে—সমাজ হিসাবেও সেই কথা খাটে—সহস্র বৎসরের পুরাতন জীর্ণ পাতার বুলি আওড়াইয়া যদি এখনও আমাদের চলিতে হয় তাহা হইলে আমাদের দুর্ভাগ্য। কবির বাণীতে দেশ উদ্বুদ্ধ হয়,—দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে দলে দলে মানুষ ছোটে—আর এই যে আমাদের সমাজ—যাহার মূলে লোণা ধরিয়াছে—ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তবু তাহাকে সংস্কার করিতে আমরা চাই না! যে জাতি মরে সে এমন করিয়াই মরে!

'পতিতোদ্ধারিণী' কবিতায়ও কবি সমাজের আর একটা দিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের সমাজে—

"যে ডোবে, সে ডুবে যায়, আমাদের ঘরে
কখনো সে পায় না আশ্রয়,
আমাদের ঘর বাড়ী আমাদের তরে,
যে পড়ে তাহার ঠাঁই নয়।
অনুতাপে যদি তার হৃদয় ভাঙ্গিবে,
তবু মোরা দূরেই রহিব,
অভাগা সে যদি কভু উঠিতে চাহিবে,
ছি ছি! তার হাত না ধরিব!
সুখের সাধক মোরা—আত্মসুখ দাস
সে পতিত পথের কাঙ্গালি,"

বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণের বিরুদ্ধে প্রমাণ আমরা করিতে পারি, কিন্তু এমন কি কোন কাপুরুষ আছেন, যে কামিনীকণ্ঠের এই তীব্র ভৎসনার প্রতিকূলে একটি কথা কহিবেন? সংস্কৃত শ্লোক অপেক্ষা

আমরা এই সকল উক্তি উৎকৃষ্ট নজির মনে করি। আমরা শুনিয়াছি কোন তীর্থের পথে একাদশী দেবতার একটি প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই তীর্থগামিনী বিধবাগণ প্রত্যেকে উক্ত প্রস্তরমূর্ত্তির গণ্ডদেশে টোকা মারিয়া গণ্ডের একাংশ ক্ষয়িত করিয়া দিয়াছেন।

"তার তরে নাই—ক্ষমা করুণা আশ্বাস,
আছে শুধু পদাঘাত, গালি।
এই আমাদের নীতি—চিরদিন সবে
পতিতেরে পায়ে দ'লে যাই,
আমাদের কত পাপ—সীমা নাহি হবে,
তার পানে কভু নাহি চাই!"

এই যে উচ্ছলিত মাতৃকরুণার নিদর্শন, নির্ম্মম সমাজকে শিক্ষাদান, তাহা অতুলনীয়; এইখানে শ্রীমতী কামিনী রায়ের 'পণ ভুলে নিয়েছিলা' কবিতাটি স্মরণীয়।

এ সহানুভূতিপূর্ণ বাণী আমরা অনেকদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু সে দিকে আমাদের জাগ্রত অভিমান কোথায়? নারীর লাঞ্ছনা, নারীর অপমান সে ত এদেশের দৈনন্দিন ঘটনা! যে দেশের শিক্ষিত পুরুষ—নারীর সম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে জানে না, যে দেশের শিক্ষিত মহিলারা পর্য্যন্ত আপনাদের শক্তি ও সাহসে বিশ্বাস হীন—'চক্ষু লজ্জার' মিথ্যাভাণে অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়া চলে, সে দেশের পুরুষ ও নারীসমাজের জাগরণের দিন এখনও অনেক দূরে পড়িয়া রহিয়াছে। কয় জন খড়্গা বাহাদুর, কয় জন শশীনাথ দেখিতে পাওয়া যায়? যায় না বলিয়াই দিন দিন নারী-সমাজে এত দুঃখ, এত দৈন্য এবং হিন্দু সমাজে দিন দিন পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি বই হ্রাস পাইতেছে না। হিন্দুর বাঁচিতে হইলে সমাজকে এই দিক্‌টায় বিশেষ করিয়া লক্ষ্য রাখিতে হইবে, নারী-সমাজকে জাগিতে

হইবে। নারীর মঙ্গল-মন্দিরে নারীকেই অগ্রসর হইতে হইবে। তাই কবি 'সাধকের' জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন—তিনি বলিতেছেন—

"আমি চাই মহতের মহত পরাণ,
মুকুতা মাণিক নিধি
আমারে দিও না বিধি
চাইনে এ জগতের রাজত্ব সম্মান;
বাঞ্ছিত পরাণ পেলে,
প্রাণটুকু দিয়া ঢেলে,
মেগে নেব মনুষ্যত্ব—শ্রেষ্ঠ উপাদান,
প্রাণের সাধক আমি, সাধনীয় প্রাণ!
আমি চাই শিশু হেন উলঙ্গ পরাণ,
মুখে মাখা সরলতা,
কয়না সাজানো কথা,
জানেনা যোগাতে মন করি নানা ভাণ;
প্রাণ খোলা মন খোলা,
আপনি আপনা ভোলা
তাঁর স্নেহ প্রীতি সবি হৃদয়ের টান!
আমি চাই স্বরগের উলঙ্গ পরাণ!
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ,
পবিত্র ঊষার রবি,
কোমল ফুলের ছবি,
মধুর—বসন্ত বায়ু, পাপিয়ার গান;
আনন্দে—শারদ ইন্দু,
গাম্ভীর্য্যে অতল সিন্ধু,

পূর্ণ—বরষার বিল ভরা কাণে কাণ !
আমি চাই মনোহর সুন্দর পরাণ !”

কিন্তু কোথায় মিলে সেই উদার পরাণ, যাঁহার কাছে—

“অভেদ খ্রীষ্টান হিন্দু,
দ্বেষ নাই এক বিন্দু,
নিরখে জগত ভরা এক ভগবান্ ;
জ্ঞান সত্য নীতি পূজে,
দলাদলি নাহি বুঝে,
সে জানে সকলে এক মায়েরি সন্তান।”

এই ভাবে এই মহিলা কবির কবিতায় একটা উদার বিশ্বজনীন ভাব দেখিতে পাই—ঐটুকু আমাদের চিত্তকে স্পর্শ করে এবং পুলকিত করে।

কবির পরিচয় তাঁহার কাব্যে, একথা কয়টি অতি খাঁটি। মানকুমারীর জীবন দুঃখের জীবন—ভগ্ন হৃদয়েই তাহার জীবন-বন্দী অশ্রান্ত বেদনার সুর বহন করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার সাধ কি, বাসনা কি তাহা জানিতে আমাদেরও সাধ হয় না কি ? তাঁহার ‘সাধ’ কি ?—জীবন কি ?—কবির কণ্ঠে তাহা শুনিতে পাই—

“মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের—
দুটো কথা না কহিতে,
দুটি বার না চাহিতে,
অমনি পোহায়ে যায় যামিনী সাধের,
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের।

* * * *

মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের—
সুখ, সাধ, শান্তিগুলি,
অকস্মাৎ পড়ে খুলি,
নিভে যায় আশা-বাতি চির আদরের
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের!
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের—
বুক চেরা ধন নিয়া,
পোড়ায় আগুন দিয়া,
শ্মশানে সমাধি করে স্নেহ প্রণয়ের
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের!”

সব মিথ্যা, সব ভুল যে জীবনের, সেই জীবনে কবির সাধ—

“এবার তো কর্ম্মভোগ ভুগিলাম ঢের—
কালের তরঙ্গে ভাসি,
ফিরে যদি ভবে আসি,
তুমি স্রোত আমি ঢেউ হব সাগরের
মানব জীবন ছাই বড় বিষাদের!”

দুঃখভরা জীবনের চিত্র, মৃত্যুর হাহাকার লইয়াই কবি তাহার কাব্যখানি গড়িয়া তুলিয়াছেন। ক্রন্দন শুধু আসে, ওগো, ক্রন্দন শুধু আসে। বহু সাময়িক কবিতাও কবি লিখিয়াছেন। ‘শোকোচ্ছ্বাস’, ‘শ্রাদ্ধোৎসব’, ‘বিদ্যাসাগর’, ‘শ্রীমধুসূদন’ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাগুলি মর্ম্মস্পর্শী।

আমরা কবির সর্ব্ব বিষয়ের কবিতারই অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু কবি-হৃদয়ের সার সত্য প্রণয় বা প্রেম সম্বন্ধে তাঁহার কি ধারণা তাহা আলোচনা করি নাই। কামিনী রায়ের কবিতায় উহার পূর্ণ পরিণতি

দেখিতে পাইয়াছি। গিরীন্দ্রমোহিনীর কবিতায়ও তাহার অভাব নাই, কিন্তু মানকুমারীর কাব্যে তাহার আভাস অতি অল্প। যেটুকু পাই তাহাও একটা নিষ্কাম উদার মহৎভাব লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। যে দুই একটী কবিতা আছে এখানে তাহারই আলোচনা করিলাম! উদ্ভ্রান্ত কবিতায় কবি দূর গগন-বিহারী সূর্য্যের প্রতি ধরাতল-বাসিনী নলিনীর প্রেমকাহিনীর আলোচনা করিয়াছেন, আপনার ভালবাসার সঙ্গে কি স্বর্গগত দূর গগনবিহারী কোন্ কল্পলোকের কোন্ গ্রহ উপগ্রহের অধিবাসী প্রিয়জনের সহিত ধরার অবলুণ্ঠিতা কবির হৃদয়ের বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায়,
সেতো ফোটে ঘোর পাঁকে,
কার মুখ চেয়ে থাকে ?
যে রাজা বিরাজে নিত্য আকাশের গায় !

* * *

কোথা নভ কোথা জল,
তবু কেন ঢল ঢল,
পাশাপাশি, ছোঁয়া ছুয়ি যেন দুজনায় !
শত বছরের পথ,
তবু পূর্ণ মনোরথ,
পরাণ জড়ান তবু পরাণের গায়,
নলিনীর ভালবাসা—শুনে হাসি পায় !"

ভালবাসা এমনি মোহময় আকর্ষণী শক্তি লইয়া নরনারীর হৃদয়-ক্ষেত্রে বিরাজ করে যে, শতবৎসরের বেদনায়ও তাহা কেহ ভুলিতে পারে না। তবে যেখানে দুর্ব্বৃত্ত পুরুষ-চিত্ত পদে পদে নারীর হৃদয়-শতদল বিদীর্ণ

করিতেছে সেখানে নারীর অশ্রুজলের বন্যা বহিয়া যায়। আবার নারী—যে নারীকে হয়ত কোন প্রেমিক পুরুষ প্রাণ দিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাসিয়াছে সেই নারী তাহার গোপন প্রণয়ীর নিকট চিত্ত বিলাইয়া দিয়া ভালবাসার অভিনয় করিয়া মুগ্ধ প্রেমিককে ভুলাইতেছে! কিন্তু নলিনীর ভালবাসাত তাহা নহে। আমরা সাধারণ ভাবে সকল পুরুষ ও নারীর প্রণয়-চিত্র আলোচনায় দেখিতে পাই, সকল কবির কাব্যেই বিরহ-বেদনাটা মূর্ত্ত হইয়াছে। সকলেই আপনার প্রিয়কে দেহ ও মনে সম্পূর্ণভাবে সম্ভোগ করিতে চাহেন। তাই রাধিকার মুখে শুনিতে পাই,—

"এ সখি! আমার দুঃখের নাহি ওর!
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর!
আবার—সজনি! আজু শমন দিন হোয়।
হাস ধনী তাপিনী, মন্দিরে একাকিনী
দোসর জন নাহি সঙ্গ!
বরিষা পরবেশ, পিয়া গেল দূর দেশ
রিপু ভেলা মত্ত মাতঙ্গ!"

আবার শুনিতে পাই—

"আমি যাব না সজনি ঘরে যাব না
ওগো তোরা সবে যা!
তোরা বলিস্ বলিস্ গুরুজনের কাছে
সে যার দাসী তার সঙ্গে গেছে!"

সাধারণতঃ সকল কবির কাব্যেই এই সুর শুনিতে পাই 'ওগো! সই তাকে চাই চাই যাকে ভালবাসি তাকে চাই!' কিন্তু নলিনীর ভালবাসা! সে যে—

"পাগল পাগল পারা
ভালবেসে হ'ল সারা,
পরাণ দিয়েছে ঢেলে সেই দেবতায় ;
সে যেন যোগিনী মত
ধেয়ানে রয়েছে রত,
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় এই মহাসাধনায়,
নলিনীর ভালবাসা শুনে হাসি পায় !
সে যেন গো 'রাঙ্গাপায়'
বুকটীরে দিতে চায়,
সে যেন দেবে না ছেড়ে, দিন যায় যায় ।
চোখে চোখে চেয়ে রবে
মনে মনে কথা কবে,
সে যেন রাখিবে বেঁধে অমর আত্মায় !"

* * * *

"পারে না বসিতে কাছে,
কয় না কি সাধ আছে
সাত বছরের পথ দূর দু'জনায় !
কেবা সে এমন মেয়ে,
মরে বাঁচে চেয়ে চেয়ে
আঁধারে কে ভালবাসে, ডোবে জ্যোছনায় !
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় আশা,
অমর সে ভালবাসা,
ভাসিতে জানে না বুঝি, নীরবে তলায় !

আমিতো বুঝিনে ছাই,
হেসে হেসে মরে যাই,
এত কি অমৃত-ভরা মোহ-মদিরায় ?
গভীর অক্ষয় প্রেম ডুবানো আত্মায় !”

এখানে বিচারের কথা আসে। মনে আসে বাঁচবার আনন্দ কোথায় ? ভোগে না সংযমে ? ত্যাগে না ভোগে ? আবার কবির কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়—

“নিষ্পাপ নিষ্ক্রিয় আশা,
অমর সে ভালবাসা !”

সেই ভালবাসায়ই স্বর্গের অমৃত ঝরিয়া পড়ে—সেই প্রেমেই অপূর্ব্ব প্রেমের অমরাবতী রচিত হয়! আবার “সুপ্রসন্ন” কবিতায় উন্মত্ত সুপ্রসন্নের অরুন্তুদ মর্ম্ম কথাও কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রেমের উন্মাদনায় মানুষ কি করিতে পারে সুপ্রসন্ন কবিতায় তাহা দেখিতে পাইতেছি। সমাজ সে হতভাগ্য প্রণয়ীকে ঘৃণা করিতেছে, পিশাচ বলিতেছে, যে দেবতার উপাসনায় সে ব্যাকুল, সে দেবতাও তাকে উপেক্ষা করিতেছে। তবু—তবু সে—

“আত্মহারা মাতোয়ারা,
তার কাছে—স্বরগ নরক কারা
অবিভেদ একাকার
অনন্ত পিপাসা কার, প্রাণান্তে না যায় ?
এ মমতা কার কবে
“মোর সে পরের হবে”
ছিঁড়ে ফেলে হৃদিপিণ্ড সেই যাতনায় ?

কে হেন সাধক বীর
কাটিয়া আপন শির
ডুবায় সে রক্তনদে ধ্যেয় দেবতায় ?
কার এ আসুর শক্তি
অপার্থিব অনুরক্তি
কেবা হেন মহামৃত্যু আলিঙ্গিতে পায় ?
দেব কি দানব হেন মিলে না কোথায় !"

প্রণয়ের দুইটি উপলব্ধি—দুইটি বিভিন্ন চিত্র কবি দুই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই ভাবে আমরা কবি মানকুমারীর কাব্যের মধ্য দিয়া একটি অন্তঃপুরবাসিনী পতি বিয়োগবিধুরা মহিলা কবির অন্তরবেদনা ভাবে ও ভাষায় সুপরিস্ফুট দেখিতে পাই। কবি মানকুমারীও বড় শিক্ষিতা নহেন, বিশ্ব সাহিত্যের সহিত সুপরিচিতা নহেন, সাধারণ শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা যে কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই মধুর! কবিতাগুলির বিশদ, উদার ও গভীর ভাব এবং সমবেদনাপূর্ণ অনুভূতি বস্তুতঃই হৃদয় ও মনকে মুগ্ধ করে। মানকুমারী প্রাচীনা হইয়াছেন কিন্তু এখনও তাঁহার কবিত্ব-শক্তির হ্রাস পায় নাই—সমভাবেই চলিতেছে। গদ্য রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁহার "প্রিয়-প্রসঙ্গ" ও "শুভ সাধনার" কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে! কবির অন্তিম প্রার্থনার সহিত আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম। মৃত্যুই মানবের পরিণতি। মানুষ জানে একদিন তাঁহাকে মরিতে হইবে। কবির অন্তিম প্রার্থনা—

"দূরে দূরে উঠে নিতি মরণের তান,
আকুল উদাস হিয়া শুনি সেই গান!

ভাঙ্গিয়া সাধের ঘর
চলি যায় ক্ষুদ্র নর,
পিছনে সংসার থাকে সুমুখে শ্মশান !
কোথায় মেঘের পরে
মরণ ঝঙ্কার করে,
জানিনা সে কেন ডাকে, কেন চাহে প্রাণ,
কেন সে আগুনে ছুটে পতঙ্গ সমান ?”

কবির কিন্তু মরিবার দিনক্ষণ সম্বন্ধে একটা প্রার্থনা আছে, একটা কামনা আছে॥ ফুলময়ী বসুন্ধরার বুকে যখন অমিয়ভরা বাতাস ছুটিয়া আসিষে—সেই শুভ বাসন্তী ঊষায় কবি মরিতে চাহিতেছেন কিংবা—

“আমি যেন মরি হরি ! শ্যাম বরষায়—
নীলাকাশে ঘনঘটা,
নিবিড় নীলিমাছটা
চঞ্চলা চপলা ছোটে ভীম ভঙ্গিমায় !”

কবি সেই শ্যাম বরিষায় মরণকে বরণ করিতে চাহিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সেই মরণ সার্থক হইবে যদি তাঁহার জীবনের চির-আরাধ্য দেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাই বলিতেছেন—

“আমি যেন মরি হরি ! স্মরি সেই নাম—
সংসারের স্নেহ-প্রীতি,
মরমের সুখ-স্মৃতি
জীবনের পুণ্য সত্য-উল্লাস-আরাম !
সে নাম স্মরণ করি,
যতই মরণ মরি
পূর্ণ পরাণের আশা পূর্ণ মনস্কাম !

জপি যদি ইষ্ট মন্ত্র
স্তব্ধ হয় দেহ যন্ত্র,
সে যে অমরতা, মোক্ষ, বৈকুণ্ঠে বিরাম !
আমি যেন মরে যাই ভেবে সেই নাম !”

কবির এই বাসনা, ঈশ্বর পূর্ণ করুন।

আমাদের গৌরব করিবার সময় আসিয়াছে, আনন্দ প্রকাশ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—কেন না—যুগ-যুগ-বাহী স্মৃতির ধারায় আমরা সমাজের উন্নতি ও সংস্কারের জন্য নারীর কণ্ঠ শুনিতে পাই নাই, কবে কোন্ সুদূর অতীতে বৈদিকযুগে কিংবা বৌদ্ধ যুগে নারী আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়া কোন লাভ নাই—কিন্তু আজ সুশিক্ষার ফলে—রমণী সমাজ আপনাদের প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন—আজ তাঁহাদের মিথ্যা সংস্কারের বাঁধন খুলিয়া গিয়াছে ! যে বৈধব্য-কষ্ট নারী বহুকাল যাবত সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, যাহার বিরুদ্ধে একটি কথাও কোন দিন বলেন নাই, সহস্র বৎসর সমাজের ভয়ে মুখ ফুটিয়া কথা বলেন নাই—আজ তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছেন, আজ তাঁহারা বালবিধবার পক্ষ সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে—পতি-দেবতা-নামধারী সম্রাটগণ গৃহে গৃহে যে যথেচ্ছাতন্ত্র প্রচলন করিতেছেন আজ তাহার বিরুদ্ধেও নারী মাথা তুলিয়া কথা বলিতে শিখিয়াছেন।

রমণী কবিগণের অভ্যুদয় বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে প্রকৃতই শুভ লক্ষণ ; যাহাদের স্নেহ মিষ্টস্বর আমাদের সুখ দুঃখের নিত্য সম্বল, বঙ্গ সাহিত্যে সেই স্বরের সুধামাখা প্রতিধ্বনি পাইয়া কে না সুখী হইবেন ? সে ভাষায় যদি কিছু গঞ্জনা ও তীব্রতা থাকে তাহা পীড়িত সমাজের পক্ষে মাতা কি ভগ্নী-প্রদত্ত ঔষধের ন্যায়ই গ্রহণীয়।

বিরাজমোহিনী দাসী

এই লেখিকার কোন পরিচয় আমরা জানিতে পারি নাই। ইহার রচিত 'কবিতাহার' নামক খণ্ড কবিতার পুস্তকখানি ১২৮৩ বঙ্গাব্দে ৯৩ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ইষ্ট ইণ্ডিয়া প্রেসে শ্রীভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হয়। এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থখানি লেখিকা তাঁহার পুত্রকে স্নেহোপহার দিয়াছেন। তাহাতে লিখিত আছে—

পুত্র! তোমারই আকিঞ্চনে তোমার এই বিদ্যাবুদ্ধিহীনা দীনা জননী হইতে যে কবিতাহার গ্রথিত হইল, তাহা যদিও সাধারণ জনসমাজের দর্শনোপযুক্ত হইবে আশা করিতে পারি না, তথাচ তুমি মাতৃদত্ত আভরণে বিভূষিতাঙ্গ হইয়া বালকস্বভাবসুলভ পুলকিতান্তঃকরণে মমাঙ্কে অধিরোহণ করত মদীয় অন্তরাত্মাকে অনির্ব্বচনীয় প্রীতিরসে অভিষিক্ত করিবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সংশয় নাই।

তোমার একান্ত অপত্যবৎসলা জননী
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী

ইহাতে তেইশটি খণ্ড কবিতা আছে। বিশেষত্ব বর্জ্জিত। সেকালের পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিরচিত। ইহাতে 'বঙ্গীয় বিধবাগণের ক্লেশ বর্ণনা', 'ভারতের প্রতি', 'তিমিরাচ্ছন্ন রজনী', 'বঙ্গ মহিলার দুঃখ বর্ণন' ইত্যাদি কবিতাও আছে। 'ভারতের প্রতি কবিতা হইতে এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের বঙ্গ মহিলার রচনার পরিচয় পাইবেন।

"ওমা! রত্নগর্ভে! ভারত-জননী,
বীর প্রসবিনী স্বরূপ কও।

প্রভাত শশাঙ্ক সম প্রভাহীনা,
হইয়া এখন কেন মা রও ?”

*　　*　　*

“বীরের জননী বলিয়া তখন,
আদর করিয়া ডাকিত সবে।
তার পরিবর্ত্তে এবে দাস-মাতা,
এ দুঃখ কেমনে পরাণে সবে।”

*　　*　　*

“দীন, হীন, ক্ষীণ, অসংখ্য অসংখ্য
এখন তোমার তনয় যত।
দাসের পশরা, বহিয়া মস্তকে,
করিছে দুর্লভ জীবন গত।
আহা, এবে তব নন্দিনী যতেক,
বঞ্চে সর্ব্বক্ষণ দাসীর মত।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা অঙ্গের ভূষণ,
বিস্তারি সে সব কহিব কত।”

*　　*　　*

“তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধিতে যতনে,
শিখাও তোমার সন্তানগণে।
তবে পদে পদে তরিবে বিপদে
পাবে স্বাধীনতা হারাণ ধনে।”

শ্রীযুক্তা লজ্জাবতী বসু

কবি লজ্জাবতী বসু স্বর্গীয় দেশ-প্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বসুর কনিষ্ঠা কন্যা। এক সময়ে ইঁহার রচিত কবিতা 'প্রদীপ,' 'প্রবাসী,' প্রভৃতি বাঙ্গালার বিখ্যাত মাসিক-পত্রে প্রকাশিত হইত। তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে সরসতা, সরলতা এবং হৃদয়ের অনুভূতি বেশ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইত। এখন আর তাঁহার কবিতা কোনও মাসিকে প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। ১৩০৫ সালের পৌষ মাসে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় 'প্রদীপ' নামক সচিত্র মাসিক-পত্র প্রকাশিত হয়। প্রথম বৎসরের 'প্রদীপে' কবি লজ্জাবতীর কয়েকটী কবিতা ছাপা হইয়া ছিল। ১৩০৯ সালের 'প্রবাসী' পত্রিকায়ও অনেক কবিতা ছাপা হয়। সে সময়ের অনেক মাসিক পত্রিকাদিতেই তাঁহার কবিতা নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত। লজ্জাবতী কুমারী অবস্থায়ই জীবন যাপন করিতেছেন। এখন তিনি প্রাচীনা হইয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা আর জানা যায় না।

কাব্য-লক্ষ্মীর পবিত্র মন্দির-দ্বারে কবি তাঁহার 'দীনের মালা' লইয়া সঙ্কোচে ও সত্রাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—কবি সঙ্গে আনিয়াছেন—

"অতি ক্ষুদ্র গন্ধহীন ছোট মালা গাছি,
দীন এলো সঁপিবারে দেবের দুয়ারে।
সুবাসিত মালা কত, কত রত্ন রাজি,
দেখিলেক পূর্ব্বে যথা সজ্জীকৃত থরে,
স্থাপিতে তথায় তার হীন মালা গাছি
ভরি গেল চক্ষু দুটি নীরব বেদনে।

না বলি একটি কথা তারপর হায়!
চলে গেল দূর পথে আকুল সরমে।
সহসা মন্দিরে ধ্বনি উঠিল বিষাদে,
দেবতার দীর্ঘ-শ্বাস, কাঁদিল বাঁশরী
অধীর রাগিণী-গানে, হলো হীন জ্যোতি
আরতির দীপশিখা, পড়িলেক ঝরি
মঙ্গল মালতী মালা দুয়ার অঙ্গনে।
সমস্ত মন্দির ভরি নীরব বেদনে
ছোট মালাটির হায় অভাব কাহিনী
সারা বেলা দেবতার কাঁদিল চরণে।
লুঠিল সমস্ত দিন একটি আহ্বান,
দীন যথা দূর পথে করেছে প্রয়াণ।”

এই কবিতাটি পড়িতে পড়িতে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সাধনার সেই করুণ মিনতি—

‘দেবী, অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ তলে
অনেক অর্ঘ্য আনি;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া অশ্রুজলে
ব্যর্থ সাধন খানি!’

মানুষ সব ভুলিতে পারে, কিন্তু স্মৃতি কখনও ভুলিতে পারে না। জীবনের মাঝখানে অতীতের সুখ-দুঃখ পূর্ণ বেদনাময় বা সুখময় স্মৃতি চিরদিনই জাগিয়া থাকে। সেই স্মৃতি কি সুন্দর! কি মধুর! তাহা জীবনে দুঃখের বেদনার মধ্যে শান্তি আনে! প্রীতির প্রফুল্ল শতদল স্বতঃ বিকশিত করিয়া তোলে। তখন স্মৃতি জাগিয়া থাকে। সেই স্মৃতি কেমন করিয়া জাগিয়া থাকে কবি তাহা বলিতেছেন—

"নিঝর শুকায়ে গেলে, জেগে থাকে তট-প্রাণে,
শুধু তার গীতময় করুণ বেদন।
দিবস চলিয়া গেলে, পড়ে থাকে শুধু তার
একটুকু কনক স্বপন।
গোলাপ ঝরিয়া গেলে, শূন্য বৃন্ত বেড়ি কাঁদে
শুধু তার কাহিনী মধুর।
শবদ থামিয়া গেলে, প্রতিধ্বনি ফেলে শ্বাস,
বিলাপিয়ে অতি দূর দূর।
বসন্ত চলিয়া গেলে, জাগে শুধু লতা মুখে
অতি ক্ষীণ হরিত স্মিরিতি।
মলয় চলিয়া গেলে, কুসুমের কাছে ফিরে
শুধু তার প্রতিধ্বনি-গীতি।
সঙ্গীত থামিয়া গেলে ভাসেগো অনিল প্রাণে
সুকম্পিত সুরগুলি তার।
কোকিল উড়িয়া গেলে নিকুঞ্জে কাঁদিয়া ফিরে
সুরের ললিত ঝঙ্কার।
তেমতি হৃদয়-তন্ত্রে, যদি গো থামিয়া গেছে
মধুময় তোমার কাহিনী;
এখনো ধ্বনিছে হায়, স্মৃতির বিষাদ সুরে
তার মৃদু শেষ প্রতিধ্বনি।"

এই কবিতাটির সঙ্গে শেলির—

"Music when soft voices die,
Vibrates in the memory—

Odours, when sweet violets sicken
Live within the sense they quicken."

সাদৃশ্য মনে পড়ে নাকি ?

যুগে যুগে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাণীর মন্দির-দ্বারে বহু ভক্ত কবি সাধনার ব্যাকুলতা লইয়া প্রার্থনা জানাইয়া আসিতেছেন। দেবীর করুণ কোমল করাঙ্গুলি স্পর্শে কাহারও বীণার তারে ঝন্ ঝন্ রন্ রন্ ঝঙ্কার সুরের মর্ম্মকথা অন্তরে লইয়া তাহাকে ধন্য করিয়াছে, কাহারও বা জীবনের সেই আরাধনা ব্যর্থ হইল—নিরাশার অশ্রু-সাগরে বাণ ডাকিল !—কবি বাণী-মন্দির-দ্বারে অন্তরের নিবেদন জ্ঞাপন করিয়া মিনতির সুরে বলিতেছেন—'যাচনায়' সেই যাতনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"দেবী ! চির অসম্পূর্ণ কাহিনীর মত
ব্যাকুল রাখিও পরাণি ;
অকূল নদীর তীর-রেখা মত
থেকো, আবেগে বহিব যখনি।
থেকো. দীপ্ত যৌবনের রহস্যের মত.
মোর দুকূল ভরিয়া থমকি ;
ফুটো, ধরণী যেমন জাগেগো বসন্তে
নিজ পূর্ণতায় চমকি ;
জেগো, চির অনুদ্দেশ পথ-রেখা মত
মোর দূর দূরান্তর ভরিয়া ;
এস, নিজ মহিমায়, চির নীরব
আকাশের মত নামিয়া।
দাঁড়ায়ো, প্রথম জাগ্রত সৌন্দর্য্যের মত,
আপনা প্রকাশে বিস্মিত ;

বীণার প্রথম সুরটির মত
মধুর সরসে জড়িত।
যথা, ভাবের বাণীটি কবির গাথায়
জেগো, তেমনি আমার নয়নে ;
প্রেমের প্রথম পুলক মতন
ওগো, চির দিন এসো স্মরণে।”

চিরদিন তৃষিত অন্তর কোন্ অজ্ঞাত অতিথির আশায় যৌবন বসন্ত জাগরিত বিকশিত ও শত পুষ্প-সম্ভারে সুশোভিত করিয়া তাহারি আশায় তাহারি প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে! রাজপথ দিয়া কখন তরুণ পথিক আসিয়া আহ্বান করে, সে আহ্বান হৃদয় মন্দির-দ্বারে পেলব আঘাতে সাড়া দেয়না—পথিক ফিরিয়া যায়! সে সাড়া পায়না, আকুল আহ্বানে শুনিতে পায় না, ব্যর্থ-হৃদয়ে সে চলিয়া যায়! তখন সেই ভ্রষ্টলগ্নে ব্যাকুল চিত্ত গাহিতে থাকে—

“ফাগুন রজনী দীপটি জ্বলিছে ঘরে,
দখিনে বাতাস পড়িছে বুকের পরে।
সোনার খাঁচায় ঘুমায় মুখরা শারী,
দুয়ারের পাশে ঘুমায়ে পড়েছে দ্বারী।
ধুপের ধোঁয়ায় ধুসর বাসর-গেহ,
অগুরু-গন্ধে আকুল সকল দেহ।
ময়ূর কণ্ঠী পরেছি কাঁচল খানি
দূর্ব্বাশ্যামল আঁচল বক্ষে টানি।
রয়েছি শূন্য রাজপথ পানে চাহি,
জানালার তলে বসেছি ধূলায় নামি,—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
‘হতাশ পথিক, সে যে আমি, সে যে আমি॥”

রবীন্দ্রনাথ

আবার কখনও হৃদয় হইতে স্বতঃ প্রশ্ন জাগরিত হয় 'কেগো তুমি আগন্তুক'? সবাই ত তেমনই আছে, একদিন যেমন ছিল—সেই জীবন-বসন্তে যেমন ছিল—

"সেই উপবন!— স্বহস্তে রোপিত
অশোক-বকুল-শ্রেণী,
যূথিকা-স্তবক, মাধবী-বিতান,
অপরাজিতার বেণী।
সেই আলবালে জল ছল ছলে,
ডালে সেই সারিশুক;
শিরীষের শিরে সেই পিক কুহু,—
"কে গো তুমি আগন্তুক" ?"

কবি অক্ষয়কুমারের 'অপরিচিত' এমনি কোন্ অজ্ঞাত অতিথির আগমন বার্ত্তা প্রচার করিতেছে। কিন্তু কোথায় সে অপরিচিত?

'অতল সাগরে ডুবিয়া ডুবিয়া
সেই চির অন্বেষণ!
আশা নিরাশায় নির্ম্মম পেষণে
সেই স্বপ্ন আহরণ!'

কবি লজ্জাবতীর 'অজ্ঞাত অতিথি'ও অজ্ঞাতে আসিয়াই চলিয়া গিয়াছিল—সেও ধরা দেয় নাই। ধরা দেয় নাই বলিয়াই কবির হৃদয় হইতে সেই স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। কখন সে অজ্ঞাত অতিথি আসিয়াছিল —কখন সে চলিয়া গেল? কবি সে কথা বলিতেছেন—

"নীরব নিশীথ; শুধু ঝিল্লীরব,
ঘুমের আহ্বান সম,
ধ্বনিতেছে স্তব্ধ কুটীরের মাঝে;
মুদে আসে আঁখি মম।

নিশীথ-প্রাণের মর্ম্ম ব্যথা সম
কাঁদে বায়ু মৃদু স্বনে ;
শিয়রে আঁধার বসিয়া নীরবে
চেয়ে আছে মুখ পানে।"

* * *

"এ হেন সময়ে দুয়ারে ধ্বনিল
কাহার আহ্বান ধ্বনি ?
সকরুণ স্বরে কে বলিল ডাকি,
"অতিথি এসেছি আমি"।
যেন পরিচিত, তবু না চিনিনু
কার সে মধুর স্বর;
বলিনু ডাকিয়া, 'বল গো আমারে
কে তুমি অতিথিবর' ?"

* * *

"নীরব অতিথি, উত্তরিলা শুধু
সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে ;
ব্যথিত হইয়া খুলিনু দুয়ার
আনিতে তাহারে পাশে।
দেখিনু বাহিরে, কেহ কোথা নাই,
শুধু আঁধারের ছায়,
ঘুমায়ে রজনী ; কাঁদিয়া পেঁচক
আপনার ব্যথা গায়।
রয়েছে পড়িয়া শূন্য প্রাণে হায় !
নিরজন পথখানি,

অতি দূরে যেন ধ্বনিছে কাহার
চরণের প্রতিধ্বনি।
মনে হলো যেন ছায়াখানি কার
মিলায়ে যাইল দূরে,
শত তপস্যায় শত সাধনায়
আর না আসিবে ফিরে।"

* * *

"যত শূন্য পথে চায় আঁখি মম
তত ভরে অশ্রু জলে।
যত ভুলিবারে চাই হায় সেই
অবিজ্ঞাত অতিথিরে,
দুঃস্বপ্ন মত দীর্ঘশ্বাস তায়
কাঁদি তত কাছে ফিরে!"

এমন করিয়াই জীবনের শুভ মুহূর্ত্ত আনন্দের ও প্রীতির সুরভি-মালাখানি হাতে করিয়া আসে কিন্তু গ্রহণ করিবার সুসময়ের অভাবে সে চলিয়া যায়! তখন মনে হয়—

'সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি,
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!'

আমাদের মানব জীবনে শান্তি কোথায়? সুখ কোথায়? কিসের তৃষ্ণা বুকে লইয়া ধরণীর বুকে মানব আমরা চলিতেছি—সে কথাত জানিনা! তাই ত অশান্তি! তাই ত অতৃপ্তি! কবি সেই অতৃপ্তির কথা বলিতেছেন—

'কেন এ অতৃপ্তি-উর্ম্মি হৃদি পারাবারে
উথলিয়া কূলে কূলে করিছে রোদন?

কি অভাব আকুলতা, কোন্ তৃষা তরে ?
চাহিছে সাধিতে সদা কোন্ সে সাধন ?
চারিদিকে উঠে মহা কর্ম্ম কোলাহল।—
কুসুম বিকশি উঠি বিতরিছে বাস,
গাহিছে কর্ম্মের গীত তারকা সকল,
সকলেরে প্রাণ দিতে বায়ু ফেলে শ্বাস।
শুনিয়ে পরাণ এই কর্ম্মের কল্লোল,
চাহিছে মিশাতে ইথে ক্ষুদ্র কণ্ঠ-তান,
আপনার পানে চেয়ে জাগিতে কেবল,
চাহেনা থাকিতে তার অধীর পরাণ,
তাই এ অতৃপ্তি-উর্ম্মি হৃদি-পারাবারে
উথলি উঠিছে কাঁদি সদা তৃষাতরে।"

কেন মানবের চিত্ত-মন্দিরে অতৃপ্তির উর্ম্মি কোলাহল জাগিয়া উঠে, কবি তাহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিলেই অতৃপ্তির উর্ম্মি কোলাহলে নিবৃত্তি লাভ করে, ইহাই তাঁহার প্রাণের সাধনা!

কবি রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন—

'শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা'রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।'

কেননা—'ধরণীর পরে শিথিল বাঁধন
ঝলমল প্রাণ করিস্ যাপন,
ছুঁয়ে থেকে দোলে শিশির যেমন
শিরীষ ফুলের আলোকে!'

এই দুঃখের বিষাদ-পূর্ণ কাহিনী লইয়া দেশ-বিদেশের সকল কবিই করুণ সুরে গাহিয়াছেন—জীবনের নশ্বরত্বের কথা—

"The flower that smiles to-day
To-morrow dies ;
All that we wish to stay
Tempts and then flies.
What is this world's delight ?
Lightning that mocks the night
Brief even as bright."

* * *

"Whilst skies are blue and bright,
Whilst flowers are gay,
Whilst eyes that change ere night
Make glad the day ;
Whilst yet the calm hours creep,
Dream thou—and from thy sleep
Then wake to weep."

আজ যে ফুলটি হাসে কালই সে ঝরিয়া পড়ে! আমাদের বাসনা আকাঙ্ক্ষা যে দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া যায়! পৃথিবীর আনন্দ কি? বিদ্যুতের ঝলকের ন্যায় নিশীথ গগনে ক্ষণিক দীপ্তি প্রকাশের পরই কি তাহা দ্বিগুণ অন্ধকারের সৃষ্টি করিয়া মিলাইয়া যায় না?

কবি ওমর খৈয়ামও এই দুঃখের জন্য ক্ষণিকের বিলাপ করিয়াই সাকিকে পিয়ালা পূর্ণ করিয়া তৃষিত অধরে ধরিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন—বলিয়াছেন—

"Oh ! Come with old khayam and leave the wise.
To talk one thing is certain the life flies.
One thing is certain the rest is ties.
The flower that once has blown for ever dies."

কবি বলেন,—

"অনুশোচনার সিত পরিধান
ফাগুন আগুনে দহন কর
আয়ু বিহঙ্গ উড়ি চলি যায়
হে সাকি ! পেয়ালা অধরে ধর।

"আজ ফাগুনের আগুন জ্বালা হুতাশ-বোনা শীতের বাস—
পুড়িয়ে সে সব ছাই করে দাও—দাও আহুতি দুঃখের শ্বাস।
আয়ু বিহগ্—খোঁজ রাখ কি ?—মেলিয়ে ডানা উড়ল হায়
পেয়ালাটুকু শেষ করে নাও এক চুমুকেই ফাগুন যায় !"—

আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি এজগতে কবে কখন হইয়াছে ? আমরা যা চাই—তাহা কি পূর্ণ হয়—

"Nothing in this world of ours
Flows as we would have it flow ;
What avail, then, careful hours,
Thought and trouble, tears and woe."

এই ক্ষণিকের সুরে সুর মিলাইয়া কবি লজ্জাবতী 'ক্ষণিকে'র গান্ গাহিয়াছেন। তাঁহার ক্ষণিকের সুরে—প্রাচীন কবিগণের সুরই প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কবি বলেন—

"ক্ষণতরে বসন্তের দেখা
মরুময় জীবনের তীরে,
সুখের সে মলয় আভাষ
স্বপনও ক্ষণিকের তরে।

ক্ষণতরে সন্ধ্যা তারকার
ঢেউপরে কিরণ চুম্বন,

ক্ষণতরে স্তব্ধতার সনে
নিশীথের সঙ্গীত মিলন।”

*　　　*　　　*

“ক্ষণিকের যৌবন কাহিনী
ক্ষণিকের মধুর স্বপন,
ক্ষণিকের দুটি প্রেমবাণী
তারপরে সব সমাপন!

ক্ষণতরে জীবনের পথে
উচ্ছলিত মিলনের গান,
তার পরে কে কোথায় রয়,
দীর্ঘ শ্বাসে সব অবসান!

ক্ষণিকের কথাও কেবল
পরাণের কাহিনী নূতন,
যবে, হায়! সে গান ফুরায়
জাগে চির কথা পুরাতন।

জীবনের মধুর সকল
ক্ষণিকের সঙ্গীত কেবল,
নিশীথের স্বপ্নচ্ছায়া মত
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি আর ছল।”

তবু ক্ষণিকের এজীবনে কবির প্রার্থনা যেন চিরদিন তাহার অন্তর মধ্যে কথা-বিহগীর সুর ঝঙ্কারিত থাকে।

“হে বিহগি! চিরদিন রেখো ঝঙ্কারিত
আমার দিবসগুলি সঙ্গীতে তোমার।

এনো তুমি চয়নিয়া ঊষার চুম্বন
পক্ষ দু'টি ভরে তব, প্রভাতে আমার
সুষুপ্ত দুয়ারে! বিজন ঘুমেতে মোর
স্তব্ধ অস্তাচল হ'তে এনো তুমি হ'রে
সায়াহ্নের নীরবতা; লুঠিয়া অবাধে—
আরো এনো পূর্ণ তব কণ্ঠখানি ভরে
যেথাকার যত সব মধুর স্বপন!"

কোন্ কবির হৃদয়ে না এ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়? কবির জীবনে অজ্ঞাত অতিথি আসিয়া ব্যর্থ মনোরথে চলিয়া গিয়াছিল, আবার সে একদিন জীবন মধ্যাহ্নে আসিয়া দেখা দিয়াছিল, যখন দেখা হইয়াছিল তখন—

"নত হয়ে পড়েছিল সন্ধ্যা মেঘ ছায়া
তাহারি কাহিনী যেন তরুরা গাহিয়া
কহিতে আছিল অতি ধীরে পরস্পরে
দূর বাঁশীধ্বনি মৃদু অভিমান ভরে
গাহিতে আছিল তারি সাধনার গান,
নীরব পূজার পথ ছিল মুগ্ধপ্রাণ।
(আমি) সঙ্গী হীন পান্থে হেরি সজল নয়নে,
সারা দিবসের গাঁথা মালাটি যতনে
চাহিলাম দিতে যবে খুলি বাতায়ন,
সহসা স্বপন চ্যুত দেখিনু তখন
কোথা পান্থ, সান্ধ্য ছায়া গিয়াছে মিলায়ে,
দূর দিগন্তের পথে অন্ধকার ছায়ে।"

'মধ্যপথে' কবিতায় কবি পথিকের সন্ধান পাইয়া বলিতেছেন—

'হে পথিক ! আরো কত দূরে তব দেশ ?
কোন্ নিশি মাঝে লও ? কহিনু ডাকিয়া।
আধ স্বপ্ন ভঙ্গ যেন ফিরিল পথিক।
তন্দ্রামগ্ন দীপালোক নিবিল তখন,
মধ্যপথে নিশিযাত্রা হল অবিচল,
দোঁহাকার ফিরে এল দিন জাগরণ !'

তারপর স্বপন মিলায়ে গেল স্বপনে।

কবি লজ্জাবতীর প্রত্যেকটি কবিতা শব্দ-সম্পদে, ভাবের গৌরবে ও সরল সরসতায় উজ্জ্বল !—তাঁহার কোন কবিতার বই নাই। অনেকদিন হইল তাঁহার বীণা নীরব হইয়াছে, এখন কোথাও সেই সুরের ঝঙ্কার শুনিতে পাইনা ! কবির হৃদয়ের নিভৃত কক্ষের গোপন কথাটিও তাঁহার লেখায় সপ্রকাশ নাই। মনে হয় কি যেন কেমন একটা আশা ও নিরাশার মধ্য দিয়া জীবন কাটিয়া গিয়াছে ! কোন কবিতায় কোন লেখায় Poets' food is love and fame-এর দিকে কোন আকাঙ্ক্ষা কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই। কেবল একমাত্র কামনা তাঁহার চিত্ত-শতদলকে সুরভিত করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে—

"সুমধুর কাহিনীটি তোর
জীবনের কবিত্ব আমার,
পরাণের বসন্ত সুন্দর
বাসনার অমর নির্ঝর।
এ যৌবন-বসন্তের মোর
অভিনব হরিত কল্পনা,

মোহমুগ্ধ হৃদয়-তন্ত্রের
সৌন্দর্য্যের সঙ্গীত জল্পনা।
শুভ্র এই জীবন-উষার
সুমহান্ আলোক স্বপন,
ধন্য করে এজীবন মম
দেবতার আশীষ মতন।
উথলিত হৃদয়-তটিনী
তোর গানে ব্যাপ্ত নিরন্তর
হৃদাকাশে তোর পূজাবাণী
গাহি নিত্য সুপবিত্রতর।"

স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগ

১২৯৮ সাল হইতে ১৩১৫-১৬ সাল পর্য্যন্ত যে কয়েক জন বঙ্গ মহিল কবিতা লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রমীলা নাগের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রমীলা স্বনাম প্রসিদ্ধ মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষের ভাগিনেয়ী ইঁহার স্বামীর নাম ৺গঙ্গাকান্ত নাগ। গঙ্গাকান্ত নাগ বিলাত ফেরত ডাক্তার—শেষটায় ইংল্যাণ্ডেই দেহত্যাগ করেন। প্রমীলা স্বামীর জীবিত কালেই পরলোক গমন করেন। ৺গঙ্গাকান্ত নাগ বারদীর সুবিখ্যাত নাগবংশ সম্ভূত। প্রমীলার পিত্রালয় বিক্রমপুর।

বঙ্গের মহিলা কবি

স্বর্গীয়া প্রমীলা নাগ

প্রমীলা অতি অল্প বয়স হইতেই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার লিখিত কবিতা বেশির ভাগ 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হয়। এক সময়ে ইঁহার কবিতা জন সমাজে আদর পাইয়াছিল। স্বর্গীয় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন সে সময়ে সরোজ কুমারী দেবী ও শ্রীমতী প্রমীলা বসু-(নাগ)র কবিতা পাঠ করিয়া 'নবতপস্বিনী' নাম দিয়া একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"আমি দেখিতে পাই, বালিকা কবি শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ও শ্রীমতী প্রমীলা বসু উদাস খেদোক্তিময় কবিতা লিখিয়া থাকেন। পাঠ করিলে চিত্তে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের উদয় হয়। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া এই কবিতাটি রচিত হইল।

"নিবাও নিবাও শীঘ্র, এত কি আমোদ ?
জ্বালিছ সাঁজের দীপ হয়ে কুতূহলী !
দেখিছ না ! এখনো যে এক ছাদ রোদ !
উচিত এ উদ্বোধন আইলে গোধূলি।
নূপুরে কি বাজে সখি ঝিল্লীর নূপুর ?
তুমি কি ভেবেছ ওই বৈকালী যূথিকা
ফুটিয়াছে ? হায় হায় ক্রূর পিপীলিকা
কুসুমের মর্ম্মে পশি করেছে আতুর।
কল্পনার শিল্পশালা নিরালায় বসি
মধ্যাহ্নে ধরেছ কেন পূরবী রাগিণী ?
থাম থাম, চিত্রগুলি পড়ে খসি খসি !
রঙে রঙে মেশামেশি আপনা আপনি।
কোথায় চিত্রিব আমি অনঙ্গ মোহিনী।
হাদে দেখ, চিত্রিয়াছি শঙ্কর ঘরণী।"

(সাহিত্য ১২৯৮ আষাঢ়)

প্রমীলা নাগ পূর্ব্ববঙ্গের স্বল্পসংখ্যক মহিলা-কবিদের মধ্যে একজন। ইনি ত্রিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হইবার অনেক পূর্ব্বে যৌবনের প্রথম অবস্থায়ই

পরলোক গমন করেন। ইঁহার দু'খানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়, আমরা সে মুদ্রিত গ্রন্থ দু'খানা দেখিবার সৌভাগ্যলাভ করি নাই। বই দু'খানা পাইলে তাঁহার সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিবার সুযোগ পাইতাম। আমরা এখানে 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত কবিতাবলীকে আশ্রয় করিয়াই কবির সম্বন্ধে দু'চারিটি কথা বলিতেছি।

প্রমীলা নাগের কবিতাগুলির মধ্যে কেমন একটা বেদনার সুর ধ্বনিত হইতেছে, এ সংসারের কোন কিছুই তাঁহাকে আনন্দ দান করিতেছে না। এ ধরণী যেন শুধু বিষাদময়, যেন যাতনে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেই মানব এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীকে সম্ভোগ করিবার শক্তি লইয়া সকল কবি জন্মগ্রহণ করেন না। সে শক্তি সকলের থাকে না। রবীন্দ্রনাথ যখন প্রভাত রবির ন্যায় অজস্র স্বর্ণকিরণে বাঙ্গালা সাহিত্যের তরুণ প্রভাতখানি গীতি-কবিতার মধুর স্বরলহরীতে মুখরিত করিয়া তুলিতেছিলেন।—নূতন সুরে নূতন গান শুনিয়া যখন বাঙ্গালী বিস্মিত হইতেছিল, সেই যুগে প্রমীলা প্রভৃতি তরুণ মহিলা-কবিগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। প্রমীলার কবিতায় আশার বাণী নাই—শুধু একটা করুণ কোমল বিষাদ-বাণী নিশীথে শ্রুত এস্রাজের বিষাদ-রাগিণীর ন্যায় চিত্তকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া দিয়া বাজিয়াছিল, তাই কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কল্পনার শিল্পশালা নিরালায় বসি
মধ্যাহ্নে ধরেছ কেন পূরবী রাগিণী ?"

নাই নাই কিছু নাই—এ বাণীই কবির সুরে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। 'ফুরায়েছে' কবিতায় কবি বলিতেছেন।—

"স্বপন গিয়াছে ভেঙ্গে, ফুরা'য়ে গিয়াছে আশা,
নিরাশার অন্ধকারে শুখায়েছে ভালবাসা।

নিবিয়া গিয়াছে কবে সুখের প্রদীপখানি,
স্মৃতির স্বপন আজ স্নেহ আদরের বাণী !"

চিরদিন ত এমনই স্মৃতির স্বপন বুকে করিয়া জীবন যায় নাই, চিরদিন ত সুখের প্রদীপখানি নিবিয়া যায় নাই—

"একদিন ভালবাসা ছিল হৃদে ভরপূর !
বাজিত হৃদয়-তারে কত নব নব সুর।"

কিন্তু আজ ?—

"শূন্য এ হৃদয় ঘর, চলে গেছে তাহার সনে,
স্বপনের মত আজ পড়ে কিনা পড়ে মনে !"

* * * *

"আজ, কেহ নাই, কিছু নাই, বাসনা গিয়াছে মরে,
জীবন মৃতের সম একাকী রয়েছি পড়ে,
কল্পনার প্রাণ নাই, হৃদয় শ্মশান পুরে
স্মৃতি শুধু কেঁদে মরে আঁধারেতে ঘুরে ঘুরে !"

আবার কবি 'উপহার' দিতে যাইয়া করুণ বেদনার সুরে বলিতেছেন,—

"শুখায়ে গিয়েছে ফুল কি দিবগো উপহার ?
ভুলে গেছি গীত গান, ছিঁড়েছে বীণার তার।
আকাশ জলদে ঢাকা
পরাণ আঁধারে মাখা
সোণার শরত শশী আজি নীরদের বুকে,
বসন্তের ফুলগুলি ঝরে গেছে মন দুখে !"

যেদিন জীবন পরিপূর্ণ আনন্দরসে অভিষিক্ত ছিল, যে দিন শরতের মধুর জ্যোছনা রাতে বীণাটি হাতে লইয়া হে ঈপ্সিত, হে দয়িত, তোমার

অপেক্ষায় বসিয়াছিলাম, তোমাকেই চাহিয়াছিলাম, তখন ত তুমি আস নাই—

'সে মধু শরত রাতে'

তখন, আস নাই নিকটেতে ; এখন হে বঁধু, হে প্রিয়তম, তোমাকে কেমন করিয়া বরণ করিয়া লইব ? কেননা—

"ছিঁড়ে গেছে তারগুলি অনাদরে অযতনে,
এখন, কি দিব ভাবিয়া সারা, কিছুই যে নাই আর,
অশ্রুর মুকুতা হার ধর তবে 'উপহার' ।"

এই যে বেদনার সুর তাহা—আবার 'তুমি' শীর্ষক কবিতায়ও দেখিতে পাই। যে প্রাণ-প্রিয়কে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিবার জন্য দেহ ও মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, যাহার জন্য হৃদয়-বসন্ত পুষ্পে পুষ্পে সজ্জিত ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে, সে কোথায় ?—সে কোথায় ? সে তুমি কোথায় ? তুমি যে আমার—

"জীবনের চাঁদিনী যামিনী
তোমার ও মধু হাসিখানি
বিপদের আঁধারে যামিনী
প্রাণের আকাশে শুকতারা
তোমারও নয়নের তারা।"

কিন্তু সে তুমিও কবির চিত্ত-মন্দিরে আসিলে না। ধ্যানের মূর্ত্তি যে কোথায় আপনাকে বিলুপ্ত করিয়া দিল, কোথায় অদৃশ্য হইল, কবির কাছে তাহার আর সন্ধান মিলিল না,—কিন্তু কবি আশা ছাড়েন নাই, তাঁহার মনে হইতেছে একদিন—

"অন্ধকার যামিনীর পরে
প্রথম সে চন্দ্রমার হাস ;

কুহেলিকা আঁধারের মাঝে
উষার সে তরুণ আভাষ,
বরিষার বারি-অবসানে
অরুণের কনক আভাষ
আঁধার এ হৃদয়ে তেমনি
সে চাঁদের সেই চারু মুখ।"

কখনও চিত্তক্ষেত্র হইতে মুছিয়া যাইবে না। প্রণয় বেদনায় এমনি ব্যর্থতার হা হুতাশ কবির কবিতার প্রাণস্বরূপ বলা যাইতে পারে।

বাঁশীর সহিত আমাদের কবিদের সম্বন্ধ চির পুরাতন ও চির নবীন। কবে কোন্ সুদূর অতীতে বৃন্দাবনের শ্যামল বন-বল্লরীতে শ্যামের বাঁশী বাজিয়া বাজিয়া—গোপীগণের চিত্ত-নন্দনে প্রেমের পারিজাত বিকশিত করিয়া দিয়াছিল, যমুনার নীল সলিলধারা উজানে বহিয়াছিল, রাধিকার হৃদয়ে অভিসার বাসনা জাগরিত করিয়া দিয়াছিল তাহা এখনও বিস্মৃতিতে ডুবিয়া যায় নাই—এখনও বাঁশী শুনিলে—

"পরাণ পাগল করে।
ও কেগো স্বজনি! বাজায় বাঁশরী
অমন মধুর স্বরে?
রমণী ধরম, যায় যে ভাসিয়া
সই, রহিতে পারিনে ঘরে,
ওই, বাঁশরী পাগল করে।"

এই ভাবে আমরা কবি প্রমীলা নাগের কবিতার মধ্যে বেদনা ও হাহাকারের সুর ব্যতীত আশার বাণী কিংবা সৃষ্টির আশাপ্রদ কোন ব্যাপক কথাই শুনিতে পাইনা। ইংরাজীতে যাহাকে বলে Productive power তাহা কিছুই নাই। সে যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের এক তরুণ

প্রভাতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে প্রমীলার কবিতা পাঠক সমাজের যেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিত এখন তাহা অসম্ভব। আমরা তাঁহার 'সমর্পণ' কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম।

মানব জীবনের মধুর স্বপ্ন তরুণ ও তরুণীর প্রীতির বন্ধন দুইটি হৃদয়ের মিলনের আনন্দপূর্ণ অভিব্যক্তি 'সমর্পণে' ব্যক্ত হইয়াছে।

"করেতে স্থাপিত কর অবনত দুটি শির।
তুলিতে পারেনা মুখ নিকম্প নীরব স্থির!
হৃদয়ে বহিছে সিন্ধু, বিপ্লব মাথার পরে
জগত স্বপন সম ভাসিছে নয়ন প'রে।"

* * * *

"উজ্জ্বল সে দীপালোকে বেষ্টিত বান্ধব জন;
নীরবেতে জীবনের হয়ে গেল সমর্পণ।
মুহূর্ত্ত বাঁধিলা হাত কহিলা দুইটী ভাষা,
কয়েক মুহূর্ত্ত দৃষ্টি (জীবনের চির আশা)
একটি মুহূর্ত্ত সেই অজ্ঞাত দুইটি মন
নীরবে মিশিয়া গেল; হয়ে গেল সমর্পণ,
প্রলয় বহিয়া গেল হৃদয়ে পারাবারে,
নূতন জীবন দিয়ে বর্ত্তমান গেল স'রে।"

কাব্য জগতে প্রমীলার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে না তাহা নিশ্চিত। কিন্তু সেযুগে বঙ্গ সাহিত্যের মহিলা কবিগণের ইতিহাসমালার মধ্যে প্রমীলার নামও উপেক্ষিত হইবে না।

বিনয়কুমারী বসু

মহিলা কবি বিনয়কুমারীর পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই। সন্ধান লইতে চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইয়াছি। কবির পরিচয় কাব্যে এই সার সত্য কথাটি আশ্রয় করিয়া তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিলাম। ইহার কবিতা এক সময়ে 'সাহিত্য' ও 'দাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। সে প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা। বালিকা বয়স হইতেই ইনি কবিতা লিখিতেন। আমরা তাঁহার রচিত যে অল্প কয়টি কবিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি এখানে তাহারই আলোচনা করিলাম। বিনয়কুমারীর সুরটুকু করুণ ও কোমল বেদনায় ভরা। আমরা তাঁহার 'কে বুঝিবে' ? কবিতায় প্রথমই শুনিতে পাই—

"নিরখি নয়ন কোণে এক বিন্দু অশ্রুবারি,
কে বুঝিবে বল ?
প্রাণের ভিতরে তব কি সিন্ধু লুকায়ে আছে,
কত তার তরঙ্গ প্রবল !
একটি দীরঘ শ্বাসে, কে বুঝিবে, এজগতে
কি ভীম তুফান
হৃদয়ের মাঝে তব, বহিতেছে দিবানিশি
চূরমার করিছে পরাণ !
শুনিয়া ও ক্ষীণ কণ্ঠে বিষাদের মৃদু তান,
কে বুঝিবে হায় ?
কি গভীর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে কি গভীর হাহাকারে
বুক তব ভেঙ্গে নিতি যায় !

সজল নয়ন যুগে কাতর চাহনি আধ,
দেখে একবার!
কে বুঝিবে হৃদিমাঝে আকুল পিয়াস-ভরা
কি বাসনা, কি ভিক্ষা তোমার?
বিন্দুমাত্র দেখাইয়া বুঝাইতে সব কথা,
কেন আকিঞ্চন!
কে এত মরম গ্রাহী দেখিয়া বালুকাকণা
মরুদৃশ্য বুঝিবে কেমন?"

কেন এ বেদনা কে জানে? কি যেন ব্যর্থতা, কি যেন হতাশ-নিরাশা কবির প্রাণের উপর আঘাত করিয়াছে, তাই পৃথিবীর সব আশা আকাঙ্ক্ষা যেন হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। জগতের কোন আনন্দ-অভিযানে ওগো অন্ধ! ওগো নিরাশ-কাতর! তোমার স্থান নাই, যেখানে আনন্দের বাঁশী বাজিয়া উঠিয়াছে সেখানে কোথায় তোমার স্থান!—তুমি সেখান হইতে—

"যাও, স'রে যাও!
শরতের সুনীলাকাশে বসিবে চাঁদের মেলা;
তুমি কেন মেঘ-ছায়া, সেথায় দাঁড়াও?
যাও, সরে যাও!
যাও, ডুবে যাও,
সাগর ঝটিকা শেষে, ভগন তরণি, তুমি,
কি আশে অকূল মাঝে ভাসিয়া বেড়াও;
যাও, ডুবে যাও!
যাও, ঝ'রে যাও,

গোলাপ ঝরিয়া গেছে তুমি পাপ্‌ড়িটি তার,
কেন ব সে শূন্য বৃন্তে, কার পথ চাও ?

যাও ঝরে যাও !
যাও, চলে যাও,
গেছে আশা, গেছে সুখ, বাসনা ! কেন গো তবে
ঘুরে ঘুরে শুষ্ক বুকে পিয়াস জাগাও ?

যাও, চ'লে যাও !
যাও, ম'রে যাও !
অনন্ত বিশ্বের মাঝে, তুমি লক্ষ্যহারা প্রাণ,
তুলিয়া আকুল আঁখি কেন শূন্যে চাও ?
যাও, ম'রে যাও !

এ যেন ব্যর্থ জীবনের হাহাকার ! এ যেন বলিতে চায়—

"তোমরা চলিয়া যাহ আপনার ঘরে ।
মরিব অনলে আমি যমুনার তীরে ।"

এই বেদনার মধ্যেও আবার বাঁশীর আহ্বানে প্রাণে কিসের আকুলতা জাগিয়া উঠে, মন চঞ্চল হইয়া উঠে। চন্দ্রাবলীর শান্ত অচঞ্চল হৃদয়ে বাঁশীর সুর ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে—ও গো, কেন বাঁশী বাজে ?—

"ও কেন বাজায় বাঁশী আকুল করে ?
বাঁধিতে দেয় না মন আপন ঘরে ! -
মধুর মোহন তানে,
কি মায়া ছড়ায় প্রাণে,
অবশে, চরণে হৃদি লুটায়ে পড়ে !

অধর চুমিয়া বাঁশী,
চুরি ক'রে মৃদু হাসি,
কি সাধে গাহে লো গান কাহার তরে ?
কেন, সে তানে মুঞ্জরে ফুল ;
গুঞ্জরে মধুপ-কুল ;
পিকবধূ ডাকে 'কুহু' অধীর স্বরে ?
ওর দুটি কালো আঁখিতারা,
অমন অলস-পারা,
ঢুলু ঢুলু করে কেন কি ভাব ভরে ?
কি খেলা খেলিতে চায় ?
কেন হৃদি লয়ে যায়,
চরণে দলিবে যদি ক্ষণেক পরে !
ও কেন বাজিয়ে বাঁশী পাগল করে ?"

এই যে বাঁশী—এ চিরন্তন বাঁশী। এ বাঁশীর সুর যুগে যুগে নর-নারীর চিত্ত আকুল করিয়া আসিতেছে। 'দৃষ্টি' কবিতাটিতে প্রণয়ের একটি মধুর চিত্র—মিলনের আনন্দ ও প্রীতি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

"হৃদয়ের সাথে বুঝি হৃদয়ের কথা।
দোঁহারে টানিছে দোঁহে আপনার পানে,
জানাইতে মরমের চির আকুলতা
এসেছে হৃদয় দুটি ভাসিয়া নয়ানে !
গোপন-প্রাণের দ্বার গেছে যেন খুলে,
দোঁহার লুকানো আশা দেখিছে দোঁহায়,
উথলিছে প্রেমসিন্ধু আঁখি-উপকূলে,
ভরে উঠে দরশের হরষ জ্যোৎস্নায়।

কত না মধুর সাধ সুখের পিপাসা,
জাগিছে অতৃপ্তি নিয়ে নয়নের কোণে ;
নীরব মনের কত সুকোমল ভাষা,
বুঝিতেছে পরস্পরে না বলে'না শুনে ;
প্রাণে বাঁধিতেছে প্রাণ গাঢ় আলিঙ্গনে,
চেয়ে শুধু অনিমিষে নয়নে নয়নে !"

বিনয়কুমারী বসুর কবিতার সংখ্যা বেশি নাই। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া যে সামান্য কয়েকটি পাইয়াছি তাহারই আলোচনা করিয়াছি। 'বাসন্তী নিশায়' কবিতাটি হইতে এখানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম। কবি বলিতেছেন—

"রজত জোছনাময়ী বাসন্তী যামিনী,
সুরভি লভে সে বায়,
আলসে বহিয়া যায়,
ফুটে যেথা নিশি গন্ধা সু-চারু হাসিনী,
সরমে আনত মুখী শেফালী কামিনী !

অধর টিপিয়া হাসে প্রকৃতি সুন্দরী !
নবীন শ্যামল কায়,
জ্যোছনায় ভেসে যায়,
আলিঙ্গি সে তনুখানি বসন্ত বাতাস,
চারিদিকে ঢালে চূত-মুকুল-সুবাস !

কেন এ মধুর রাতে এই মধুময়
ফুল দেহ বিলসিত,
পুলকেতে বিকম্পিত,

সুহাসিত, চন্দ্রালোকে হৃদয় পাতিয়া,
এমন অবশ-পারা আছি দাঁড়াইয়া।”

* * * *

“এ মধু চাঁদিনী রাতে,
মধুর মলয় বাতে,
স্বরগের চারু বীণা কোন্ দেব করে,
বাজিতেছে কোথা যেন সুললিত স্বরে।”

* * * *

“জাগাতে হৃদয় মাঝে অনন্ত পিয়াস
এমন মধুর স্বরে,
বাজে বীণা কার করে,
বুঝিতে পারে না মন সুধাইব কায় ?
কে করে বিবশ প্রাণ বাসন্তী নিশায় ?”

স্বর্গীয়া সরোজকুমারী দেবী

ইংরাজী ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সরোজকুমারী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মথুরানাথ গুপ্ত সবজজ ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূতপূর্ব্ব "ট্রিবিউন" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বঙ্গভাষার একজন সুপ্রসিদ্ধ গল্প ও উপন্যাস লেখক। সরোজকুমারী বাল্যে পিতার নিকট শিক্ষালাভ করেন। দশ বৎসর বয়সে কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ সেন বংশীয় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর যত্নে সরোজকুমারীর রীতিমত শিক্ষার সুবন্দোবস্ত হয়। যোগেন্দ্রবাবু সম্বলপুরের গভর্ণমেণ্ট উকীল। সরোজকুমারী বলিতেন,—"আমার জীবনে যাহা কিছু সুখ-সৌভাগ্য, যাহা কিছু শিক্ষা, সব স্বামীর জন্য।" অল্প দিন হইল সরোজকুমারী পরলোক গমন করিয়াছেন।

"হাসি ও অশ্রু" সরোজকুমারীর প্রথম প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ। ঐ গ্রন্থ ভারতী সম্পাদিকা মহাশয়ার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন একান্ত সঙ্কোচভরে কবি বলিয়াছিলেন—

"আকুল মর্ম্মের মাঝে, যে উন্মাদ সুর বাজে
দুটী ছত্র লিখিতে বাসনা
গোপন হৃদয় ছায় যে সিন্ধু উচ্ছ্বাসে হায়
কি জানাবে দুটি অশ্রু-কণা !"

"হাসি ও অশ্রুতে" কবির হৃদয়ের উদারতা ও ভাবের বিশালতা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। "সন্ধ্যার তারকা" দেখিয়া কবির "দুইটি নয়ন" ছল ছল হইয়া আসিত—"আঁখি স্বপ্নে ভোর" হইয়া আসিত। ভাবের সেই প্রথম বিকাশ কবির তুলিকায় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। "হাসি ও অশ্রুতে"

শতাধিক খণ্ড কবিতা আছে। অধিকাংশ কবিতাই কবিত্বপূর্ণ—বিমল সহানুভূতির রসে স্নিগ্ধ।

"অশোকা" কবির আর একখানি কাব্যগ্রন্থ। ১৩০৮ সালে প্রায় ঊনত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। অশোকায় কবিতার সংখ্যা একশতের অনেক উপরে। ইহাতে খণ্ড কবিতার সংখ্যাই বেশি। এই কবিতাগ্রন্থখানাকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমভাগ—গীতি-কবিতা, দ্বিতীয়ভাগ—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসবর্ণিত নায়কনায়িকাগণের উদ্দেশ্যে লিখিত কতকগুলি সনেট। তৃতীয় ভাগ—বিদেশী কবিতা, ইংরাজী কবিতার অনুবাদ।

অশোকার অধিকাংশ কবিতাই সরল ও মিষ্টভাবপূর্ণ। 'খোকার বিদায়' কবিতায় সন্তানহারা জননীর মর্ম্মবেদনা কি সুন্দর ভাবেই না ফুটিয়া উঠিয়াছে!

"খোকা গেছে কেজানে কোথায়,
আমি আছি পথ চেয়ে হায়!
তার সে খেলেনাগুলি, ধূলিতে হয়েছে ধূলি,
কেবা আর তাদের খেলায়।"

* * *

"খোকা গেছে সে দেশ কোথায়,
কার কোলে রহিয়াছে হায়!
তাহার দুধের বাটি, সাধের ঝিনুক এটি,
ক্ষুধা পেলে কেবা তা জোগায়!
খোকা আজি গেল কোন্ দেশে,
খেলিতেছে কোন্ নব বেশে,

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী

কোন স্বরগের পুরে একা বেড়াতেছে ঘুরে,
আধ আধ কথা কয় হেসে!
শান্ত সে কি হবে না কখন,
ঘুমে ঢুলে আসেনা নয়ন,
তখন আকুল হয়ে, থাকে বুঝি শুধু চেয়ে,
মনে পড়ে মায়ের আনন!"

সরোজকুমারীর কবিতায় বিষাদের রাগিণী থাকিলেও তাঁহার বাস্তব জীবনে সন্তান-বিয়োগ-শোক-জনিত দুঃখ বেদনা ছাড়া হৃদয় তাঁহার পতিদেবতার মধুর প্রেমমিলনে স্বপ্নময় এবং সুখময় ছিল। অনেক কবিতায় সেই ভাবটুকু প্রকাশও পাইয়াছে। "আঁখি" কবি৽ায় কবি বলিতেছেন—

"আমার প্রাণের মাঝে উঠিছে ফুটিয়ে,
কোন দূর হ'তে কার সেই দুটি আঁখি,
রহিয়াছে যেন হায় অনিমিখ চেয়ে।
শুধু দেখিতেছি চেয়ে সে দুটি নয়ন,—
হাসিটুকু ভাসে তায় হারায়ে আপনা,
সঁপিছে সাদরে যেন আপন জীবন,
জানায় প্রাণের যত অতৃপ্ত বাসনা।
শুধু দেখিতেছি সেই অশ্রু জল ভরা
সজল বিমল সেই আঁখি দুটি কার!
বিদায়ের বেলা যায়, হায়, আত্মহারা—
যেন সে করুণ দৃষ্টে বাঁধে সাধ তার,
সহসা সে আঁখি যেন পাইয়া জীবন,
সপিয়া যেতেছে ধীরে মধুর চুম্বন।"

"শতদল"ও সরোজকুমারী দেবী বিরচিত একখানি কবিতাগ্রন্থ। এক-শতটি ঈশ্বর-ভক্তিপূর্ণ কবিতা-শতদলে ইহা সৌরভপূর্ণ। কবিতাগুলিতে বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। বিধাতার করুণার উপর অটল নির্ভর স্থাপন করিয়া তাঁহার মহিমা প্রচার করিয়া কবি তাঁহার এই শতদলের অর্ঘ্যডালা সাজাইয়া বিধাতার চরণে উপহার প্রদান করিয়াছেন। তাই ভক্তিভরে বলিয়াছিলেন—

"আমার হৃদয় মাঝে প্রেমভক্তি দিয়া
তোমার পূজার গান রাখিব রচিয়া।
পুষ্প সম যেন প্রাণ তোমার পরশে।
হাসিয়া ফুটিয়া উঠে মঙ্গল হরষে।"

"হাসি ও অশ্রু", "শতদল" ও "অশোকা" ব্যতীত সরোজকুমারী "কাহিনী" নামে একখানি গল্পগ্রন্থও প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কবি আজ অনন্তের পারে শান্তি লোকে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী

স্বর্গীয়া হিরণ্ময়ী দেবী ইং ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দেশ-সেবক ও অক্লান্তকর্ম্মী স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল ও খ্যাতনামা শ্রীমতি স্বর্ণকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠা কন্যা ও ৺মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহিত্রী।

বাল্যকাল হইতেই হিরণ্ময়ী দেবীর বিদ্যাশিক্ষার প্রতি প্রবল অনুরাগ ছিল এবং ১২ বৎসর হইতে ছোট ছোট ছেলেদের কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন; তাহা তৎকালীন ছেলেদের মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইত। নিম্নে তাঁহার কয়েকটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ ১৫ বৎসর বয়সে সম্পন্ন হয়। তাঁহার অনেক-গুলি সন্তান সন্ততি হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশই অকালে ঝরিয়া পড়ে। এখন তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা বর্ত্তমান। পর পর অনেকগুলি সন্তানের শোক পাওয়ায় তিনি যদিও ধারাবাহিকরূপে সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার অনেক কবিতা ও রচনা 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছে। যখন প্রথম শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী 'ভারতী'র সম্পাদন ভার ত্যাগ করেন তখন তিনি কিছুকাল একলা, ও পরে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত একযোগে 'ভারতী' সম্পাদন করেন।

হিরণ্ময়ী দেবীর একটি বিশেষ গুণ ছিল সেটি তাঁর অনন্যসাধারণ পারিবারক স্নেহ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। পিতা মাতার প্রতি অসীম ভক্তি তাঁহার প্রতি কাজে পরিস্ফুটিত হইত। সন্তানগণের শিক্ষার জন্য তিনি শুধু অর্থ ব্যয় করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজে নিকটে বসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। যেমন পারিবারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল তেমনি সামাজিক

কর্ত্তব্যের প্রতিও তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। শারীরিক দারুণ অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি সামাজিক কর্ত্তব্যগুলি যথাসাধ্য পালন করিতেন, কোন বাধা মানিতেন না। ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যের হানি হইত কিন্তু তিনি সে দিকে দৃক্‌পাত্ করিতেন না। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে যখন তাঁহার শক্তি নিঃশেষিত প্রায়, তিনি একজন বন্ধুর শ্রাদ্ধবাসরে শুধু মনের জোরে গিয়াছিলেন—মৃতের প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন তাঁর নিকট এতই গুরু কর্ত্তব্য মনে হইয়াছিল।

শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী যখন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য বঙ্গমহিলা-দিগকে লইয়া 'সখি-সমিতি' নামক একটি সমিতি স্থাপন করেন তখন হিরণ্ময়ী দেবীই কর্ম্মকর্ত্রীরূপে সমিতির সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; এমন কি, কয়েকটি বালিকাকে নিজ গৃহে স্থান দিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার সকল ভার গ্রহণ করেন।

অনাথা মেয়েদের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিয়া তাহাদের সুশিক্ষিতা করিবার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনই তাঁহার প্রাণে প্রবল ছিল, তাই 'সখি-সমিতি' যখন লুপ্ত হইবার উপক্রম হয় তখন সেই সঞ্চিত অর্থের উপর নির্ভর করিয়া একটি বিধবা-আশ্রম খুলিয়া সমিতিকে পুনর্জ্জীবিত করেন। এই আশ্রমটী স্থায়ী করিবার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আশ্রম বাটী নির্ম্মাণের জন্য টাকা সংগ্রহ করেন ও আশ্রমটির তত্ত্বাবধান ও মেয়েদের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় ক্রমশঃ তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, তথাপি শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার আরব্ধ কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এই আশ্রম হইতে অনেকগুলি বিধবা শিক্ষালাভ করিয়া গিয়া বিভিন্ন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া নিজ নিজ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন ও অনেক স্থলে আত্মীয় স্বজনকেও প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী [দণ্ডায়মান]

হিরণ্ময়ী দেবী সাহিত্য জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ না করিলেও তাঁহার এই লোক-হিতকর কার্য্যের জন্য চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন।

হিরণ্ময়ীর কবিতাবলী সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। তাঁহার কবিতা বেশ সরল ও মিষ্টি ছিল। কোনরূপ জটিলতত্ত্বের আলোচনা বা মীমাংসার কোন চেষ্টা ছিল না, আপনার আবেগে যাহা মন হইতে আসিয়াছে তাহাই তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এখানে তাঁহার দুই একটী কবিতা উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই ইহা উপলব্ধি হইবে। কবি 'গতবর্ষ'কে বলিতেছেন,—

"ওগো বর্ষ,—ওগো বৃদ্ধ, তুমি যবে এলে
হাসিটুকু এনেছিলে, কি লইয়া গেলে ?
কারো প্রার্থনার পানে চাহিলে না ফিরি,
যার যাহা প্রাপ্য ছিল দিলে চুল চিরি !
তবুও শুধাই তোমা এক বৎসরের
এই সুখ দুঃখ,—একি শুধু অতীতের ?
তোমার স্মৃতির চিহ্ন কিছু কি এমন,
ধরারাণী ধরে নাই হৃদয়ে আপন ?
দিলে না বুঝিতে ওগো কতটুকু কার
রেখে গেলে, নিয়ে গেলে কতটুকু আর !
তবু আজ ভাবিতেছি বসে, মনে মনে
তুমি গেলে তোমারেই পড়িবে স্মরণে।
তুমি যাহা দিয়ে গেলে তার তুলনায়
কে জানে এ নব বর্ষ দাঁড়াবে কোথায়।
যুঝাযুঝি অনিবার, ওঠা পড়া বারবার,
তা বলে কি ভূমিতল করিবে আশ্রয় !

প্রাণ সাথে থাকে কায়া, আলো সাথে আছে ছায়া
চির দিন এক সাথে জয় পরাজয়।”

* * * *

“নূতন বরষ আজি আনিছে বহিয়া,
আশীষ বারতা তব কাণে বাজিতেছে নব
নবীন আশার বলে ভরিতেছে হিয়া।
আর না করিব ভয় হউক তোমার জয়
সুখ দুঃখ যাহা দাও লব পাতি শিরে,
মহাধন্য হব আমি যদি হে জীবন স্বামি
কণা-মসী ঘুচে এই জীবনের নীরে।”

কবির মনে সেই একই প্রশ্ন জীবনরহস্যের কথা। সে কি ‘একই ন’ নয়? যে গান অনন্ত অতীত হইতে অনন্ত বর্ত্তমান ও অনন্ত বিষ্যতের মধ্য দিয়া বহিয়া চলিয়াছে! কোথায় শেষ, ওগো! কোথায় ষ, কে বলিতে পারে? কবি বলিতেছেন,—

“দেখ চেয়ে একবার অসীম রহস্যময়
অনন্ত এ বিশ্ব;
দেখ সেথা কিবা গায় কোন্ কথা বলে তোরে
প্রতি নব দৃশ্য।
ওই শোন সমস্বরে বলিছে হেথায় নাহি
বিলাপের স্থান,
এক যায় এক আসে নব নব সুখ ভাসে
স্মৃতি অবসান!
যে গেছে সে যাক্ চলে চাহি না রাখিতে ধরে
হোক্ সে বিলীন;

আবার তাহার ঠাঁই আসিবে নূতনরূপে
আনন্দ নবীন।
প্রতিদিন ফুল ফুটে প্রতিদিন ঝরে তারা
ফোটে নব ফুল,
রবি অস্তাচলে যায় নূতন তপন আনে
আলোক অতুল।
একটী বিহঙ্গ গীত চির তরে থেমে যায়
শত পাখী গায়,
একটী বসন্ত যায়, আবার দক্ষিণে ছুটে
বসন্তের বায়।
একটী তারকা খসে আকাশেতে শত তারা
ঢালে জ্যোতি-হাসি ;
একটী জাহ্নবী ঢেউ সাগরে মিশায়ে যায়
আপনা বিনাশি।
হিমগিরি হতে পুন তটিনী বহিয়া আনে
নূতন জীবন,
বিরহের গীতিখানি না হইতে অবসান
গাহেরে মিলন।"

পৃথিবীর বিচিত্র অচিন্ত্যনীয় রহস্যের এই বিশ্লেষণ কি সুন্দর নয়? তারপর জীবনের কতটুকু মাধুর্য্য? কতক্ষণকাল তার অস্তিত্ব?

"নিভৃত বনের মাঝে লতিকাটি দোলে,
ফুল এক ফুটে ছিল তার শ্যামকোলে।
শিহরেতে গাহে তার পাখী গুণগান,
কাণের কাছেতে অলি ধরে প্রেমতান।

প্রজাপতি এল নিতে কোমল পরশ,
পাইয়া সুবাস তার সমীর হরষ।
দু'দণ্ডে ফুরাল হাসি ফুল গেল ঝরে,
তারা গেল অন্য ফুল খুঁজিবার তরে।
ধূলি মাঝে একা শুধু রহিল পড়িয়া
শোভা হীন লতিকাটি মরমে মরিয়া।"

হিরণ্ময়ী দেবীর অধিকাংশ কবিতাই এইরূপ নৈরাশ্যময় করুণ সুরে গ্রথিত।

স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসু

বিদ্যুতের উজ্জ্বল দীপ্তি যেমন হঠাৎ আপনাকে প্রকাশ করিয়া নিবিয়া যায়, ফুল যেমন ফুটিতে না ফুটিতেই অনেক সময় বৃন্তচ্যুত হইয়া কঠিন ধরণীর বুকে ঝরিয়া পড়ে, স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসুও তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হইবার পূর্ব্বেই ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর সতের বৎসর পূর্ণ না হইতেই পরলোক গমন করেন। পঙ্কজিনীর জীবন-কথা অতি সংক্ষিপ্ত। সামান্য দু'চারিটি কথায়ই তাহা বলিতেছি।

পঙ্কজিনী ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জিলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম নিবারণচন্দ্র গুহ মুস্তফী। তেরো বৎসর বয়সে বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী প্রসিদ্ধ বজ্রযোগিনী গ্রামে শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ বসুর

স্বর্গীয়া পঙ্কজিনী বসু

সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই তাঁহার কবিতা রচনা করিবার শক্তি প্রকাশ পায়। পিতৃগৃহে অবস্থান কালে নিজের চেষ্টায় অভিধানের সহায়তা লইয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, টডের রাজস্থানের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহার অধিক আর কিছু শিক্ষা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, যাহা একবার পাঠ করিতেন তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না এবং তাঁহার অধিকাংশই আবৃত্তি করিতে পারিতেন। বিবাহের পর শ্বশুরগৃহে নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা কিছুমাত্র ছিল না, তথাপি মাঝে মাঝে কোন কবিতায় ইংরাজ কবিদিগের ভাব বেশ সুন্দর রূপে পরিস্ফুট রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। বিবাহের কিছু দিন পরে তাঁহার শ্বশুর তাঁহাকে রামের বনগমন সম্বন্ধে একটি রচনা লিখিতে বলিলে তিনি প্রায় একশত পংক্তির একটী কবিতা লিখিয়া তাঁহাকে দেন। তখনই প্রথম এই বালিকার কবিতা-রচনা-শক্তি জানিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয় ঐ কবিতাটি নাই।

রচয়িত্রীর মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১৩০৮ সালে প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার রচিত কবিতাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের ভূমিকাসহ প্রথম প্রকাশিত হয়। কলিকাতায় তাঁহারই তত্ত্বাবধানে ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল। মাত্র কয়েক খণ্ড স্বত্বাধিকারীর হস্তগত হয়। পুস্তক প্রকাশের অল্পকাল পরেই মিত্র মহাশয়ের মৃত্যু হওয়ায় অবশিষ্ট পুস্তকগুলির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। সুতরাং ১৩০৮ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হইলেও অতি অল্প লোকেই ইহার বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। তৎপর ১৩২৩ সালে ইংরাজী ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে 'বিদায়' শীর্ষক একটি কবিতা ব্যতীত পূর্ব্ব প্রকাশিত সকল

কবিতাই প্রকাশিত হইয়াছিল। খ্যাতনামা পণ্ডিত পরলোকগত অধ্যাপক হরিনাথ দে রচয়িত্রীর 'সূর্য্যমুখী' শীর্ষক কবিতাটির ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই ইংরাজী অনুবাদ দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত হইয়াছিল। হরিনাথ দে মহাশয় এই পুস্তক পাঠে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি অবসর সময়ে ইহার সমুদয় কবিতাগুলিই ইংরেজী পদ্যে অনুবাদ করিয়া দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কাল তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে দেয় নাই। রচয়িত্রীর জীবিতকালে দুই চারিটি কবিতা 'নব্যভারত' ও বৈকুণ্ঠনাথ দাস সম্পাদিত 'সখী' পত্রিকায় 'বালিকার কবিতা' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রচয়িত্রীর মৃত্যুর পর কবিতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় রচয়িত্রীর স্বামী ইহার নাম 'স্মৃতিকণা' রাখেন।

দ্বিতীয় সংস্করণ 'স্মৃতিকণা' প্রকাশ করিবার সময় প্রকাশক কবিতা-গুলিকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া নিম্নলিখিত ক্রমে সন্নিবেশিত করেন—(১) আধ্যাত্মিক ও ধর্ম্ম বিষয়ক (২) প্রেমবিষয়ক (৩) সামাজিক এবং (৪) প্রকৃত ঘটনা ও আত্মবিষয়ক। যে কবিতা যে যে ঘটনা অবলম্বনে লিখিত হইয়াছিল তাহা যতদূর জানিতে পারা গিয়াছিল উহা শিরোভাগে বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছিল। লেখিকা তেরো বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই এই সকল কবিতা রচনা করেন। 'প্রার্থনা' এবং 'কোথায় মরণ' তাঁহার শেষ রচনা। উহা মৃত্যুর পর তাঁহার উপাধান নিম্নে পাওয়া গিয়াছিল। তিনি কবিতা লিখিয়া প্রায়শঃই লুকাইয়া রাখিতেন, কাহাকেও দেখাইতেন না। অধিকাংশ কবিতাই তাহার মৃত্যুর পর স্বজনগণের হস্তগত হয়। ইহাতে ভাষার ও ছন্দের অনেক স্থলেই দোষ আছে। রচনার সময় ভাবস্রোত যেমন আসিয়াছে তেমনই লিখিয়া গিয়াছেন, পরে উহা সংশোধন বা পরিবর্ত্তনের আর সময় হয় নাই অথবা

কাহারও নিকট কোন উপদেশ লইবার বিশেষ সুবিধা হয় নাই। পঙ্কজিনীর জীবনের ও কবিতা রচনার ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। *

১৩০৬ সালের আষাঢ় মাসের 'প্রদীপ' পত্রিকায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় 'বঙ্গের রমণী কবিগণ' শীর্ষক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে পঙ্কজিনীর বিষয় সামান্যতঃ আলোচনা করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবু লিখিয়াছিলেন—"অল্পদিন হইল আমার এক বন্ধু শ্রীমতী পঙ্কজিনী বসুর কতকগুলি কবিতা আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। উক্ত বালিকার পড়া শুনা অতি সামান্য কিন্তু বেশ প্রতিভা আছে। স্বভাবের কৃপা হইলে অশিক্ষিত কবিও বাগ্দেবীর বীণায় সুর বাঁধিতে পারেন; আমরা আশা করি শ্রীমতী পঙ্কজিনী কালে বঙ্গীয় অপরাপর যশস্বিনী মহিলা-কবিগণের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিবেন।" দুর্ভাগ্যের বিষয় কাল সে আশা পূর্ণ করে নাই।

পঙ্কজিনীর কবিতার বেশির ভাগই জীবন-মৃত্যু সমস্যা লইয়া আলোচিত হইয়াছে। তরুণ কবি পরলোকতত্ত্ব ও আত্মার অমরত্ব লইয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। মৃত্যুর পরে মানুষের পরিণতি কি? সে কোথায় যায়? আমরা কোথায় যাইব, এই যে গভীরতম জটিল সমস্যা সৃষ্টির আবহমান কাল হইতে মানবের বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া আছে কবিও সেই অজানা পথের সন্ধান খুঁজিতে যাইয়া বলিতেছেন 'যাইব কোথায়?'

"এ ধরার খেলা সাঙ্গ হলে,
নাহি জানি যাইব কোথায়;
মাঝে মাঝে তাই থেকে থেকে
কাঁপে বক্ষ সন্দেহ-শঙ্কায়।

---

* ১৯১৮ খ্রীঃ অঃ চট্টগ্রাম মিণ্টোপ্রেস হইতে মুদ্রিত ও শ্রীসুবোধ বসু কর্তৃক প্রকাশিত 'স্মৃতিকণা'র বিজ্ঞাপন হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

কখনো মরণ ভাল লাগে,
কিন্তু পুনঃ হয় বড় ভয়,
পাছে মহাশূন্যতার মাঝে
শান্তি হারা ঘুরিবারে হয়।”

এই আশঙ্কায় কবির হৃদয় কাতর ও ব্যাকুল। আবার কবির হৃদয় হইতে ধ্বনিত হইতেছে—

“মৃত্যুতেও শান্তি যদি নাই,
তবে থাকি কিসের আশায় ?”

যদি মৃত্যুর পরপারে শান্তির রাজ্য না থাকে তাহা হইলে কেমন করিয়া মানব পৃথিবীতে কোন্ আশা বুকে লইয়া জীবন ধারণ করে ?—

“জীবনে যাতনা কত মত,
মরণেও বিশ্রাম পাবনা !
কি দুঃখ ইহার মত আছে ?
এ ভাবনা ভাবিতে পারি না।”

* * *

“কে সন্দেহ ভেঙ্গে দিবে মোর,
মৃত্যু পরে যাইব কোথায় ?
লভিব কি চির-শান্তি-সুখ,
অথবা মিশিব শূন্যতায় ?”

কে জানে ? তবে এই বিশ্বাসটুকুই কেবল মাত্র সম্বল—

“না, না, স্বর্গ নিশ্চয় যে আছে—
চির-শান্তি-সুখময় স্থান,
অপ্রেম, অশান্তি, শোক, দুখ
সেথা গেলে হইবে নির্ব্বাণ !”

তারপর কবি মৃত্যুর কথা আলোচনা করিয়া বলিতেছেন—

"আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায়
কহিলে মরণ কথা,
পিতা করে হেঁট মাথা,
জননীর দর দর অশ্রু বয়ে যায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় !
যবে আশীর্ব্বাদে মোরে
স্বজন স্নেহের ভরে—
'শত বর্ষ সুখে বেঁচে থাক এ ধরায়,'
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় !"

* * *

"মরণ কাহারে বলে
বুঝি কে মানবে ছলে ?
অনন্তে মিশাবে আত্মা, মৃত্যু বলে তায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় !
কভু নাহি হ্রাস ক্ষয়
আমি অচ্যুত অব্যয়,
ক্ষয় যদি হই, তবে বর্ত্তে দেবতায় ।
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় ;
করোনাকো অবিশ্বাস,
এ নহে অসত্য ভাষ,
ঈশ্বরের প্রতিরূপ আমি সর্ব্বথায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় !

সত্য বটে একদিন
হইবে ধূলায় লীন
আমিত্ব ক্ষুদ্রত্ব সহ ধূলিময় কায় ;
উহাতো মরণ নহে,
উহাকে নরত্ব কহে,
ক্ষুদ্র নর তারপর অনন্তে মিশায়।
উহারে গণেনা কেউ মরণ সংজ্ঞায় ;
আমি যে মরিব তাহা শুনে হাসি পায় !”

এই কবি জীবন-সমস্যার আলোচনার ভিতরই আপনাকে ভাবমগ্ন রাখিয়াছেন। জীবন-রহস্যের যে জটিল দার্শনিক তত্ত্ব যুগে যুগে জনমানব কোন মীমাংসার মধ্যে আনিতে পারে নাই, বালিকা কবি তাহা লইয়াই অনেক কথা বলিয়াছেন। তাঁহার ‘জীবন-রহস্যে’ বলিতেছেন—

“জনম অজ্ঞানে ঢাকা, মরণ আঁধারে রয় ;
মাঝে দুটি দিন তরে ধরা-সাথে পরিচয়।
সকলে যেতেছে চলে, তবুও কয়েদ মোরা
ভুলেও ভাবিনা কভু যাইব ছাড়িয়া ধরা।”

* * *

“দিন দিন কত তত্ত্ব প্রচারিত হয় ভবে,
আমি কে সন্ধান তার কেবা পাইয়াছে কবে ?
মানবের জ্ঞান কত হইতেছে প্রসারিত,
এ আঁধার যবনিকা হবে নাকো উত্তোলিত !”

* * *

“বলে দাও একবার—কেন আসে কোথা যায় !
কেন বা মানব জ্বলে পোড়া আশা-পিপাসায় ?”

এ সন্ধান মানুষ ত জানেনা, তাহার সমাধান ত মানব করিতে পারে না, তাই কবি আপনার হৃদয়কে অজানা সন্ধানে ব্যাকুল না করিয়া বলিতেছেন—

"নাগো না, চাহিনা আর জানিবারে এ সকল,
জলবিন্দু হয়ে মোরা খুঁজি সিন্ধু-বাসস্থল !"

এই সিদ্ধান্ত অসীমের কাছে অনন্তের কাছে মানব বরাবরই করিয়া আসিতেছে।

একদিন যে মরণ কবির কাছে কবির অন্তর-মন্দিরে আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছিল, রোগশয্যায় শায়িতা কবি রোগযন্ত্রণায় পীড়িত হইয়া তাহারই আবাহন-গীতি গাহিতেছেন! মৃত্যু বিভীষিকা তাহার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছে—

"যাহারে অবজ্ঞা করি
সকলে ফেলিছে ঠেলে,
অনন্ত অসীম স্নেহে
তারে তুলে লও কোলে।"

* * *

"বুলায়ে ও' কম কর
রোগীর যাতনা হর,
শ্রান্ত, ক্লান্ত, ভ্রান্ত জীবে
অতি স্নেহে কোলে কর।"

* * *

"তোমারি স্নেহের কোলে
জানি আমি এক দিন,

অবশ আকুল প্রাণ
ধীরে ধীরে হব লীন।
তাইতো মুগ্ধের মত
সদা আমি চেয়ে থাকি,
কোথায় মরণ, এস,
সে দিনের কত বাকী ?”

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগতের অনন্ত বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া গাহিয়াছেন—

“মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই !”

জগতের সঙ্গে মনুষ্যের সঙ্গে গভীর প্রেম ও জগতের সৌন্দর্য্যানুভূতিই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সৌন্দর্য্যের প্রকাশক। পঙ্কজিনীর ‘সৌন্দর্য্য মহান্’ কবিতায়ও A thing of beauty is a joy for ever বাণী সার্থক রূপে প্রতিভাত হইয়াছে। কবি বলিতেছেন—

“সৌন্দর্য্যের দাস আমি, সৌন্দর্য্যই করি ধ্যান,
সৌন্দর্য্য হৃদয়ে মম, সৌন্দর্য্য পরাণ ;
সৌন্দর্য্যে প্লাবিত ধরা, সৌন্দর্য্যই হয় সার,
যা দেখি, তাতেই দেখি সৌন্দর্য্যের ভার।
ওই যে ফুটেছে ফুল, গন্ধ করি বিতরণ,
হর্ষ পূর্ণ হৃদে দেখি শোভা অতুলন।”

* * *

"আকুল নয়ন মেলি, যার পানে যত চাই
অনন্ত সৌন্দর্য্য তত দেখিবারে পাই,
অতি ক্ষুদ্র বালুকণা, তবু তার অভ্যন্তরে
অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখি মুগধ অন্তরে।"

* * *

"সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌন্দর্য্যের চির দাস,
সৌন্দর্য্য হৃদয়ে রাখি পূজি বারমাস।"

সৌন্দর্য্যের উপাসক
সৌন্দর্য্যের চিরদাস
সৌন্দর্য্যকে হৃদে রাখি
পূজি বারমাস।

[illegible]

২৭ শে আগষ্ট ১৮৯৮

কবি পঙ্কজিনী বসুর হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি

পৃথিবীতে চিরদিন চিরকাল মানবের ব্যাকুল কণ্ঠ হইতে সুখ কোথায়? কোথায় সুখ? বলিয়া ব্যর্থ বেদনার বাণী ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে, মানুষ সুখের জন্যই লালায়িত, সুখের জন্যই ঘর বাঁধে আবার সুখের সন্ধানে নিরাশ হইয়া বলে—

"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল,
অমিয়া সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল!"

কবি সুখ কোথায়? কেমন করিয়া সুখকে পাওয়া যায় সেই কথা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন—

"সুখ নাহি কভু থাকে বাহিরেতে
সুখ নর-হৃদালয়ে
বসিয়া করিছে হাস্য কৌতুকেতে
নিজ আদর হেরিয়ে।
নীরবে গোপনে সবার হৃদিতে
সুখের নির্ঝর লাগিছে বহিতে,
ফল্গুসম অন্তঃসলিলা হইয়ে
আছে সুখ এজগতে।"

কিন্তু সেই সুখকে খুঁজিতে বাহিরে যাইতে হয় না, আপনার অন্তর মধ্যেই তাহার সন্ধান লইতে হয়। ইংরাজ কবিও এই কথাই বলিয়াছেন:—

"So take Joy home,
And make a place in thy great heart for her,
Then will she come and oft will sing to thee."

পুরুষ-সমাজ নারী-সমাজকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে। তবু নারী নানারূপে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া সেই দিকেই, সেই পুরুষের দিকেই চাহিয়া আছেন, আত্মনির্ভর শক্তি দ্বারা জানিবার জন্য কোন চেষ্টা করিতেছেন না—কবি তাই তাঁহার লাঞ্ছিত নারী-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া 'তাই দলে পায়' শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন—

"আলোকের জীব এরা আলোকে বেড়ায়,
আঁধারের কীট তোরা, তাই দলে পায়;
আবক্ষ ঘোমটা টেনে
কেবা কাঁদে গৃহে কোণে,
কেমনে জানিবে বল? হায় হায় হায়!"

পুরুষ-সমাজের—নারীর কল্যাণ-কামনায় অনুগ্রহ-দৃষ্টিপাত করিবার অবসর কোথায়?

"শত কাজে আছে ব্যস্ত স্বদেশীয়গণ
অনুক্ষণ শোভে হাতে, বিজ্ঞান, দর্শন;
স্বদেশের হিত তরে
কতই যতন করে,
এরা কি শুনিতে পারে তোদের রোদন!
শত কাজে আছে ব্যস্ত স্বদেশীয়গণ!

সেথা কি পশিতে পারে এদের নয়ন,
যেখানে দুহিতা, মাতা, ভার্য্যা-ভগ্নীগণ
কূপ-মণ্ডূকের মত
দৃষ্টি সদা আত্মগত
কি ভীষণ দুঃখ লয়ে মাগিছে জীবন।
সেথা কি পশিতে পারে এদের নয়ন!

কতই বক্তৃতা করে সভায় বসিয়া,
'জীবেপ্রেম,' 'আত্মত্যাগ,' বড়কথা দিয়া;
একটী স্নেহের কথা
না শুনিয়া পায় ব্যথা
যাহারা, তাদেরে যায় অবজ্ঞা করিয়া,
এদিকে বক্তৃতা করে সভায় বসিয়া।"

কবি পঙ্কজিনীর ধিক্কার পূর্ণ এই কষাঘাত পুরুষ-সমাজের অন্ধ চক্ষুতে আলোকের উদার দৃষ্টি ফুটাইয়া দিবে কি? 'বাঙ্গালীর ছেলে'র উপর

সুতীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেও কবি বিস্মৃত হন নাই। বাঙ্গালীর ছেলে কেমন ?—

"লম্ফ ঝম্ফ, হাঁকা হাঁকি
দেশোদ্ধারে ডাকাডাকি
সভায় করিয়া, ঢুকে শৃগাল-গুহায় !
বাঙ্গালীর ছেলে তোরা কে দেখিবি আয় !"

* * *

ফিরায়ে চিকণ কেশ,
চুরুট ফুকায় বেশ,
ঘড়ি, ছড়ি, চশমাতে কিবা শোভা পায়।
সদাই হুজুগে চলে
মোহের কুহকে ভোলে,
প্রেম বলে ফনী-হারে বাঁধিছে গলায় !
বিয়ে করে বাল্যকালে,
যৌবনে সন্তান-জালে
বিজড়িত হয়ে, শেষে দেখে অনুপায় !
কদাচারে কাঁদে জায়া,
বাপ মায়ে নাহি মায়া,
ভাইবোনে নাহি পালে স্নেহ-মমতায় ;
ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই,
বিসম্বাদ সর্ব্বদাই,
দেখিতে না পারে তারা কভু একতায় !"

* * *

"শ্রমেতে বিমুখ এরা,
শ্রম করে অসভ্যেরা,
সভ্য বাঙ্গালীরা শুধু প্রভু-লাথি খায়!
ষাট্ বর্ষে মরে দারা,
তবু দারা গ্রহে তারা,
নাহি লজ্জা বোধ কিংবা অপমান তায়!
আছে কি স্বর্গীয় প্রেম তাদের আত্মায়!"

বাঙ্গালীর যুবক-সমাজ এখনও কি এই অভিযোগ নতশিরে মানিয়া লইবেন?

স্বদেশহিতৈষিতার পবিত্র মন্ত্রেও কবির প্রাণ দীক্ষিত ছিল। দেশের কল্যাণ কল্পে তাঁহার করুণ কোমল কণ্ঠ হইতেও উদ্বোধন-বাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল। অতীত ভারত ও বর্ত্তমান ভারতের তুলনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

"কি ছিলে কি হলে, ভেবে দেখ একবার।
ঘুমায়োনা আর!
অত্যাচারে, অবিচারে,
গেল দেশ ছারে খারে!
কারো কি শকতি হায় নাহি জাগিবার
ঘুমায়োনা আর!"

* * *

"মরণেরে কর এবে উপাস্য সবার।
ঘুমায়োনা আর!
মৃত্যুকে যে করে ভয়,
তারি মৃত্যু আগে হয়,

জাতীয় জীবনে মৃত নাম লেখা তার।
ঘুমায়োনা আর!"

পরের মঙ্গল-মন্দিরে নারীর সেবাময়ী কল্যাণী মূর্ত্তি লইয়া উপস্থিত হইবার পবিত্র আকাঙ্ক্ষাও কবির হৃদয়ে জাগরিত রহিয়াছে।

"গাহিবারে তব নাম হৃদয়েতে দাও ভক্তি,
করিতে বিশ্বের সেবা দাও গো দেহেতে শক্তি।
কি সম্পদে, কি বিপদে, কাছে থাকি সর্ব্বদাই,
বল তারে, 'আমি আছি, ভয় নাই ভয় নাই'।"

তাঁহার প্রাণে এই যে সেবার জন্য ব্যাকুলতা তাহা কেন ফুটিয়া উঠিল? কেন না,—

"আমাদের দেশে সবে বড় লোকে সেবে
দলে দরিদ্রেরে,
উচ্চজন পদে লুঠে, দেখিলে দীনেরে
দূরে যায় সরে।
উঠিলে শারদ শশী দিক্ উজলিয়া,
তারি পানে চায়,
রহে যে আকাশ প্রান্তে ক্ষীণজ্যোতিঃ তারা
কে দেখে তাহায়?"

* * *

"উর্দ্ধ কর্ণ হয়ে শুনি, গায় যদি গীত
কোকিল, পাপিয়া,
ক্ষুদ্র পাখী গায় কেন? কে শুনে সে গান?
যাক্ না থামিয়া।

জগতের রীতি এই দীন হীন জনে
সবে দলে পায়,
দীন হৃদে থাকে যদি মহত্ত্বের বীজ
দেখে নাকো তায় !"

এই সহানুভূতিটুকু নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

"সূর্য্যমুখী" কবিতাটিতে প্রেমের নিষ্ঠা, প্রেমিকের প্রতি চিত্তের অপূর্ব্ব একাগ্রতা ও সারা প্রাণ দিয়া প্রিয়তমকে অন্তরে গ্রহণ করিবার অপূর্ব্ব চিত্র পরিস্ফুট। সে প্রেম কেমন ?

"চাহ নাকো প্রতিদান,
নাই মান, অভিমান,
মন কথা কয় বুঝি আঁখি সনে থাকি ?
নীরব প্রণয় তব একি সূর্য্যমুখি ?
কেমন নির্লজ্জ মেয়ে ;
তবু তার পানে চেয়ে
প্রত্যাখ্যান, অপমান সকল উপেখি,
"জগতের হিত তরে
মোর প্রিয় প্রাণ ধরে
কেমনে আমার হবে"—তাহাই ভাব কি ?
স্বরগের প্রেমরাশি একি সূর্য্যমুখি ?"
মন খোলা, প্রাণ খোলা,
আপনা, জগৎ ভোলা,
সুখ দুঃখে সর্ব্বকালে হয়ে পূর্ব্বমুখী,
জানিনা কেমন করে
থেকে দূর দূরান্তরে

না পরশি, সাধ পূরে শুধুই নিরখি,
নিষ্কাম নিষ্ক্রিয় ব্রত একি স্বর্য্যমুখি !"

বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত স্বর্গীয় হরিনাথ দে মহাশয় পঙ্কজিনীর 'সূর্য্যমুখী' কবিতাটির ইংরাজী পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। আমাদের উদ্ধৃত অংশ-সমূহের ইংরাজী পদ্যানুবাদ এখানে প্রদত্ত হইল।

"Not ever askest love's return
 Free from pride and love's conceit.
Or can it be that thou revealest
 With thy up turned gaze thy heart ?"

* * *

"Ah, shame on thee ! thou forward maiden,
 Gazing on him must thou pine ?
Heedless of all talk and blame,
 Careless of thy maiden fame.
Or doubtest thou with soul love-laden
 How he ever can be thine.

He to whom his life is given
 For the good of all this earth ?
Ah tell me, sun-flower, if in heaven
 Love so noble has its birth."

* * *

"Self-oblivious, world forgetting,
 No falseness e'er thy soul can mar
In weal or woe with steadfast eye
 Thou gazest on the eastern sky."

Thou art never seen regretting
Though thy loved one dwells afar.
Him to touch—'tis past thy power
Him to see—thine utmost bliss."

কবি পঙ্কজিনীর অনেক কবিতাই উল্লেখযোগ্য। কবির ভিতর যেমন বিকশিত পুষ্পের ভাবী সৌন্দর্য্য-সম্পদ ও সৌরভ-গরিমা সুপ্ত থাকে পঙ্কজিনীর মধ্যেও তেমনি কবিত্ব-সৌন্দর্য্য ধীরে ধীরে আপনাকে প্রকাশ করিতেছিল মাত্র! কিন্তু—

"ফুটিতে পারিত গো!
ফুটিলনা সে!"

শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী

বাঙ্গালা সাহিত্যে যে অল্প কয়েকখানা শোক-কাব্য আছে, তাহার মধ্যে শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী-প্রণীত 'প্রবাহের' নামও উল্লেখযোগ্য। 'প্রবাহ' কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। ১৩১১ সালে ১২১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে শ্রীসরসীলাল সরকার কর্ত্তৃক ইহা প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে হিসাবে 'প্রবাহের' বয়স ২৩ বৎসর।

কবি সরলাবালা কলিকাতাবাসিনী মহিলা। অল্প বয়সে একটী মাত্র কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন। এক সময়ে ইঁহার রচিত কবিতা 'সাহিত্য,' 'প্রদীপ', 'জাহ্নবী' এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে ছাপা হইত। 'সাহিত্য', 'প্রদীপ' ইত্যাদি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা-গুলির তারিখের দিক্ দিয়া হিসাব করিতে গেলে ইনি প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ

বৎসর পূর্ব্বে হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছেন। গদ্য রচনায়ও ইঁহার হাত আছে। কবি সরলাবালার 'প্রবাহ' যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন "জাহ্নবী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় আমাকে উহার একখানা উপহার দিয়াছিলেন। নলিনী বাবুর সম্পাদিত 'জাহ্নবী' পত্রে সে সময়ে কবি সরলাবালা নিয়মিত ভাবে কবিতা ইত্যাদি লিখিতেন। সরলাবালার কবি-প্রতিভার কথা অনেকের মুখেই শুনিতে পাইতাম। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয় কবি সরলাবালার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

১৩০৫ সালের ফাল্গুন মাসের 'প্রদীপ-পত্রে' তাঁহার লিখিত 'জীবন' কবিতাটি অনেকের ভাল লাগিয়াছিল। সে সময়ে ঐ কবিতা অনেকের মুখে মুখে শুনিয়াছি।

"বসিয়া নদী তীরে,
চাহিয়া অপলকে,
বালুকা গণি আমি শুধুরে।
তটিনী কুলুকুলে
বহিছে কূলে কূলে,
শ্রবণে বাজে আসি মধুরে!
উপরে নীল মেঘে
তপন আছে জেগে,
দহিছে শির খর কিরণে।
খসিয়া পাতাগুলি
মাখিছে বন ধূলি,
লুটায়ে পড়ে তরু চরণে।

কুসুম অবশিত,
কোকিল শ্রান্তচিত,
ভ্রমর আর নাহি গুঞ্জরে।
রয়েছে বন-ছায়ে
বিহগ লুকাইয়ে,
বকুল আর নাহি মুঞ্জরে !”

এই কবিতাটীর ভিতর আমাদের বসন্তের আনন্দের মধ্যেও জীবনের ব্যথার কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে।

কিসের এ জীবন ? ক দিনের এ জীবন ? কোথায় ইহার পরিণাম ! তখন কি আপনা হইতে মনে পড়ে না—

‘We laugh, but foolish is our joyous mirth.
Tears best befit all dwellers upon earth !
‘Neath fortune’s wheel we break like brittle glass,
Which no fresh mould shall ever restore, alas.’

সত্যই কি মনে হয় না, সত্যই কি এই বিশ্বাস হৃদয়ে জাগে না—

“ফুরায়ে যায় বেলা,
ভাঙ্গিছে খেলামেলা,
লুকায় পাখী নিজ আবাসে।
আকাশে রাঙ্গা রাঙ্গা
নীরদ ভাঙ্গা ভাঙ্গা
শতেক রঙ্গে কত শোভা সে।

বনের ছায়া মাঝে
আঁধার ভীম সাজে
প্রকাশে ক্রমে নিজ মূরতি।
সে আলো কোথা গেল,
আঁধার দেখা দিল,
না জানি ধরণীর কি রীতি।

তারপর— জগত এলোকেশে
ঢাকিয়া ভীম-বেশে
রহিল নিশা তম-বরণী।
কেহ না আসে কাছে,
কোথায় কেবা আছে,
সবারে ডাকি আয় আয় না।
আঁধার ঘোর এসে
পড়েছে তট দেশে,
বালুকা দেখা আর যায় না।
শুধুই মেঘ-শিরে
তারকা উঁকি মারে,
আলেয়া করে দূর হল না।
গভীর অন্ধকারে
রহিনু নদী তীরে,
বালুকা গণা মোর হল না!"

জীবন এমনি করিয়াই অন্ধকারে মিলাইয়া যায়—বালুকা গণা হয় না।

'প্রবাহের' কবিতাগুলি—উৎসর্গ, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যা একয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়া সাজান হইয়াছে। প্রত্যেক কবির জীবনেই একটী

সুর, একটা নিজস্ব সত্ত্বা থাকে, ফুলের গাছটি যেমন ধরণীর বক্ষ হইতে রস আহরণ করিয়া পুষ্পের রূপ-মাধুর্য্য প্রকাশ করে তেমনি কবির হৃদয়-কুঞ্জেও যে ফুল ফোটে তাহা সেই মূলসুরকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়। প্রবাহের কবির সুর—মহিলা কবিদের অধিকাংশের ন্যায় বেদনার সুর। নারী-হৃদয়ের বেদনা, ব্যথা অশ্রুধারা-রূপে বহিয়া চলিয়াছে। উৎসর্গে দেখিতে পাই কবি পরলোকগতা জননীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

"জননি আমার,
ধ্রুবতারা রূপিণি আমার!
নিশি দিন আঁখি আগে,
যদি তব ছবি জাগে
ভয় কোথা পথ-হারা বায়?
দীপ্তিময়ি তৃপ্তিময়ি অমরা-বাসিনী,
ধ্রুবতারা-রূপিণি জননি!
অনাবৃত হিমময় হৃদয় আমার,
চারিদিকে কঠিন তুষার।
তোমার প্রখর তেজে,
গলিয়া গিয়াছে সে যে,
নাহি আর কঠিন তুষার,
আজি সে পাষাণ গেহে, যে প্রবাহ যায় বহে
শুন কলধ্বনি-স্তুতি, তার,
জ্যোতির্ম্ময়ি জননি আমার,
রবিচ্ছবি রূপিণি আমার!"

বিধবা—আশ্রয়হারা কন্যার কাছে মায়ের স্মৃতি কত বড় মধুর, মায়ের কথা কত বড় আনন্দের, কত বড় সাহসের ও কত বড় অবলম্বন সে কথা

মাতৃহারা বেদনা-কাতর তনয়া ব্যতীত অপরের বুঝবার সাধ্য কোথায়? তাই তাঁহার কাছে বিশ্ব প্রকৃতির সমগ্র ছবি নানারূপে মাতৃ-মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে।

কবি দেখিতেছেন—

"নীলাকাশে বিন্দু বিন্দু দীপ্তি চূর্ণগুলি,
ছড়ায়ে পড়েছে চারিদিকে পথ ভুলি,
মনে পড়ে, যতবার চেয়ে আমি দেখি,
আমার মায়ের দুটী স্নেহভরা আঁখি।
সভয়ে, সঙ্কোচে, ম্লানমুখে শশী এসে,
বরষার সন্ধ্যাকালে দাঁড়াল আকাশে,
মনে পড়ে, দেখি সেই মলিন বদন
আমার মায়ের দুটী করুণ নয়ন।
কোজাগর পূর্ণিমা নিশীথে, জ্যোৎস্নারাণী,
স্নেহ-বাহু-পাশে বাঁধি আদরে ধরণী,
সস্নেহ-চুম্বন তারে করে বার বার
মনে পড়ে, মায়ের সে স্নেহ-পারাবার।"

আবার সন্ধ্যার অন্ধকারে, যখন গাছে গাছে অন্ধকারের কালো ছায়া চারিদিক ঢাকিয়া ফেলে, যখন আকাশে তারা ফুটিয়া উঠে, যখন ঘরে ঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে তখন মাতৃবিয়োগ বিধুরা কবি কি করেন? কবি বলিতেছেন,—

"আমি মা, আকাশে চেয়ে থাকি
অনিমেষ আঁখি নিয়ে,
আকাশের পথ চেয়ে,
শুধু মা তোমায় আমি ডাকি

জননি গো! বল, বল,
এ তোর কিসের ছল?
আমি কি নিজেরে দিই ফাঁকি?

আবার— কোথা মা আছিস্ বল্ একবার,
উত্তর পাই না ডাকি শতবার
বিপদে সম্পদে তোরে ডেকে বাঁচি,
এই অধিকারে আজো বেঁচে আছি।"

'পাষাণী মা', 'ভিক্ষা', 'মনে রেখো', প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে কাউপারের On the Receipt of my mother's Picture out of Norfolk কবিতাটির কথা মনে হয়। মনে পড়ে—

"Oh that those lips had language!
Life has passed
With me but roughly since I heard thee
last.
These lips are thine – thy own sweet smiles
I see,
The same that oft in childhood solaced me;"

ইত্যাদি।

এই শোক-গাঁথার পর কবির 'প্রভাত-জীবন' আরম্ভ হইল। প্রভাত যেমন তাহার ললাটে নবারুণের মধুর আশায় দীপ্তিটুকু ফুটাইয়া তুলিয়া আশার বাণী সকলের বুকে জাগাইয়া দেয়—নূতন আশায়, আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হয়, তেমনি কবির প্রথম জীবনে "প্রাণের আকাঙ্ক্ষা" ছিল—গানের মত, বরষার নদীর মত, বীণার মত, ফুলের মত, কখনও উন্মাদ সুরে, কখনও কূলে কূলে উচ্ছলিয়া উঠিয়া, কখনও বীণার মত বাজিয়া, ফুলের মত ফুটিয়া—

"কত জাতি, কত ভাষা, সুখী দুঃখী কত পরিবার
প্রাণ যদি প্রাণ হ'য়ে মিশায়ে রহিত প্রাণ তার ;"

তাহা হইলেই সার্থক হইত। পরের সেবায় পরের কল্যাণে জীবনের তপস্যা পূর্ণ হইত—কিন্তু হায়!—

"বিফল তপস্যা মোর!
নিশি জাগি বৃথা আরাধন!
জীবন স'পিনু, তবু
গড়িবারে নারিনু জীবন!"

এমন করিয়া কত জীবনেরই আশা ও আকাঙ্ক্ষা মিলাইয়া যায়! 'নির্ঝরের আত্মসমর্পণ' কবিতাটির সহিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র অপূর্ব্ব ঐক্য দৃষ্ট হয়। নির্ঝর যেমন নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়া অবশেষে সাগরে আপনাকে নদীর আকারে আত্মসমর্পণ করে, তেমনি নির্ঝররূপিণী বালিকা তরুণীর আকারে যৌবন-অভ্যুদয়ে প্রাণ-দেবতার অগাধ হৃদয়-সাগরে আপনাকে আত্মসমর্পণ করে। ইহাই প্রণয়ের রীতি। কবি 'নির্ঝরের আত্মসমর্পণে' বলিতেছেন,—

"অতি দূর পর্ব্বত-শিখরে,
গিরি যেথা ঢাকে মেঘ জালে,
নিভৃত আঁধার গুহা-কোলে,
নির্ঝরিণী ছিল শিশুকালে,
দিন যত যায় দিনে দিনে,
কি যে চিন্তা উঠে তার মনে,
একা একা কুলু কুলু স্বরে,
গান গাহে কারে মনে করে

গুহা আর ভাল নাহি লাগে,
না জানি সে যেতে চায় কোথা,
কে বুঝিবে নির্ঝরের ভাষা
কে বুঝিবে তার মর্ম্ম-ব্যথা ;
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাসে,
নির্ঝরিণী ছুটে চলে আসে,
কোথা, শিলা বাধা দেয় পথে,
ভ্রূ-ক্ষেপ নাহি তার তা'তে,
অনন্তের অজানা পথেতে
ক্ষুদ্র-প্রাণা এক নির্ঝরিণী
কোথা যেতে চায় নাহি জানি।
পর্ব্বতের শিখর হইতে
ছুটে এসে শিলাময় পথে.
ক্ষীণ স্রোতা নির্ঝরিণী এক
ঝাঁপায়ে পড়িল হ্রদ-স্রোতে।
চাহি দেখিল না আগু পিছু,
একবার ভাবিল না কিছু,
দূর হতে ছুটিয়া আসিয়ে,
একেবারে পড়িল ঝাঁপায়ে;
যৌবনের প্রবল উচ্ছ্বাস,
যৌবনের মধু ভালবাসা,
যৌবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা,
যৌবনের সুখ দুঃখ আশা,
সকলই মিশাইল, সে যে

হৃদ-স্রোতে ঢালি তনুখানি,
সরলা সে ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী !”

এখানেও আপনাকে আত্মবিস্মৃত হইয়া বিলাইয়া দেওয়ার কথাই আছে।

আমাদের দেশের কি ঔপন্যাসিক, কি কবি,—পুরুষ ও নারী উভয় জাতির লেখকের কথাই বলিতেছি—নারী জাতির পরাধীনতা অন্তঃপুর-নিবদ্ধা শৃঙ্খলাবদ্ধ একটী ভাবের পরিচয় দিয়া নারী-সমাজের দুঃখে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু কবি সরলাবালা বঙ্গবালার পরাধীনতা কথাটা মানেন না। তাঁহার সাহসিক উক্তি এবং অভিব্যক্তি এই যে—

“পুরুষের হৃদয় মন্দিরে, আছে যেই কোমল অন্তর
সে মন্দিরে অধিষ্ঠাতা তুমি, সে অন্তর আসন তোমার।
বঙ্গবালা পরাধীনা তুমি ? নহ সখি, পরাধীনা নহ,
অন্তঃপুর কারাগার নহে, অন্তর তোমার চির গৃহ।
বন্দিনী হয়েছে সখি নিজে, আপনারে হারায়ে বিহ্বল,
সাধ করে পরিয়াছ পায়ে, ভালবাসা কুসুম-শৃঙ্খল।
কে বলে তোমায় পরাধীনা, সর্ব্বময়ী বঙ্গবালা তুমি,
দেবী ব’লে প্রতিষ্ঠা করেছে অন্তরেতে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী।
হৃদয় ত ক্ষুদ্র গৃহ নয়, বিশ্বের সবার বাস এ যে,
সকলে তোমায় হৃদয়েতে তুমি সখি সকলের মাঝে।”

বর্ত্তমান উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতার দিনে একথা কেহ শুনিবে কি ?

কবি, ঔপন্যাসিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতির জীবনে বৈচিত্র্য এবং বহু দর্শনজনিত অভিজ্ঞতা এবং ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও নানাদেশের নানাভাবের নানা সমাজের লোকজনের সঙ্গে পরিচয় থাকিলে কাব্যলক্ষ্মী যেমন অপূর্ব্ব

রস সমাবেশে ফুটিয়া উঠে এমন কিছুতেই হয় না। আমাদের দেশের এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত এইরূপ অভিজ্ঞতা ও দূর দৃষ্টি কাহারও নাই। তারপর একটা সত্যকে সাধারণ সংস্কার বা সমাজের বিরুদ্ধে সাহসিকতার সহিত প্রচার করিতেও বড় দেখা যায় না।

কবি সরলাবালার কবিতার মধ্যেও বৈচিত্র্য নাই। বাঙ্গালা জীবনের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ সংস্কার এবং সমাজগণ্ডীর বাহিরের দিকের কোন কথা নাই। আছে প্রাচীন প্রচলিত সমাজকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া তাহারই মধ্য হইতে যতটুকু সহানুভূতি এবং অনুভূতি জাগাইয়া তোলা সম্ভব প্রবাহের কবির বাণীতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। সেই নদীর কলগীতি ধীরে ধীরে বহিয়া চলিয়াছে—

"বাতাস বহে না বহে, তারকা চাহিয়া রহে,
ক্ষীণ গঙ্গা ধীরে বয়ে যায় ;
তরণী উপরে নেয়ে কি সুরে উঠেছে গেয়ে
পরাণ টানিছে যেন তায়।"

* * *

"আবার—তরু-কোলে রাখি মাথা মাধবী কহে কি কথা
কোকিলা আপন মনে গায়,
শ্যাম-সন্ধ্যা ধীরে আসে দাঁড়ায় পৃথ্বীর পাশে,
ঢুলে ঢুলে ফুল পড়ে গায়।
দুটি মেয়ে নদী তীরে চাহিয়ে রয়েছে ধীরে,—
হাত দুটী গলায় গলায়,
হাসি হাসি দুটি মুখ, হৃদয়ে কত না সুখ,
ফাঁকা ফাঁকা চাহনিতে চায়।

সুদূরে আকুল সুরে কে যেন ডাকিছে কারে,
কাছে এসে বা'য়ে ভেসে যায়!
আজি প্রাণ কি যেন কি চায়।"

* * *

"কে কি বলে কাণে কাণে, বায়ু কার ডাক আনে,
করিবারে পাগল আমায়?
ফুল কেন ভাসে ঢেউয়ে, পাখী কেন উঠে গেয়ে,
নেয়ে কেন তরী বেয়ে যায়?—
গঙ্গা কেন বহে ধীরে, ছায়া কেন পড়ে নীরে,
ম্লান শশী মুগ্ধনেত্রে চায়?
বিদেশ বিভূমে একা কার আর পাব দেখা
হিয়া ঢাকা তীব্র বাসনায়।
আজি প্রাণ কি যেন কি চায়!"

এই দৃশ্য—এই মনের ভাব ও কামনা বাঙ্গালী জীবনের চিরন্তন প্রবাহ-ধারা এমনই করিয়া যুগে যুগে বহিয়া চলিতেছে। গঙ্গার যে পবিত্র ধারা অনাদি অনন্তকাল হইতে ভারতবর্ষের বুকের উপর দিয়া বহিয়া চলিয়াছে তাহার সহিত আমাদের পরিচয় বংশপরম্পরা ভাবে প্রচলিত। তাহার সহিত আমাদের অন্তরের অখণ্ড যোগ রহিয়াছে। কবির নদীর উপর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার 'নৌকাযাত্রা' 'গ্রীষ্মের গঙ্গা', 'নদী তীরে' প্রভৃতি কবিতায় নদীর কথাই বর্ণিত আছে।

কবি আপনাকে 'প্রভাতের কবি' বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া বলিতেছেন—

"আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন শিশিরের মত,

প্রভাত ফুরায়ে গেছে হায়,
তাই বড় হয়েছি বিব্রত !
শিশির শুখায়ে গেছে বনে
প্রভাতের বিদায়ের সনে,
শুখায়েছি, তবু বেঁচে আছি
দগ্ধ হয়ে তপন-কিরণে।
শিশির শুখায়ে গেল বনে,
প্রভাত ফুরায়ে গেল হায়,
আমি এক প্রভাতের কবি
এ জীবন কেন না ফুরায় !”

একদিন জীবন-প্রভাতে কবির হৃদয় প্রভাত-সঙ্গীতে আশার বাণীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—তখন কবি আপনার মনে বিহঙ্গের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে গাহিতেন—

“ফুল ফোটে কেমন করিয়া
তা' তো গেয়েছিনু একদিন,
গেয়েছিনু উষায় কেমনে
আঁধার আলোকে হয় লীন,
গেয়েছিনু বসি নিরজনে,
নদী বহে যায় কোথা বেগে,
রবি ওঠে পূরব গগনে,
পশ্চিমেতে শশী হয় ক্ষীণ।
এই কোলাহলে কি করিয়া,
কি গাহিব বোঝেনাত হিয়া,

তার যত তুলে বাঁধি আমি,
ক্ষীণ সুর তত পড়ে নামি,
কোথা সেই আলো-অন্ধকার
আধ-ঘুমে মগ্ন বিশ্ব ছবি,
এ তরঙ্গে কোথা যাব ভাসি,
ক্ষুদ্র আমি প্রভাতের কবি !"

বিশ্ব নিখিলের অনন্ত সৌন্দর্য্য-সম্ভারের মধ্যে এমন করিয়াই আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে হয়। তখন আপনার শক্তির অভাব উপলব্ধি হইয়া কোন্ অজ্ঞাতজনের সন্ধানে চিত্ত ব্যাকুল হয়, প্রাণ গাহিয়া ওঠে—

"অচেনা এ মধ্যাহ্ন-জগৎ
অচেনা এ জগতের জন,
প্রভাতের কবি তাই খুঁজে
কোথা তুমি মধুর মরণ !"

যে সত্যের মীমাংসা এ জগতে হইল না,—কে জানে পরপারে তাহার কোন মীমাংসা হইবে কিনা, তাহার কোনও সমাধান আছে কি না !

'দ্বি-প্রহর' কবিতাটি পড়িতে পড়িতে কত যুগ যুগান্তরের কাহিনী, জীবনের অপূর্ণ বাসনা এবং জীবনের বিচিত্র অজ্ঞাতরহস্যের কথা মনে পড়ে।

মনে পড়ে—

"জীবন মরণ—সুখ দুঃখ—যেন দুই তীর
তার মাঝ দিয়া,
স্রোতোস্বিনী কি উদ্দেশ্যে (কি জানি কি কার্য্য তার)
চলেছে ছুটিয়া ;

কত শত পণ্যতরী স্থ-বাতাসে ভর করি
যায় নিজ পথে,
দশ দিকে জলে স্থলে জীবন প্রবাহ-চলে
আনাগোনা জীবন্ত-জগতে !"

কথা পুরাতন কিন্তু ইহাই হইতেছে মানবজীবনের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা। নিরাশ্রয়—মানুষের মত নিরাশ্রয় কোথায় কেহ আছে কি ?—দিবারাত্রি মানবকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে—

"কোথায় জুড়াই ?
হায় ! স্থান কোথা পাই ?
নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক হব—যে আবাসে গিয়া,
কোথা সে ভবন ?
হৃদয়ের ভার দিব যে পায় ঢালিয়া,
কোথা সে চরণ ?
হায় ! স্থান কোথা পাই ?
তীব্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠে,—
'নাই, নাই, নাই !'
সত্য সত্যই—ধরণীর জীব কাঁদে নিরাশ-অন্তরে,
হায় ! স্থান কোথা পাই ?"

তখন—মানুষ অসহায়ের মত আত্মশক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া বলিয়া ওঠে—

"তুমি হে নির্ভর !
জগতে আশ্রয় দাও, ঘুচাও বাসনা,
পূরাও অন্তর !"

এ ছাড়া যে আর কিছুই নাই।—বিধবা নারীর মর্ম্ম-বেদনা তাঁহার 'চিতায় চিতায়' কবিতাটিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। অতি অল্প কথায় বেদনা দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে,—

"বড় ব্যথা পেয়েছিল সে,
হৃদয়ে জ্বলিত শত চিতা,
চিতায় চিতায় আজি মিশে
নির্ব্বাণ হইল তার ব্যথা।
পরাণের অনন্ত শ্মশান,
শ্মশানের ছাই হ'য়ে গেছে,
হৃদয়ের অনন্ত যাতনা—
যাতনা-সমুদ্রে মিশিয়াছে!"

*   *   *

"কাঁদ কেন আর তার তরে?
ডাক কেন মর্ম্মভেদী ডাক?
সে যেখানে গিয়াছে চলিয়া,
বড় সুখে আছে, থাক্, থাক্!"

জীবনে দুঃখের জ্বালা না সহিয়া কাহারও জীবন যায় না। বেদনা বহন করিতেই হইবে। মরণের বেদনা সহিতেই হইবে। ফুলের মত আপনার প্রিয়জনেরা হয়ত বা একে একে তোমার চোখের সামনে পরপারে চলিয়া যাইবে, সে দুর্ব্বিসহ বেদনা বিস্মৃত হইবার শক্তি কোথায়? মরণ কি সর্ব্ব দুঃখ বেদনার মাঝখানে প্রাণে শান্তি দিবে না? মরণ কি শান্তির আশ্রয় নয়? মরণ কি ভীষণ? মরণ কি শুধু একটা আতঙ্কেরই সৃষ্টি করে? কিন্তু কবি মরণের ভীষণ-চিত্র আঁকেন নাই। তাঁহার কাছে,—

মানসে গড়িয়া পূজি মনোময় দুর্লভ চরণ,
তোমার মূরতি মাঝে পাব কি তাহার দরশন ?
করুণা অমৃতময়ী মাতৃরূপা আমার দেবতা
তোমার মূরতি ধরি' জুড়াইয়া দিবে নাকি ব্যথা ?
দেখিব কি যাহা কিছু কাম্য এ জীবন-তপস্যার,
সব মিশি এক সাথে হইয়াছে মরণ আমার।"

মরণের এই চিত্রটি প্রাণ হইতে মৃত্যুর বিভীষিকা দূর করিয়া দেয়! পতিতার বেদনায়ও কবির হৃদয় বিগলিত। কবি ইহাদের বেদনায় বড় দুঃখে বলিতেছেন,—

"কে জানে নরক কি যে, যে জ্বালা বুকের মাঝে
এর কাছে নরক কি ছার!
বুকে বিষ মুখে হাসি—একি এ অনল রাশি,
অনলের মহাপারাবার।"

* * *

"যে দিন প্রথম, অভাগিনী
দেখিল ধরার মুখ, কত স্নেহ, কত সুখ,
পেয়েছিল উহারো জননী—
উহারও আগমনে একদিন গৃহাঙ্গনে
উঠেছিল আনন্দের ধ্বনি;
পিতার মাতার স্নেহে সুখের শৈশব-গেহে
উহারো কেটেছে শিশুবেলা,
খেলা ঘরে, আম্রতলে, কত দ্বি-প্রহর কালে
ভাই বোনে করিয়াছে খেলা।
উহারও পরিণয়ে শৈশবের সে আলয়ে
হয়েছিল কতই উৎসব,

মঙ্গলের হুলা হুলে, একদা অঙ্গন স্থলে
উঠেছিল কত কলরব,
ধরিয়া দু'খানি করে, অশ্রু গদ গদ স্বরে
সমর্পণ করিলেন পিতা,—
দেখ, ওর মর্ম্মস্থলে চির দীপ্ত কি অনলে
লেখা আছে সে সব বারতা !"

আজ—সেই দিনের শেষে কি ভীষণ দিনই না আসিয়াছে !—আজ তাহার,—

"নাহি সুখ, আশা, স্নেহ, ভগ্ন স্বাস্থ্য, জীর্ণ, দেহ,
জীবনও জীবন বিহীন !
দারুণ হিমের রাতে, দাঁড়াইয়া রাজপথে
অনিদ্রায় রজনী পোহায় !"

* * *

"ওগো তুমি মহাজ্ঞানী, ধার্ম্মিকের শিরোমণি
ঘুচাও সন্দেহ একবার,
যে অবোধ এক পলে, সর্ব্বস্ব হারায়ে ফেলে
তার আর নাহিক উদ্ধার ?"

এই বাণী নারী-হৃদয়ে স্বাভাবিক এবং সহানুভূতি জ্ঞাপক। কবি সরলাবালার প্রবাহের কবিতায় সর্ব্বত্রই আন্তরিকতা এবং কবি হৃদয়ের স্বাভাবিক সহানুভূতিপূর্ণ সরলতা নানা ভাবে নানারূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। ইহাই হইতেছে এই মহিলা-কবির বিশেষত্ব। বাঙ্গলাদেশের অল্প সংখ্যক শোক-কাব্যের মধ্যে কবি সরলাবালার 'প্রবাহের' প্রবাহও প্রবাহিত থাকিবে।

শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী বি, এ,

"রেণু", "পত্রলেখা", "অংশু" প্রভৃতির কবি শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবীর নাম বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলার সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার ছোট ছোট কবিতাগুলি সর্ব্বজন সমাদৃত। প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কবির হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভাবটি শিশিরসিক্ত পুষ্পের ন্যায় বেদনার অশ্রু-বিন্দু লইয়া করুণ ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাহাড়ের বুক ভাঙ্গিয়া ধীরে ধীরে উপল শয়নে ব্যথিত প্রাণে নির্ঝর যেমন করুণ কোমল গানে নামিয়া আসে, তেমনি অতি ধীরপদে সঙ্কোচভরা বুকে কবির কবিতা-বধূ ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়া সাহিত্যক্ষেত্র আপনার সরসধারায় সিক্ত করিয়া শ্যামল শোভন সবুজ শ্রীতে বিকশিত করিয়াছে।

প্রিয়ম্বদা দুঃখের কবি। হৃদয়ভরা মর্ম্মযাতনা তাঁহার কবিতায় বিকশিত। তাঁহার কবিতা পড়িতে পড়িতে পাঠকের মনে পড়িবে Vanitas Vanitatum :—সকলই বৃথা; নাই নাই কিছু নাই।

"All the flowers of the spring
Meet to perfume our burying;
There have but their growing prime,
And man does flourish but his time;
Survey our progress from our birth—
We are set, we grow, we turn to earth."

* * * *

"Sweetest breath and clearest eye
Like perfumes go out and die;

And consequently this is done
As shadows wait upon the sun
Vain the ambition of kings
Who seek by trophies and dead things
To leave a living name behind,
And weave but nets to catch the wind.

এই যে নৈরাশ্যের ভাব, এই যে নশ্বরতা, এই যে বেদনা—তাহা কবি প্রিয়ম্বদার কবিতার প্রাণ। কবির পরিচয় কাব্যে হইলেও তাহার মূল সূত্রটুকু কবির জীবনের সহিত গ্রথিত থাকে। প্রিয়ম্বদার জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল—উহা হইতেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন কেন এমন করুণ কাকলী কবির কাব্যমধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে।

"বনলতা" রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবী প্রিয়ম্বদার জননী। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর বাল্য-শিক্ষা কৃষ্ণনগর বালিকাবিদ্যালয়ে আরম্ভ হয়। সেখানে তাঁহার মাতামহ ৺দুর্গাদাস চৌধুরী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। সেই বালিকা-বিদ্যালয় হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি বৃত্তিলাভ করেন ও দশ বৎসর বয়সে ১৮৮২ সালে বেথুন স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮৮ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৯০ সালে এফ, এ এবং ১৮৯২ সালে বি, এ পাশ করিয়া সংস্কৃতে বিশেষ পারদর্শিতার জন্য রৌপ্যপদক পুরস্কার পান।

ঐ বৎসরেই তিনি সংসারে প্রবেশ করেন। ১৮৯২ সালে আষাঢ় মাসে স্বর্গীয় তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। লেখিকার স্বল্পস্থায়ী দাম্পত্য-জীবন যে, অতি সুখময় হইয়াছিল তাহা তাঁহার 'রেণু' গ্রন্থের পাঠক পাঠিকাকে না বলিলেও চলে। বিবাহের পর স্বামীর সহিত শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রায়পুরে গমন করেন।

শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি. এ.

তারাদাস বাবু রায়পুরের প্রধান উকিল ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা, বদান্যতা ও সহৃদয়তায় রায়পুরবাসিগণ মুগ্ধ ছিলেন। তিনি নদীয়া জেলার এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে তারাদাস বাবু দানশীল। বৃত্তির টাকাগুলি তিনি সহপাঠিগণের প্রীতিভোজে ও গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দিয়া ব্যয় করিতেন। উপার্জ্জনক্ষম হইয়া তাঁহার দানশীলতা আরও বৃদ্ধিলাভ করে।

১৮৯৪ সালে প্রিয়ম্বদা দেবী তাঁহার একমাত্র পুত্র তারাকুমারের জননীত্ব লাভ করেন। হায়, তাঁহার ভাগ্যসূর্য্য তখন মধ্যাকাশ ছাড়িয়া ক্রমে পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িতেছিল। পরবৎসর ১৮৯৫ সালে সেপ্টেম্বর মাসে তাঁহার স্বামীর লোকান্তর ঘটে। ইহার কিছুকাল পরে রেণুর কবিতাগুলি লিখিত।

তাঁহার কবিতাগুলিতে তাঁহার জীবনের দুর্ঘটনাগুলির একটি করুণ সুর পাওয়া যায়।

আর একটি ঘটনা—শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবীর লৌকিক জীবনের শেষ আশার দীপটি নিভাইয়া দিয়াছিল। বিধবা নারীর একমাত্র অবলম্বন তাঁহার সংসারের প্রধান বন্ধন, প্রিয় পুত্রটি অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া যায়।

ইহার পর হইতে নানারূপ লোকহিতকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া তিনি তাঁহার নৈরাশ্যপূর্ণ জীবনে দুঃখ ও শোককে পরাস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯১৫ সালে তিনি ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে অবৈতনিকভাবে শিক্ষাদান আরম্ভ করেন ও বহুদিন সেইরূপে তাঁহার প্রিয় ছাত্রী সম্প্রদায়কে শিক্ষাদান করিয়া অসুস্থতার জন্য সে কার্য্য ত্যাগ করেন।

শরীর কিছু ভাল হইলে শ্রীমতী সরলা দেবীর প্রতিষ্ঠিত "ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের" কার্য্যভার ৺কৃষ্ণভাবিনী দাসের মৃত্যুর পর তিনি নিজে গ্রহণ

করেন। কিছুদিন তিনি ঐ কার্য্য দক্ষতার সহিত চালাইয়া পরে শ্রীমতী সরলা দেবী পঞ্জাব হইতে বাঙ্গালায় আসিলে তাঁহাকে সে ভার ছাড়িয়া দেন। এখন তিনি 'হিরণ্ময়ী বিধবা আশ্রমের' সম্পাদিকা রূপে উহার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। তিনি Greaves rescue home এরও একজন উদ্যোগী সভ্য।

ইহাঁর লিখিত গ্রন্থসমূহের নাম :—

১। কবিতাগ্রন্থ :—রেণু, পত্রলেখা ও অংশু।

২। শিশু পাঠ্য গদ্য গ্রন্থ :—অনাথ, পঞ্চুলাল ও কথা উপকথা।

ইহার অন্যান্য পুস্তক এখন যন্ত্রস্থ।

৩। ধর্ম্মপুস্তক :—শান্তিনিকেতন (শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের বিশ্বভারতী বিদ্যালয়) সিরিজের "ভক্তবাণী" ৩য় ভাগ।

ইহাই হইতেছে কবির জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। একজন সমালোচক 'রেণু' সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—

"রেণু" একখানি—In Memoriam বলিলে কবির প্রতি অবিচার করা হয় কিনা জানিনা, তবে নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে নিশ্চয়ই দুইখানির মধ্যে একটি সুমধুর সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে। দু'খানির উদ্দেশ্যই এক। যে ব্যথার অসহ্য তীব্রতায় হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলি প্রায় ছিঁড়িয়া যায়, যে ব্যথায় পরিদৃশ্যমান্ বাহিরের কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ রুদ্ধ অন্তরের দ্বার আপনাআপনি খুলিয়া যায়, "রেণু" সেই ব্যথারই গান। যে ব্যথায় দৃশ্য ও অদৃশ্য এক হইয়া যায়, স্বর্গকে মর্ত্তের কাছাকাছি আনিয়া দেয় ; "রেণু" সেই দিব্য ব্যথার, অমর শোকের গান।

"রেণুর" কবিতাগুলির বিশেষত্ব তাহার ক্ষুদ্রত্ব। কবিতাগুলি সুন্দরীর অশ্রু-বিন্দুর মত করুণ, বালকের হাসিবিম্বের মত মধুর, বিধবার আশীর্ব্বাদভরা দৃষ্টির মত স্নিগ্ধ। ছোট হইলেও, তাই সেগুলি হৃদয় স্পর্শ

করিয়া যায়। সেই সহজ সুরের ঝঙ্কারের মত, ভোরের অসমাপ্ত স্বপ্নের মত, কবিতাগুলির মধুর রেখা হৃদয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে। যেন একটু অসমাপ্তি, যেন একটু সুদূর অতৃপ্তি, যেন একটু নিষ্ফল ব্যাকুলতা কবিতাগুলির প্রাণ।

"রেণু" পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গীতি-সমষ্টি হইলেও, সুন্দর মালিকার মত, একটি সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারা সুনিপুণভাবে গ্রথিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রচ্ছন্ন একটি কথা হাজার সুরের বিচিত্র ছন্দ-লীলার অন্তরাল দিয়া হিল্লোলিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম শরতে জল-স্থল আকাশে, লতাপাতায়, মুকুলে, পুষ্পপল্লবে, নবোদ্ভিন্ন শস্য শীর্ষে, বর্ষা-ধৌত দুর্ব্বাক্ষেত্রে যেন একই বৃহৎ আনন্দের সুর হাজার রাগিণীতে ধ্বনিত হইতে থাকে,—গীত, গন্ধ, বর্ণ, শোভায় যেমন একই পুলক তরঙ্গ নানান্ ছন্দে ছড়াইয়া পড়ে, রেণুর ছোট ছোট কবিতাগুলির মধ্যে তেমনি যেন একটি কথারই সুর বাজিয়া উঠিয়াছে! বিশেষত্ব ও নৈপুণ্য এই,—কোথাও লঘু চপলতা নাই—কোথাও সঙ্কোচ, কোথাও স্খলন বা অসংযম নাই।

পূত সংযম এবং তপস্যার ভাব সমস্ত গানগুলিতে কেমন একটি মহিমা, অনাড়ম্বর ঐশ্বর্য্য, কোমল মাধুর্য্য আনিয়া দিয়াছে—অথচ লেখিকার কল্পনা দূরতম অন্তরীক্ষের প্রতি একেবারে উধাও হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। * * ধূলা মাটির যা-কিছু, দু'দিনের যা-কিছু, সাধারণ ও প্রতিদিনের যা-কিছু কবি সেগুলিকে এমনি একটি দিক আনন্দের বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, সেগুলির মধ্যে স্বর্গের আভাষ ফুটিয়া উঠিয়াছে! হাসি, অশ্রু, ব্যাকুলতা, বিরহ-ব্যথা, প্রেমের বেদনা, অতি পুরাতন এই ক'টি ইষ্টক প্রস্তরে, কবি চির-সুন্দর মন্দির গাঁথিয়া তাঁহার দেবতাকে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সেই মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া পাশের যাত্রিগণ তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত নিভৃত হৃদয়-দেবতার বন্দনাগানের মধুর ঝঙ্কার শ্রবণে

পুলকিত হইয়া যেন তাঁহারি কণ্ঠের সহিত সুর মিলাইয়া গাহিতে ব্যাকুল হইয়া উঠে।

মোটের উপর অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়, 'রেণু' বঙ্গভাষার একখানি উচ্চশ্রেণীর কবিতাগ্রন্থ। বিচ্ছিন্ন ভাবে না দেখিয়া সমগ্রভাবে পাঠ করিলে গ্রন্থখানির মাধুর্য্য ও মূল্য সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবে।*

প্রিয়ম্বদার কবিতাগুলি Subjective বা Lyric শ্রেণীর। অধিকাংশই ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা লইয়া বিরচিত। এক কথায়— "The poet is principally occupied with himself." উৎসর্গে কবি বলিতেছেন :—

"বৈকুণ্ঠে দেবের বাস, স্মরিয়া তাঁহারে,
ভক্ত দিয়ে যায় পূজা এই পৃথ্বীপরে ;
গঙ্গা তীরে, তীর্থ স্থানে, মন্দির দুয়ারে,
আনন্দে পূরিত প্রাণ, নমি ভক্তি ভরে।"

*　　　　*　　　　*

"তুমি আজ বহুদূরে, দুর্লভ দর্শন !
তবু তুমি একমাত্র উপাস্য আমার,
এই স্নেহ এই প্রীতি ধেয়ান ধারণ
এই গীতগুলি মোর সেই উপহার।"

রেণুর প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে একটু সুর ধ্বনিত হইতেছে। চিরবিরহ-বেদনা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"মেঘ নামিয়াছে আজ ঘেরি চারিপাশ,
নব স্নিগ্ধ অন্ধকার, সজল বাতাস
ধরণীর আর্দ্রবক্ষে নিবিড় পরশে
রোমাঞ্চ জাগায়ে তুলি উদাস হরষে

---

* ভারতী—বৈশাখ, ১৩১৭।

ছোটে গর্ব্বভরে ; বজ্র ডাকে বারে বারে
প্রদীপ্ত অনল শিখা বিদ্যুৎ প্রিয়ারে
আপন বক্ষের মাঝে, শ্যাম তরুগুলি
সুঠাম বঙ্কিম বাহু উর্দ্ধ পানে তুলি
আরও চুম্বন-পুষ্প দেখায় কাহারে !

পূর্ণা তরঙ্গিণী ধায় দূর পারাবারে
মিলন ব্যাকুল ; রুদ্ধ ঘরে একা বসি
অশ্রু আঁখি, প্রাণে জাগে তব মুখ-শশী !
তবু একবার এস নয়ন সম্মুখে
বাহু-বন্ধে তনুখানি গাঁথি লহ বুকে !"

এই প্রাণের বেদনা বিরহে ও অতৃপ্তিতে পরিস্ফুট—একই বেদনা একই ভাবের অভিব্যক্তি নানা কবিতায় প্রকাশিত। কখনও বলিতেছেন—

"আমার সকল আলো অঞ্জলি ভরিয়া,
প্রিয় সে, আপন ঘরে রেখেছে হরিয়া !
দিন পরে দিন যায়, মাস পরে মাস,
এ চির জীবনে তাঁই আঁধার আকাশ !

গিয়াছে বিদায় নিয়ে জানিবে না আর,
আজিও স্নেহের ভুলে হৃদয় আমার
সে কথা মানে না তবু ; তাই ঘুরে ফিরে
কভু হাসি মুখে, কভু নয়নের নীরে
রচি গান, গাঁথি মালা, আশা করে মনে
সকলি জানিছ তুমি না জানি কেমনে !"

'অংশুর' কবিতাগুলি ছোট, কিন্তু মুক্তার মত উজ্জ্বল ও সুন্দর। 'প্রেম' কবিতায় কবি বলিতেছেন—

"ওরে প্রেম, ওরে সঙ্গোপন
অগাধ সাগর জলে কোথায় আছিস ফলে,
শুক্তি মাঝে মুক্তার মতন
দরিদ্রের আশাতীত ধন !

শুভলগ্নে দুর্লভ নিমেষে,
দূরতম স্বর্গ ছাড়ি স্বাতির অমৃত বারি
অশ্রুর সমুদ্রে পড় এসে
অতুলন সৌন্দর্য্যের বেশে !

বিশ্বমাঝে ত্রিদিবের সার—
প্রাণপণ সাধনায় যে তোরে খুঁজিয়া পায়,
অতলের তল মিলে যার—
মর্ত্ত্য জন্ম সার্থক তাহার।"

কিন্তু কয়জন এই অতুলন প্রেমরত্নের অধিকারী হইতে পারে ?

প্রিয়ম্বদার কবিতা দুঃখ-বাদে পরিপূর্ণ। তিনি নিজের অন্তর বেদনা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে ব্যস্ত দেখিতে পাইতেছেন। তাই তাঁহার কাব্যের সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে—

"তীরের মতন তূর্ণ, অন্তর ছাড়িয়া
আমার সকল চিন্তা গিয়াছে উড়িয়া
তোমারি সন্ধানে, হায় ফিরিবে না আর
শূন্য বক্ষ-তুণ পূর্ণ করিয়া আবার !"

মানুষ শোক-দুঃখের ভিতর দিয়াই নির্ভরশীল হয়। যখন তাঁহার আর কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোন পথ থাকে না, তখন সে আপনা হইতেই সেই বিরাট অজ্ঞাত শক্তির পরিচয় অন্তরে অন্তরে অনুভব করে, তখন সে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে—

"তুমি যে সুন্দর তাহা দেখিনু নয়নে
নয়ন-ভুলান এই তোমার ভুবনে ;
তুমি যে অসীম তাও জেনেছি হৃদয়ে
আপনার হৃদয়ের প্রেমের বিস্ময়ে ;
করুণাসাগর হয়ে তবু ন্যায়বান
বুঝিলাম দেখি তব, এ বিশ্ব মহান,
উচ্চ নীচ, ভালমন্দ যেথা নির্ব্বিচার
ভুঞ্জে অবারিত দান আলোক আঁধার,
জল, বায়ু, পুষ্প, ফল, তব বনচ্ছায়া
নীলকান্ত আকাশের সীমাহীন মায়া,
জরা মরণের চির অমোঘ বিধান
সম্রাট্ দরিদ্র পরে নিয়ত সমান।"

এই বিশ্বাসই মানবকে পৃথিবীতে শান্তি-সুধা দান করিয়া নির্ভরশীল এবং শক্তিমান্ করিয়া তোলে।

শ্রীযুক্তা সরলাদেবী চৌধুরাণী বি, এ,

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার সুবিখ্যাত যোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে সরলাদেবীর জন্ম হয়। ইঁহার মাতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙ্গালার একজন খ্যাতিমান্ ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষ—ব্রাহ্মসমাজ স্থাপয়িতাদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ উদ্যোক্তা ও মনীষী ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ইঁহার মাতুল। সরলাদেবীর জননী পূজনীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম উপন্যাস-রচয়িত্রী এবং মাসিক পত্র সম্পাদিকা।

অতীত যুগের প্রতিভাশালিনী মহিলাদের ন্যায় সরলাদেবীর প্রতিভা অনন্যসাধারণ। একদিকে যেমন তিনি মাতামহ-কুল হইতে ললিতকলা বিষয়িণী বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের অধিকারিণী হইয়াছেন, তেমনি আবার পিতৃকুল হইতে সাহস, তেজস্বিতা এবং আত্মশক্তিতে নির্ভরশীলা হইয়া পুরুষোচিত ভাবে স্বীয় চরিত্রকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। পিতা স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল নদীয়া জেলার এক সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ জমিদার বংশোদ্ভব। এই পরিবারের পুরুষেরা এক সময়ে লাঠি, বর্শা লইয়া দস্যু ও ডাকাতের আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। জানকীনাথ এক সময়ে সে প্রথম অবস্থায় অল্প সংখ্যক ভারত হিতৈষী মহাত্মগণের সাহায্যে মিঃ হিউমের সহিত প্রথম Indian National Congress বা জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সরলা বেথুন কলেজ হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। কেবল মাত্র ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তিনি উক্ত বালিকা-বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। সপ্তদশ বর্ষ বয়সে বি-এ, উপাধি লাভ করেন। ইহা তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সাহিত্য-

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী বি-এ

প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র দশ বৎসর বয়সে সেকালের 'সখা' পত্রিকার কর্তৃপক্ষঘোষিত একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ লিখিয়া পুরস্কার লাভ করেন। সেই প্রবন্ধ ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের "সখা" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার যখন ১২ বৎসর বয়স সে সময় "বালক" পত্রে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আত্মীয়-স্বজনেরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন।

সংস্কৃত নাটক সম্বন্ধে কতকগুলি আলোচনা করিয়া তিনি বিদ্বৎ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার বয়স যখন কেবলমাত্র ঊনিশ বৎসর তখন 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক এবং অন্যান্য কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের যে গবেষণাপূর্ণ সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পড়িয়া বঙ্কিমচন্দ্র এতদূর প্রীতিলাভ করেন যে লেখিকাকে ধন্যবাদ দিয়া এক পত্র লেখেন এবং আপনার রচিত গ্রন্থাবলী উপহার প্রদান করেন।

সঙ্গীতবিদ্যায় সরলাদেবীর পারদর্শিতা সর্ব্বজনবিদিত। কি ইউরোপীয় সঙ্গীত, কি দেশীয় সঙ্গীত—কি যন্ত্রবাদনে সর্ব্ববিষয়েই তাঁহার দক্ষতা অনন্যসাধারণ। পিয়ানো, বীণা, বেহালা ইত্যাদি দেশী-বিদেশী বহু যন্ত্রবাদনে তিনি সিদ্ধহস্ত। সরলা যখন বার বৎসরের বালিকা তখন হইতেই সঙ্গীত রচনায় এবং সুর-সংযোজনে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। তিনি তাঁহার মধুর স্বর-লহরী এবং একমাত্র সঙ্গীত-নৈপুণ্য দ্বারাই ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করিতে পারিতেন, এইরূপ অসাধারণ প্রতিভা তাঁহার আছে। সাধারণ নারী-জীবন হইতে তাঁহার জীবনের গতি স্বতন্ত্র পথে পরিচালিত হইবে তাঁহাদের পরিবারের অনেকেই এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। স্বর্গীয় জানকীনাথ ঘোষাল ও শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী তৎকালে মাদার ব্লাভাষ্টস্কির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান

সম্পর্কিত বিষয়ে সরলার জীবন উৎসৃষ্ট করিবার কল্পনাও এক সময়ে তাঁহাদের মনে হইয়াছিল। সরলার বিবাহের জন্য তাঁহারা তেমন ব্যস্ততা প্রকাশ করেন নাই, যদিও অতি অল্প বয়সেই হিরণ্ময়ী দেবীর বিবাহ হইয়াছিল। সরলার ভ্রাতা জ্যোৎস্না ঘোষাল বিলাতে যখন সিভিল সার্ভিশ পরীক্ষা দিতে গমন করেন, (এক্ষণে জ্যোৎস্না ঘোষাল কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত আছেন) সরলাও তখন শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিলাত যাইবার সঙ্কল্প করেন। এ সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া পরিবারস্থ সকলেই চমৎকৃত হইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অভিমত চাওয়া হইলে মহর্ষি এক অদ্ভুত প্রস্তাব করিলেন—বলিলেন—"সরলার একখানি তরোবারিকে বিবাহ করিতে হইবে এবং প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, সে কোনও পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাতও করিতে পারিবে না তাহা হইলে পৃথিবীর যে কোন স্থানে সে যাইতে পারে তাহাতে তাঁহার কোনও আপত্তির কারণ নাই।" সৌভাগ্য-বশতঃ তরবারির সহিত এই অদ্ভুত বিবাহ আর হয় নাই। এ সময়ে বিদেশে যাইতে তাঁহার আর কোন বাধা রহিল না। অতঃপর তিনি মহীশূর মহারাণী বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী লেডি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া তথায় গমন করেন। এক বৎসর সেখানে কাজ করিবার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন এবং "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার ব্রত হইল বাঙ্গালী তরুণদের প্রাণে সাহস ও উদ্দীপনা জাগরিত করা। প্রাচীন ভারতের বীরত্বের আদর্শে তিনি বীরাষ্টমির প্রচলন করিলেন—তরুণদিগের মধ্যে লাঠি খেলা, অসি খেলা, মুষ্টি যুদ্ধ ইত্যাদি বীরত্বসূচক ক্রীড়ার সৃষ্টি করিলেন। বাঙ্গালীর অতীত যুগের এবং ভারতের অতীত যুগের বীরগণের জন্মোৎসব করিতে আরম্ভ করিলেন। এ সময়েই প্রতাপাদিত্য-উৎসব ইত্যাদি সম্পাদিত হইয়াছিল।

এ-সময়ে সরলা দেবীর বয়স অতি অল্প—ত্রিশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার এ সকল কার্য্যের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, কেহ বা প্রশংসা করিয়াছেন, কেহ বা নিন্দা করিয়াছেন। নিন্দা ও প্রশংসা গ্রাহ্য না করিয়া ইনি আপনার কর্ত্তব্য-পথে চলিয়াছেন এবং বাঙ্গালী যুবকের বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য যখন দেশবাসীর প্রাণে নবীন উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় তখন দেশী কাপড়, দেশী দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদির জন্য ইনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের কথা অনেকেই অবগত আছেন।

কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কিছুদিন সরলাদেবী ফরাসী ভাষা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন এবং মূল পারস্য হইতে ওমর খৈয়ামের 'রুবায়তের' অনুবাদ করিয়াছিলেন। কলিকাতার সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান—ইনিই প্রথম স্থাপন করেন। সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের অনেক তরুণ ও তরুণী আসিয়া গীতবাদ্য শিক্ষা করিতেন। এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রদত্ত কয়েকটি কনসার্ট এক সময়ে কলিকাতায় অসাধারণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল।

প্রথম জীবনে বাঙ্গালী তরুণ সম্প্রদায়ের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র বাছিয়া লইলেও বৃহত্তর ভারতই ছিল তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের আদর্শ। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য যে বৃহত্তর ভারতের কল্যাণ কল্পে একান্ত আবশ্যক তদুদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা আলবার্ট হলে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। জাতীয় মহাসমিতির কর্ম্ম-প্রণালীর মধ্যে Congress Republic নাম দিয়া তিনি সাম্য তন্ত্রের প্রতিপোষক এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সে প্রায় ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এইরূপ প্রস্তাব ও আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সরলা দেবীর সহিত

পাঞ্জাবের পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীর বিবাহ হয়—এই বিবাহে কর্ম্মক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত হইল। পাঞ্জাব ও বাঙ্গালার মধ্যে একটা মিলনের পথ উন্মুক্ত হইল।

এ বিবাহের পর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র সমগ্র বোম্বাই প্রদেশ ও উত্তর ভারতে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছিল। পণ্ডিত রামভুজ দত্ত আর্য্য সমাজী ছিলেন, কাজেই যেখানে যেখানে আর্য্য সমাজ ছিল সেখানে সেখানে অগণিত দর্শকমণ্ডলীর কাছে তাঁহার বক্তৃতা প্রদান করিতে হইয়াছে। এ সময়ে 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল' প্রতিষ্ঠা করিয়া নারী-জাতির মধ্যে একটা শুভ জাগরণের দীপ্তি জাগরিত করেন। এক লাহোর সহরের পঞ্চাশটি অলি গলিতে পঞ্চাশটি শাখা সংস্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতাও এই এই 'ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডলের' কার্য্য অল্প সময়ের মধ্যেই বিস্তৃতি লাভ করে।

সরলা দেবী প্রত্যেকটী অনুষ্ঠানে স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছিলেন। পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরী যখন উর্দ্দু সাপ্তাহিক "হিন্দুস্থানের" সম্পাদনভার আরম্ভ করেন, তখন লাহোর চিফ্‌কোর্ট হইতে রাজনৈতিক উদ্দেশে পণ্ডিতজীর উপর এইরূপ আদেশ প্রচারিত হয় যে, যদি তিনি উক্ত কাগজের সম্পাদকতা করেন তাহা হইলে তাঁহাকে আইন ব্যবসায় করিতে দেওয়া হইবে না। এসময়ে সরলা দেবী অত্যন্ত যোগ্যতার সহিত 'হিন্দুস্থানের' সম্পাদকতা করেন এবং এক সঙ্গে উহার একটি ইংরাজী সংস্করণও প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহার লিখিত 'হিন্দুস্থান পত্রিকায় প্রকাশিত অনেক কথা—বর্ত্তমান মন্ত্রী Ram-say Macdonald তৎপ্রণীত Awakening of India নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এইরূপ নানারূপ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সরলা দেবী পাঞ্জাব এবং বোম্বাই প্রদেশে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। রাজনৈতিক বিবিধ

অশান্তির মধ্যে যখন তাঁহার স্বামীকে পড়িতে হইয়াছে তখন অসাধারণ সাহসিকতার সহিত তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর সহিত ইঁহার পরিচয় হয়, সে সময়ে মহাত্মা লাহোরে ইঁহাদের বাড়ীতে অতিথি রূপে ছিলেন। সেই সময়ে অসহযোগ-নীতি অবলম্বন করিয়া খদ্দরের শাড়ী পরিহিতা সরলা দেবী জনগণের প্রাণে অসামান্য সাহস ও উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

সরলা যৌবনে স্বামী বিবেকানন্দের বৈরাগ্যপূর্ণ উপদেশ বাণীতে অন্তর মধ্যে ত্যাগ ও সাধনার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রটিকেই অতি গোপন রাখিয়াছিলেন। একবার কঠিন রোগ-শয্যায় পড়িয়া তাঁহার কাছে আবার সেই ত্যাগের সুমহান আহ্বান বাণী উদ্দীপিত হইয়া উঠে। তখন তিনি স্বামীর অনুমতি ক্রমে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া হৃষীকেশ গমন করেন এবং গঙ্গার তীরে একটি আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন—কিন্তু হঠাৎ স্বামীর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার সেই সাধন-পীঠ ত্যাগ করিয়া আসিতে হইয়াছে। পাঞ্জাবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ একবারে বিচ্যুত হইতে চলিয়াছে।

সরলা দেবীর জীবন কর্ম্মময় জীবন। ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া উহা পরিচালিত হইবার নহে। দেশের কল্যানে প্রতিনিয়ত তাঁহাকে নানা কার্য্যের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতের সামাজিক মহাসমিতির অধিবেশনে তিনি সভানেত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। বীরভূম ও লক্ষ্ণৌ সহরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভানেত্রী হইয়াছিলেন। এই ভাবে ভারতের নানা স্থানের নানা সভা সমিতিতে তাঁহাকে নেতৃত্ব করিতে হইয়াছে। সমগ্র ভারতের জাতিগত মহামিলন সাধন তাঁহার জীবনের স্বপ্ন। এই অসাধারণ প্রতিভাশালিনী মহিলার সাহিত্য-প্রতিভার পরিচয় এইবার আমরা প্রদান করিব।

সরলা দেবীর গদ্য ও পদ্য রচনার সংখ্যা বড় কম নহে। মাসিক পত্রে প্রকাশিত বিক্ষিপ্ত কবিতাসমূহ সংগৃহীত হইলে একখানা উৎকৃষ্ট কবিতা গ্রন্থ হইতে পারে। তাঁহার লিখিত—"আহিতাগ্নিক" শীর্ষক কবিতাটি এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আমরা এখানে তাঁহার রচিত দুই একটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম। উহা হইতেই তাঁহার সঙ্গীত রচনার এবং কবি-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"প্রভুর দান" কবিতাটিতে কবির নির্ভরের তৃপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে। কবি বলিতেছেন—

"প্রভুর দান রে, প্রভুর দান!
আমার প্রভুর দান!
গরল তাই যে অমৃত রসে
তিতিল মনঃ প্রাণ!
মগন হইয়ে গেলেম তাহে
আনন্দের অতল,
বিষের জ্বালা পুড়িয়ে হল
সুধাস্নিগ্ধ শীতল!
প্রেমের পরশমণির ছোঁয়ায়
উলোট-পালট ধরা!
কাঁটার মাঝে ফুলের বিকাশ,
ফুলের সুবাস ভরা!
অন্ধ নয়নে আলোক এল,
দৃষ্টি গেল খুলে!
প্রভুর দানে জীবন আমার
ভরিল কূলে কূলে!"

১৩০৭ সনে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি এক শতটি গানের স্বরলিপি সঙ্কলন করিয়া প্রকাশিত করেন এবং তাহার নাম দিয়াছিলেন—"শতগান"। আধুনিক গানের উহাই প্রথম স্বরলিপি পুস্তক। উহাতে সরলার নিজের রচিত কয়েকটি অতি উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত আছে—তাহা সর্ব্বজন পরিচিত এবং বহু কণ্ঠে গীত। যথা—'প্রীতি তুমি হে অন্তরে' 'হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও' 'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণি!' 'বন্দি তোমায় ভারত জননী' প্রভৃতি সর্ব্বজন প্রিয় সঙ্গীত। কি কবিত্বে কি সুর মাধুর্য্যে কি ভাবসম্পদে এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। জাতীয় সঙ্গীত রচনায় সরলা দেবী অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—নিম্নোদ্ধৃত "জয় যুগ আলোকময়" সঙ্গীতটি হইতে পাঠকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এই সঙ্গীতের ভিতর যে প্রাণময় শক্তি নিহিত আছে তাহা সত্য সত্যই অপূর্ব্ব। শত শত কণ্ঠে এই সঙ্গীত গীত হইলে প্রাণের মধ্যে নবীন প্রেরণা ও উদ্দীপনা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

"জয় যুগ আলোকময়,
হল অন্যায়, চ্যুত শাসন
নিষ্ঠুরাচার নাশন
সংস্কার দৃঢ় আসন
হল ক্ষয়,
দিলে বরাভয়
যুগ আলোকময়,
আজি তেজ ভরিত ভারত বক্ষ
নির্ম্মল বোধ পুষ্টপক্ষ,
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ
গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ আলোকময়।
আলে—আলো—আলোকময়।

হল অজ্ঞানোতমো ছেদন
ভ্রান্তির জাল ভেদন
আত্মার শত ক্লেদন
অপনয়,
দিলে বরাভয়,
যুগ আলোকময়।
আজি তেজ ভরিত ভারত বক্ষ,
নির্ম্মলবোধ পুষ্ট পক্ষ
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ
গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ, আলোকময়,
আলো—আলো—আলোকময়।

হল বুদ্ধির মোহ মোচন
যুক্তি অতি রোচন
উন্মেলি শুভ লোচন
হে সদয়,
দিলে বরাভয়
যুগ আলোকময়,
আজি তেজ ভরিত ভারত বক্ষ
নির্ম্মল বোধ পুষ্ট পক্ষ
মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ
গাহে জয়।
জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ, আলোকময়,
আলো—আলো আলোকময়।

হল শক্তির পুন বোধন
পৌরুষ ঋণ শোধন
আর্ত্তের প্রাণ মোদন

বীরোদয়,

দিলে বরাভয়.

যুগ আলোকময়

আজি তেজ ভরিত ভারত বক্ষ

নির্ম্মল বোধ পুষ্ট পক্ষ

মুক্ত মানব লক্ষ লক্ষ

গাহে জয়।

জয় যুগ, জয় যুগ, জয় যুগ, আলোকময়।

আলো—আলো—আলোকময়।”

এখানে—‘হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও’ সঙ্গীতটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম, উহা হইতে তাঁহার শব্দ সম্পদ ও রচনা মাধুর্য্যের পরিচয় পাইবেন।

“হে সুন্দর বসন্ত বারেক ফিরাও

আজি মধুর অতীত কাল!

অতীত উৎসব আন এ ভারতে,

আনহে, আনহে

মধুমাসে আজি মধুর ইন্দ্রজাল!

কোকিল কূজন মুখরিত উপবন

মাঝে, আনহে,

মঞ্জুল চরণ বিতাড়ন, মঞ্জু অশোক লাল!

চম্পক পেলব, চূতমুকুল নব,

আনহে, আনহে,

পূর্ণ দোহদ—বকুল পুষ্পজাল!”

*   *   *

“যূথীসুবাসিত উত্তরী পীত

সাথে আনহে,

বীণাবাদিত ললিত গীত তাল!
প্রিয় আলেখন, পুষ্প বিবরণ
আনহে, আনহে,
কাল—পুরাতন নিখিল মোহজাল!”

সরলাদেবী “ভারতী” সম্পাদনে, সঙ্গীত-রচনায় এবং স্বদেশসেবায় দেশমধ্যে যে নূতন আদর্শ-পথ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাহাই তাঁহাকে বরণীয় এবং স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেন

‘প্রতিধ্বনি,’ নির্ঝরিণী, ‘মনোবীণা’ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেত্রী শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেন—প্রায় ছয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কাব্য গ্রন্থাবলী লইয়া বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহার রচিত প্রথম কবিতা-গ্রন্থ ‘প্রতিধ্বনি’ ১৩০১ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘নির্ঝরিণী’ ১৩০২ সনে প্রকাশিত হয় এবং চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ ‘মনোবীণা’ ১৩০৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃণালিনী ৺লাড্‌লি মোহন ঘোষের কন্যা। অতি শৈশবে ইহাঁর সহিত পাইকপাড়ার সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের পরিণয় হয়। বিবাহের অল্প কাল পরেই তাঁহার পতি-বিয়োগ হয়। পতির শোক-বেদনায় কাতর হৃদয়ে তিনি কাব্য সাহিত্যের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তাহারি ফল স্বরূপ ‘নির্ঝরিণী,’ ‘প্রতিধ্বনি’, মনোবীণা’ প্রভৃতি কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর বিধবার কঠোর নিরাশাপূর্ণ জীবন

শ্রীযুক্তা মৃণালিনী সেন

অতিবাহিত করিবার পর তিনি স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুত নির্ম্মলচন্দ্র সেনের সহিত পরিণীতা হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান বিবাহিত জীবন সুখের হইয়াছে। মৃণালিনী বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বের ন্যায় সাহিত্যানুশীলন করেন না।

'প্রতিধ্বনি'—১নং হেরিংটন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত। কলিকাতা ১৩।৭ বৃন্দাবন বসুর লেন, সাহিত্য যন্ত্রে শ্রীযজ্ঞেশ্বর ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত। (১৩০১)। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে এই কবিতাগ্রন্থখানা প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখিকার ১২ বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত যে সকল কবিতা বিরচিত হইয়াছিল এই গ্রন্থ মধ্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। 'প্রতিধ্বনি' লেখিকার প্রথম উদ্যম।

'প্রতিধ্বনি' খণ্ড কবিতার সমষ্টি। ইহার অধিকাংশ কবিতাই দুঃখবাদে পূর্ণ। প্রথম জীবনে, যৌবনের প্রারম্ভ কালে কবি যে শোক বেদনা পাইয়াছেন, আপনার প্রিয়তমকে হারাইয়াছেন প্রত্যেকটি কবিতায় তাহারই অভিব্যক্তি।

'নির্ঝরিণী'তেও সেই সুর প্রকাশিত। 'নির্ঝরিনী' ১৩০২ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। নির্ঝরিণীতে কয়েকটী বিখ্যাত ইংরাজী কবিতার অনুবাদ আছে। 'মনোবীণা'য়ও সেই সুরই ধ্বনিত। নানা বিভিন্ন বিষয়ের কবিতা ইহাতে আছে। কবিতার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য বা গভীর চিন্তা বা দূর দৃষ্টির ভাব নাই। অনুবাদ কয়টী বেশ সুন্দর। 'মনোবীণার' কবিতাবলীতে কবির ভাব চিন্তা, শব্দসম্পদ এবং ছন্দ নৈপুণ্যের অনেকটা পরিণতি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে মৃণালিনীর 'নূতনরাগিনী' শীর্ষক কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতেই পাঠকগণ তাঁহার কবিতাবধূর মর্ম্ম কথার আভাষ পাইবেন।

"শুধুই গাহিতে গান যদি গো ! জনম মম,
তবে দেবি ! গানে মোরে দাও সেই সুর,
যে সুরে মৃতেরো প্রাণে অমৃত লহরী বহে,
যে সুরে জড়েরো করে অবসাদ দূর !
মরুতে জনমে তরু, পাষাণেতে বহে নদী,
অঙ্গার সে হ'য়ে যায় সহসা হীরক !
যে তীব্র উন্মত্ত সুর তড়িৎ সঞ্চারি দেয়
হৃদয় হইতে হৃদে, ফেলিতে পলক।
এমন করিয়া শুধু গতানুগতের মত
কেবলি জ্যোছনা, পুষ্প, কল্পনা বধূর
সহিত করিয়া খেলা, জীবন স্বপ্নের মত
করিতে চাহিনা আর সমাপ্ত মধুর।
আমি অগ্রসর হ'ব সত্যের ধরিয়া হাত,
সূর্য্যের রশ্মির মত কিরণ যাহার ?
নিখিল বিশ্বের সর্ব্ব স্বচ্ছ মুকুরের সম,
সবাই হেরিবে তাহে চিত্র আপনার।
ক্ষুদ্র যশ অপযশ থাকে ক্ষুদ্র গৃহ-কোণে ;
—এ সঙ্কীর্ণ সীমা মম দাও বাড়াইয়া ;
কেবল আমারি তরে রেখো না অস্তিত্ব মম,
—আমারে অনন্ত মাঝে দাও হারাইয়া।
ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মম দাও এক করি দেবি !
দাও যোগ করি দেবি ! হৃদয়ের তার,
ওই ক্ষুদ্র তৃণ গাছি, ওরো সুখ, ওরো দুখ,
—অনুভব করি যেন আত্মায় আমার !"

এই যে মহাপ্রাণতার ভাব, বিশ্বজনীন উদার প্রেম ও অনুভূতি মনোবীণার অনেক কবিতার মধুর ঝঙ্কারে তাহাই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়া মৃণালিনীর কবিতাসুন্দরীকে মধুময়ী করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীযুক্তা নিস্তারিনী দেবী

শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী দেবী 'মনোজবা' রচয়িত্রী। এই কবিতা গ্রন্থখানি ১৩১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রপ্রসাদ সান্ন্যাল এম, এ কর্ত্তৃক গোরক্ষপুর হইতে ইহা প্রকাশিত এবং কলিকাতা ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল। লেখিকা নিস্তারিণী দেবী, প্রবাসী বঙ্গ মহিলা। ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস ছিল রাজসাহীর পুঁটিয়া গ্রাম। নিস্তারিণীর পিতৃদেব স্বর্গীয় কেশবদেব সান্ন্যাল পশ্চিমাঞ্চলে একজন শিক্ষিত (Cultured) ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বঙ্গভাষা শিক্ষার বিবিধ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কন্যাকে যত্নের সহিত বিদ্যাশিক্ষা দিয়াছিলেন, 'বামাবোধিনী' সম্পাদক ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে 'মনোজবা' প্রকাশিত হয়। এক সময়ে এই কবিতা পুস্তকখানি বঙ্গীয় সাহিত্যসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল এবং অনেকে ইহার সমালোচনাও করিয়াছিলেন।

এই কবিতার বইখানি পড়িতে বসিলে সকলের আগে কবির পিতৃ-ভক্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। পিতৃ শোকাতুরা তনয়ার শোক-নিবেদন অনেক কবিতার মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরপ্রেম, মাতৃপ্রেম, ভ্রাতৃপ্রেম, সখিপ্রেম, স্বদেশপ্রেম প্রভৃতির পরিচয়

'মনোজবায়' দেখিতে পাওয়া যায়। ঈশ্বর প্রেমে ব্যাকুল কবি 'তুমি কেন এত দূরে' কবিতায় বলিতেছেন—

"মঙ্গল আলয় নিত্য নিরাময়,
সদা খুঁজে মরি বাহিরে অন্তরে,
থাক সাথে সাথে দেখা নাহি দেও
এ কেমন দয়া কাঁদাতে কাতরে ?
হও হে নিকট, থেকোনা দূরে।"

প্রত্যেক মহিলা কবির কবিতার মধ্যে যে একটা বিষণ্ণ সুর দেখিতে পাওয়া যায়, নিস্তারিণীর কবিতায়ও একটা অতৃপ্তি ও বিপন্নতার ভাব পরিস্ফুট। এই যে Sweet melancholyর ভাবটা ইহা মহিলা কবিদের অন্তরে প্রবলভাবে বিদ্যমান্। আমাদের কাছে কবির 'মধুময়' কবিতাটি সত্যসত্যই মধুর লাগিয়াছে। আমরা এখানে এই কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কিবা মধুময় হেরি আধ মুকুলিত ফুলে।
শিশির কি মধুময় চারু নব ঊষাকালে॥
মধুময় হয় শশী শারদীয় নভঃস্থলে ;
ধরিত্রী মাধুর্য্যে ভরা বসন্ত উদয় হলে॥
প্রভাতে মধুর ধ্বনি বিহগিনী কল রোলে।
প্রাবৃট্ মধুর রূপী বিজলী বারিদ-কোলে॥
নিশীথে বাঁশরী স্বর হৃদি নাচে তালে তালে।
শিশুর অস্ফুট রব পরাণে অমিয়া ঢালে॥
নবীন মিলন কালে, প্রেমে মধুরিমা ঝলে ;
সোহাগিনী মধুমাখা করুণ নয়ন ভালে॥
রূপ রাশি মধুময় পবিত্রতা মাখা হলে।
মধুর আধার হৃদি বিনয়ে সারল্য মিলে॥
স্বরগ মাধুরী ফুটে, পর দুঃখে প্রাণ গলে।
অনুপম অতুলন দুই ফোঁটা অশ্রু ভালে॥"

তারপর কবি তাঁহার কবিতার পুরাতনকে চির নূতন আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া সকলকে বলিতেছেন—

"পালিতে বিশ্বের ব্রত,
হও সবে দৃঢ় ব্রত,
আপনা হয়ে বিস্মৃত, হয়ে স্বার্থহীন প্রাণ।
চেয়োনাক প্রতিদান,
নিঃস্বার্থ করগো দান
কাঙ্গালী সে তবু ভাল, আকাঙ্ক্ষার নাহি ত্রাণ।"

রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী

ত্রিপুরা-রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের প্রথমা কন্যা। অনঙ্গমোহিনী অতি শৈশব কাল হইতে কবিতার অনুশীলন করিতেন। সে সময়ে কবিতা লিখিয়া ইনি পিতা মহারাজের সাক্ষাতে দিতেন এবং গুণগ্রাহী মহারাজা কন্যাকে কবিতা রচনায় বিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতেন। এই ভাবে পিতার উৎসাহদানে অনঙ্গমোহিনীর কবিত্ব শক্তি দিন দিন বিকশিত হইতে থাকে। ইহার প্রথম রচিত কবিতা গ্রন্থের নাম 'কণিকা'। কণিকা ১৭ই পৌষ ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। কণিকাই অনঙ্গমোহিনীর প্রথম কবিতাগ্রন্থ। কবি কণিকার উপহারে লিখিয়াছেন—

"এ নহে কবির গাথা, কবিতা-কুসুম-মালা,
সুবাসিত চির-মধুময়,
এ কেবল শুষ্ক ফুল, বিহীন সুবাস মধু,
মলিন বিশীর্ণ দলচয়।"

এইরূপ বিনয় প্রকাশ করিলেও এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দুই একটি কবিতার মধ্য দিয়া তাঁহার কবিত্ব প্রতিভা বিকশিত হইয়াছিল। 'বসন্ত উষার' কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম, ইহা হইতে লেখিকার ভাষার সরলতা এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশের ক্ষমতা কেমন সুন্দর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা দেখিতে পাইবেন।

"বিরহ-আকুল প্রাণে চাহিয়ে সরসী পানে,
শশধর অস্তে চলে যায়,
সরসীর নীল নীরে কুমুদী মুদিয়ে পড়ে,
দুখে বায়ু করে হায়, হায়!
কামিনী তরুর শাখে বসিয়ে কোকিল ডাকে,
মুহুর্মুহু কুহু কুহু তানে,
যামিনী পোহায়ে যায় দোয়েল প্রভাতী গায়,
কুসুমিত লতার বিতানে।
পশ্চিম সাগর তীরে আঁধারে আঁধারে ধীরে,
তারাগুলি ডুবে ডুবে যায়,
বিষাদ-ব্যথিত প্রাণে ধরণী আকুল মনে,
অনিমিখ আঁখি তুলি চায়।"

কণিকার পাঁচ বৎসর পরে বাঙ্গালা ১৩১৩ সনে লেখিকার 'শোক-গাথা, প্রকাশিত হয়। শোক-গাথা কবির শোক-বেদনা পূর্ণ হৃদয়ের অভিব্যক্তি। লেখিকা নিবেদনে লিখিয়াছেন—"নিয়তির নিদারুণ নিয়মাধীনে যে মহাপ্রলয় আমার জীবনে ঘটিয়াছে, তাহারই করুণ উচ্ছ্বাস সময়ে সময়ে কবিতার আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। ** শোক-গাথা আমার জীবনের ঘোর বিষাদময় ঘটনার ও দীর্ণ হৃদয়ের নিদর্শন মাত্র। সুতরাং ইহাতে কাহারও মনোরঞ্জন হইবে বলিয়া আশা করি না।"

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় শোক-গাথার ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"এই কবিতাগ্রন্থের প্রত্যেক কবিতায় রচয়িত্রীর কবিত্ব-শক্তির সবিশেষ পরিচয় পাইবেন। এই কবিতাগুলি, রাজকুমারী অনঙ্গমোহিনী দেবী, তাঁহার স্বর্গবাসী স্বামীর চরণে উৎসর্গ করিয়াছেন; এবং তাঁহারই স্মৃতিতে গ্রন্থের সকলগুলি কবিতা রচিত।" শোক-গাথা মর্ম্মাহত হৃদয়ের শোকপূর্ণ ইতিহাস, মনের গভীর বেদনা স্বতঃ উৎসারিত—শব্দের আড়ম্বর নাই, ভাব ও ছন্দের বৈচিত্র্য নাই, আছে শুধু সরল প্রাণ-স্পর্শী বেদনার বিকাশ।

প্রথম পবিত্র আঁখিজলের সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়তমের স্মৃতিটুকু উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন—সান্ত্বনা খুঁজিয়াছেন,—পান নাই—কিন্তু চিরস্মৃতি প্রিয়তমের কথা হৃদয়ে অক্ষয় করিয়া বাঁধিয়া রাখিতেছে—বুঝিতে পারিয়াছেন—

"চিরতরে চলে গেছে হৃদয়ের রাজ,
অতল বিষাদে মোরে ডুবাইয়ে আজ!
নিয়ে গেছে সুখ সাধ সুখের বাসনা,
রেখে গেছে জন্ম শোধ হৃদয় বেদনা!
সে মম পুষ্পিত শুভ্র বসন্ত জীবন,
গেছে যবে, সাথে গেছে আমার ভুবন!
নিশীথের সুখময় জোছনা মগন,
মধ্যাহ্নের আলোময় উজ্জ্বল গগন;
প্রভাতের মৃদু মন্দ মলয় বাতাস,
ধূসর রক্তিম চারু সন্ধ্যার আকাশ;
কুসুমিত সুবাসিত নিকুঞ্জ কানন,
ভ্রমর গুঞ্জিত সদা সুখের সদন!
এ সকলি গেছে চলে তারি সাথে সাথে

এবে নিশা দেখা দেয় জীবন-প্রভাতে !
নিবে গেছে নয়নের শুভ্র দীপ্তি আলো,
প্রাণে শুধু নেমে আসে ঘোর ছায়া কালো !
গিয়েছে সকলি মম কিছু নাহি আর,
রয়েছে কেবল স্মৃতি আর অশ্রুধার !”

স্মৃতির নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি কয়টি পড়িলে অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইবে—

“জন্মশোধ বিদায়ের বিষাদ-চুম্বন,
যাতনায় ক্লিষ্ট সেই বিবর্ণ বদন !
আকুল বিষাদ ভরে হাতে হাত রাখি
চেয়েছিল, অশ্রুপূর্ণ প্রভাহীন আঁখি !
এ বিষাদ-ছবি জাগে হৃদি-দরপণে,
এ করুণ-গীতিভাসে মৃদু গুঞ্জরণে
আয়ন্তী জীবনে মম, প্রভাতে সন্ধ্যায়
শুধু সেই স্মৃতি রেখা হৃদয়েতে ভায় !
হৃদয়ের রক্ত দিয়ে করিয়ে পোষণ,
রাখিয়াছি সেই স্মৃতি করি সযতন ।”

বাহিরের বর্ষা-প্রকৃতির ব্যথিত মলিন দৃশ্য দেখিয়া কবির হৃদয়ও আজ শোক-বেদনায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। তাই তাঁহার কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে—

“আজিকে নিবিড় মেঘের আঁধারে
উষার মলিন আলোকে ভায় ;
নিরাশা-হুতাশ ঘেরিছে আমারে
ম্লান মুখে আশা চলিয়া যায় !

ডুবে যায় চাঁদ পশ্চিম গগনে
নিবু নিবু আলো মিশিয়া যায় ;
সরসীর নীল সলিল শয়নে
মূরছি কুমুদী পড়িছে হায় !”

* * * *

“আজিকে কেবলি সাধ হয় মনে
উষার কোলেতে মিশিয়া যাই,
মেঘের মেদুর বাতাসের সনে
সুদূর আকাশে ভাসিয়া যাই।
অথবা অকূল সাগরের তীরে
বসিয়া দেখিব তরঙ্গ মালা ;
সজনী গো শুধু কহিব সমীরে
আমার অসহ মরম জ্বালা।”

এইরূপ ভাবে কবির-স্বামীর স্মৃতিতে গ্রন্থের সকলগুলি কবিতা রচিত।

গ্রন্থকর্ত্রীর অন্যতম কবিতা পুস্তক—“প্রীতি” সন ১৩১৭ সালে প্রকাশিত। ত্রিপুরাব্দ—১৩২০।

‘প্রীতি’ কাব্যখানাও গীতি-কবিতার সমষ্টি। ইহাতে লেখিকার প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত! কবি এইবার ব্যক্তিগত শোক-দুঃখ বেদনার ঊর্দ্ধে চলিয়া আসিয়াছেন, আজ তাঁহার হৃদয় আপনাকে ছাড়িয়া বিশ্ব-জনীন প্রেমে উদ্ভাসিত। আজ তাই তিনি বলিতে পারিতেছেন—

“চলে গেছে সুখ ? স্বার্থের বোধনে
ফিরাইতে তারে সাধিব না।

আসিয়াছে দুখ ? ব্যর্থ এ রোদনে
বুকে টেনে তারে বাঁধিব না।
নারীর ধর্ম্ম নহেক শুদ্ধ মর্ম্ম বেদনে মরা ;
প্রীতির ধর্ম্ম নহেক ক্ষুদ্র কারাগারে গড়া ধরা !"

কবি এইবার বুঝিয়াছেন,—

"নারীর ধর্ম্ম নহেত কেবল আপনা লইয়ে থাকা ;
এ হেন পুণ্য, প্রীতির ছলেতে ক্ষুদ্র স্বার্থ ঢাকা।"

কবি এখন চাহিতেছেন—

"পুণ্যের নামে যেই অভাগিনী,—
পুষি' দুখ, প্রাণ মাঝে তার,
গৃহে-কোণে বসি কাঁদে অনাথিনী,
উড়ে যাব আমি কাছে তার।
বুঝাব,—প্রীতির লক্ষ্য বিকাশ, বক্ষে জগৎ ধরা ;
নারীর মোক্ষ নহেক কেবল দুঃখে দহিয়া মরা।"

গভীর প্রেমের অভিব্যক্তি ভাষায় হয় না। যেখানে প্রেমের গাম্ভীর্য্য সেখানেই ভাষা নীরব—সেখানে অন্তরের আশা ও ভালবাসা, আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তি অন্তর মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। কবি অন্তরের সেই গভীর প্রেম নীরবে উপলব্ধি করিয়া বলিতেছেন—

"সীমা হীন প্রাণ ছেপে, শব্দহীন স্তব্ধ ভাষা
আছে পক্ষ বিস্তারিয়া ; বক্ষে মৌন ভালবাসা।
নীরবে গাহিয়ে যাই, ঢালিয়ে প্রাণের প্রীতি ;
ঘুমে মগ্ন মৌন প্রাণে শোনো স্বপ্নে রচা গীতি।
কহিতে বুঝাতে কথা, সদা চমকিয়ে চাই
পাছে সুখ-স্বপ্ন মোর ভাঙ্গে বলি ভয় পাই।

কি বুঝিলে, কি শুনিলে, সাধ নাই শুনিবার ;
বুঝে নেব, বুঝে নিও, প্রাণে প্রাণে দু'জনার।

*   *   *   *

ওই দেখ সুধাংশুর সুবিমল সুমধুর
জ্যোছনা নীরবে হাসে, স্তব্ধ শূন্যে ভরপূর।
নীরবে বহিছে বায়ু সেই চন্দ্রিকার গায়,
মূরছি বকুল ফুল নীরবে ঝরিছে তায়।
বাতাসে কুসুম গন্ধ লুকাইয়া করে খেলা,
নিরজনে নিশা করে নীরব প্রেমের মেলা।

কবির 'মরণ' কবিতাটি বড় মর্ম্মস্পর্শী।—কবি মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

"এস ওগো, এস এস আমার মরণ!
এস হে সুন্দর সৌম্য, সুনীল বরণ!
বাজিয়া উঠিছে শঙ্খ সন্ধ্যার আরতি!
তুমি এসো হৃদিতলে মৃদু মন্দ গতি।"

*   *   *

"শ্যামস্নিগ্ধ গোধূলিতে করিব বরণ,
এসো সখা, বর বেশে মন্থর চরণ।
আমরা দু'জন যাত্রী অনন্ত পথের
বাজিছে অধীরে ভেরী তোমার রথের।
হৃদি-অন্তঃপুর হতে পরাণ-বধূরে
অলক্ষ্যে লইয়া যাও অনন্ত সুদূরে!
দেখিবে না, জানিবে না, কেহ কভু আর
পাবে না উদ্দেশ খুঁজি এ জগতে তার!

ফুটিয়া উঠিছে তারা রঙীন আকাশে,
পতাকা চঞ্চল তব সন্ধ্যার বাতাসে।
শিথিলিত হয়ে আসে জীবন-বন্ধন—
নিমিলিত হয়ে আসে অবশ নয়ন!"

আমরা কবি অনঙ্গমোহিনীর কবিতা ও কাব্যের আলোচনা তাঁহার কথায়ই পরিসমাপ্ত করিলাম—

"আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা।
—মধু-সিক্ত নহে বাণী,
—দুঃখ-দিগ্ধ প্রাণখানি;
শুষ্ক চক্ষে পথ চেয়ে কেটে যায় বেলা।
আমার কবিতা নয় কল্পনার খেলা!"

কবি অনঙ্গমোহিনীর কবিতা বাঙ্গালা সমুদয় মাসিক পত্রেই নিয়মিত-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বর্গীয়া নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী

এক সময়ে সে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে নগেন্দ্রবালার নাম সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত ছিল। মাসিক-সাহিত্যে তাঁহার রচিত গদ্য ও পদ্য রচনা প্রায়ই প্রকাশিত হইত—কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে নগেন্দ্রবালার নাম বিস্মৃত-প্রায়। বঙ্গাব্দ ১৩০৩ সালে হুগলী সাবিত্রী যন্ত্রে শ্রীহরিদাস পাল দ্বারা ইঁহার কবিতা গ্রন্থ "মর্ম্মগাথা" প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পূর্ণিমা সম্পাদক শ্রীযুক্ত যদুনাথ কাঞ্জিলাল উহার ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ভূমিকায় লেখিকার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল যে—"লেখিকা একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা, ইনি এখনও বালিকা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই অল্প বয়সে ইনি যেরূপ কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে ভবিষ্যতে ইঁহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের যে সমধিক উন্নতি সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। গ্রন্থ খানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় লেখিকার হৃদয়ে কি এক শোকোচ্ছাস বহিয়া যাইতেছে, বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, ক্ষোভের তরঙ্গ উঠিতেছে ও নামিতেছে। বাল্যকালেই পীড়ার যন্ত্রণায় ও সংসারের কোন দুর্দ্দৈব ঘটনায় হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, যে ক্ষোভ হৃদয় আকুল করিয়াছে, তাহারই পরিণাম ফল এই "কবিতা পুস্তক"—এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতেই নগেন্দ্রবালার কবিতার সুর পাঠক সমাজ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। মর্ম্মগাথা খণ্ড কবিতার সমষ্টি।

'মর্ম্ম গাথায়, কবির কবিত্ব বা রচনায় কোনও বিশেষত্ব বা কবি-জনোচিত সূক্ষ্ম দৃষ্টির সামান্য পরিচয়ও নাই। ছন্দে বা সুরে কোন নূতনত্ব নাই। আছে অতি সহজ সরল ভাষায় মনের কথার অকৃত্রিম প্রকাশ। [illegible] কবিতার সংখ্যাও প্রায় পঞ্চাশটি। কোন

নূতন কথা নূতন চিন্তা বা ভাবের পরিচয় ইহাতে নাই—আছে সেই দুঃখ ব্যথা এবং ব্যক্তিগত বেদনার পরিচয়। সাধ কবিতাটিতে কবির বিশ্ব-জনীন ভাবের সামান্য প্রকাশ আছে,—

বড় সাধ হয় মনে মানবের ব্যথা রাশি,
এ ক্ষুদ্র হৃদয় পাতি লব আমি দিবানিশি।
বড় সাধ হয় মনে হ'য়ে আমি অশ্রুজল,
সখা সম ব্যথিতের সাথে র'ব অবিরল।

শেষ কবিতায় কবির প্রাণের বেদনার সুর টুকু ধরিতে পারা যায়।

কি শেষ? কিসের শেষ? মরমের ব্যথা?
কি শেষ? কিসের শেষ? মরমের কথা?
সে ব্যথা মরমে মোর নীরবে নীরবে আছে,
বলিনি তা বলিব না জীবনে কাহারো কাছে।
তার নাকি আছে শেষ এ পোড়া ধরাতে হায়!
সে অনন্ত ব্যথা নাকি ব'লে শেষ করা যায়!
হয় নাক শেষ যদি হায় এ যাতনা ক্লেশ,
তবে শেষ লিখি কেন? কিসের গো এই শেষ?
পরাণের দু'টি কথা বিন্দু মর্ম্ম ব্যথা ডোর
দিয়া, গাঁথিয়াছি মালা তারই আজ শেষ মোর!

ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির নাম এখানে প্রদত্ত হইল। দানবনির্ব্বাণ, উষা-পরিণয়, মর্ম্মগাথা, চামেলী, গীতাবলী, প্রেমগাথা, ব্রজবালা, নারী-ধর্ম্ম, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, অমিয়গাথা, শিশুমঙ্গল ও কুসুমগাথা। নগেন্দ্রবালা বাঙ্গালা ১২৮৪ সালে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত পালাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দশ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার সুখড়িয়া গ্রামের শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র মুস্তোফীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। অনেক দিন হইল ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরী ঘোষ

'সঙ্গিনী' ও 'রঙ্গিনীর' কবি শ্রীযুক্তা সুরমাসুন্দরী ১২৮১ সালের ৪ঠা ভাদ্র ঢাকা জেলার অন্তঃর্গত মালখাঁনগর গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থ সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন বসু-ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺উমেশচন্দ্র বসু মহাশয় উকীল ছিলেন। মালখাঁনগর গ্রামে ইঁহাদের বাড়ীতে একটী বালিকা বিদ্যালয় ছিল, সুরমাসুন্দরী সেই গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে উচ্চ প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র তের বৎসর। অতঃপর কিছুদিন তিনি ঢাকার ইডেন বালিকা বিদ্যালয়েও পাঠাভ্যাস করিয়াছিলেন।

১২৯৩ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ বিক্রমপুর বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী ময়মনসিংহের খ্যাতনামা উকীল স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ঘোষ মহাশয়ের [বর্ত্তমানে রায় বাহাদুর] সহিত সুরমা-সুন্দরীর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় স্বামী নিশিকান্ত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন, পরে ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ময়মনসিংহে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। শিক্ষিত স্বামী, পত্নিকে সাহিত্যানুরাগিনী করিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও শ্রম করিতেন। সুরমাসুন্দরী অতি শৈশব হইতেই কবিতা-পুস্তক পাঠ করিতে ভালবাসিতেন ও ছন্দ মিলাইতে চেষ্টা করিতেন। বিবাহের পর তিনি কিছু কিছু পদ্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১২৯৬ সালে তাঁহার স্বামীর প্রণীত 'অশ্রু' নামক একখানি ছোট কবিতাপুস্তকে তাঁহার রচিত কয়েকটী কবিতা মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সময়ে স্বামীর যত্ন ও আগ্রহে তিনি কলিকাতার "পূর্ব্ববঙ্গ স্ত্রীশিক্ষা কমিটীর" বাঙ্গালা সাহিত্যের

এক বিশেষ পরীক্ষা প্রদান করেন ও তাহাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া একটী সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন।

সুরমাসুন্দরীর প্রথম কবিতাপুস্তক 'সঙ্গিনী' ১৩০৭ সালে প্রকাশিত হয়। 'সঙ্গিনী' প্রকাশের পূর্ব্বে তাঁহার রচিত অনেক গীতি কবিতা 'প্রদীপ', 'উৎসাহ', 'প্রভাত' ইত্যাদি মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহার রচিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রঙ্গিনী' ১৩০৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। বহি দু'খানি কুন্তলীন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার ছাপা, কাগজ ও বাঁধাইর বিশেষত্বও সেকালের পাঠক সমাজের মনোরঞ্জন করিয়াছিল।

সুরমার কাব্যগ্রন্থ দু'খানি সে সময়ের সংবাদপত্র সম্পাদকগণ এবং প্রসিদ্ধ লেখকগণ সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কবিতার মিষ্ট সুর, শব্দসম্পদ এবং গীতি কবিতার সরল মাধুর্য্য তাঁহার কবিতায় অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এ কথা না বলিলেও চলে যে, ত্রিশ বৎসর আগের কোনও কবির পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের হাত এড়াইয়া চলিবার শক্তি ছিল না। সুরমার কবিতায়ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পূর্ণরূপে পরিস্ফুট। শুধু ছন্দে নয়, শব্দে নয়, ভাব ও বাক্য-বিন্যাসের মধ্য দিয়াও তাহা দেদীপ্যমান। অধিকাংশ কবিতাই ব্যক্তিগত সংকীর্ণতার ঊর্দ্ধে বিশ্ব-মানবতায় অনুপ্রাণিত নহে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা ও কল্পনা লইয়া আপনার মধ্যে আপনার জগৎ সৃষ্টি করিয়াই তাঁহার কবিতা বধূ সলজ্জ চরণক্ষেপে পথ চলিয়াছে। কবি 'কবি প্রসঙ্গে' সত্যই বলিয়াছেন,—

কবির হৃদয় কুঞ্জে ভাব-কলিগুলি
লুক্কায়িত লজ্জাবতী বালবধূবৎ ;
ধীরে ধীরে দলগুলি যায় যবে খুলি
মাতায় সৌরভে রূপে আকুল জগৎ।

শ্রীমতী সুরমাসুন্দরী ঘোষ

কবির এ উক্তি তাঁহার কবিতার পক্ষে সত্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার 'নির্ব্বাসিতা সীতা' শীর্ষক কবিতাটী আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়াছে। লক্ষ্মণ যখন রামচন্দ্রের কঠোর আজ্ঞা নিবেদন করিলেন, তখন সীতা মূর্চ্ছাও গেলেন না, ভাঙ্গিয়াও পড়িলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সতী-গর্ব্ব, নিরপরাধে দণ্ডিতার অভিমানে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"আপনার মন্দ ভাগ্য, জেনে নাহি গণে
নির্ব্বাসিতা সীতা ভাবিতেছে শুধু মনে,—
ধর্ম্ম কি সহিবে হায়, আজি অকারণে
রাজ হস্তে অপমান ?"

বড় ভয়ঙ্কর কথা, কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক। বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় অকস্মাৎ এই নিদারুণ নির্ব্বাসনাজ্ঞা শুনিয়া সীতা যদি কিছুমাত্র বিচলিতা না হইতেন তাহা হইলেই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক হইত। এই স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উপরের কয় ছত্রে রামচন্দ্রের উদ্দেশে সীতা কেবল "রাজা" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন স্বামী শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ক্ষণ মধ্যেই সীতা আত্ম-সংবরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। সীতা বলিলেন—

"বলো আর্য্যপুত্র পদে দীনা জানকীর
এই নিবেদন, রাজা তিনি, তিনি স্বামী ;
তাঁর কিছু নাহি দোষ, অভাগিনী আমি !
শুনেছি অনলে স্বর্ণ ধরে উজ্জ্বলতা ;
স্বর্ণ নই—ঘুচিল না নিন্দা-মলিনতা ;
কিন্তু না হইনু ছাই ! তাঁহার সন্তান
ধরেছি যে গর্ভে আমি, যদি থাকে প্রাণ,
পিতৃগুণে বিমণ্ডিয়া তুলিব বাছারে।

আর এক কথা আছে, বলিও তাঁহায়
সাধিব দুশ্চর তপ লয়ে মনস্কাম
জন্মে জন্মে পতি যেন হন মোর রাম।"

ইহা বাস্তবিকই অনবদ্য মাধুরী-মণ্ডিত। উপরকার এই কয় ছত্রে কত যে মর্ম্মন্তুদ যাতনা, কত যে সতীত্বের গৌরব, কত যে স্বামী-ভক্তি, কত যে আত্মবিসর্জ্জনের সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

সুরমাসুন্দরীর কবিতা পড়িতে কোথাও বাধে না—নির্ঝরের অবিরাম গতি প্রবাহের ন্যায় তাঁহার কবিতার স্রোত প্রবহমানা। 'বঙ্গ জননী' কবিতাটিতে তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এখানে সেই কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম।

আমার জন্মভূমি,
অভাগিনী মাগো!
আর ঘুমায়ো না তুমি,
জাগো স্নেহে জাগো!

শত কবি গান গায় অর্ঘ দেয় তব পায়
আজন্ম দিতেছি ভরি অঞ্জলি অঞ্জলি
সেই স্তব-স্তুতি বিফল সকলি?

দুঃখিনী জননী, ওগো
বিষাদ প্রতিমা,
ভাসাবে কি অশ্রু জলে
তোমার মহিমা?

চারি দিকে শুন সব আনন্দ উৎসাহ-রব,
তুমি একা বসে আছ, ধূলি বিমলিনা,
হে আমার জন্মভূমি, অভাগিনী দীনা।
হে আমার জন্মভূমি
পতিতা, তাপিতা
মুখে তব অন্ন নাই,
বুকে জ্বলে চিতা
ঘরে ঘরে, মা তোমার, উঠে শুধু হাহাকার
তুমি হাসিতেছ বসি, চির উদাসিনা।
তাই মা, তোমার লাগি বাজে না এ বীণা!
তাই ত ধিক্কার উঠে
হৃদয় মাঝার,
মা যাহারে ছেড়ে আছে
মিছে গর্ব্ব তার!
তাই ছিন্ন হীন বল তোমার সন্তান দল
নাই শক্তি ভক্তি, নাই মান অপমান,
আছে শুধু সভ্যতার লক্ষ কোটি ভাণ!

ব্যক্তিগত জীবনে সুরমাসুন্দরী বিবিধ শোকের আঘাত সহ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়েও তিনি অবসর মত সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া থাকেন।

স্বর্গীয়া সুশীলাসুন্দরী সেন

সুশীলাসুন্দরী সেন, যশোহর কালিয়া গ্রামে প্রায় ষাট বাষট্টি বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবে বিক্রমপুর মূলচর গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় হরিহর সেন সবডেপুটি কালেক্টরের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহাদের দম্পত্য জীবন বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই, একমাত্র কন্যা চারুবালার জন্মের অব্যবহিত পরেই সুশীলাসুন্দরীর স্বামীর মৃত্যু হয়, সেদিন হইতে ইঁহার দুঃখের জীবন আরম্ভ হয়। নানারূপ দুঃখ-শোকের আঘাতে জরাজীর্ণ দেহ ও মনে সেই একমাত্র কন্যা সন্তানকে হারাইয়া নাতিনীকে লইয়া তাঁহার দুঃখের জীবন চলিয়াছিল। ১৩৩৪-৩৫ সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

"অশ্রুমালিকা" তাঁহার একমাত্র কবিতা গ্রন্থ। ১৩১২ সালে ২৫ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্ জয়ন্তী প্রেসে মুদ্রিত। অশ্রুমালিকা সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্বর্গীয় তারাকুমার বিদ্যারত্ন এবং প্রখ্যাতনামা পরলোকগত বৈদিক পণ্ডিত উমেশচন্দ্র দাশগুপ্ত যে অভিমত পোষণ করিতেন তাহা গ্রন্থ মধ্যে মুদ্রিত হইয়াছে। তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় অল্প কথায় অশ্রুমালিকার প্রকৃত পরিচয় দিয়াছেন, তিনি লিখিয়াছেন—"প্রাণাধিক আত্মীয়-বিয়োগে মর্ম্মভেদী শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে গ্রন্থকর্ত্রী ইহা রচনা করিয়াছেন। ইহাতে লোকহিতকর অন্যান্য বিষয়েও অনেক-গুলি পদ্য আছে। রচনা সরল ও আড়ম্বর শূন্য। শোকাতুরা অবলার মর্ম্ম নিষ্ঠ্যুত শোকাশ্রু সম্বন্ধে কোনও কথা বলিবার নাই। কিন্তু ইহা শুধুই শোকাশ্রু নহে; ইহার প্রত্যেক গাথা ভগবৎপ্রেমের সংযোগে অপূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করিয়াছে।" ইহাই 'অশ্রুমালিকার' মর্ম্ম কথা।

ব্যক্তিগত শোক কবিতাই ইহাতে বেশি। স্বর্গীয় পতি দেবতার এবং কন্যার উদ্দেশে লিখিত কবিতার সংখ্যাই অধিক। যে শোক বেদনা শুধু আপনাকে লইয়াই প্রকাশ পায় তাহার মধ্যে বিশ্বমানবতার কোন যোগ নাই, সেই কবিতা কোন কালেই সাহিত্য-জগতে কোনও স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে না, সে জন্যই অশ্রুমালিকা সাহিত্য-জগতে কোনও স্থায়ী আসন লাভ করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত শোক-কবিতার আলোচনা আমরা সযত্নে পরিহার করিলাম। তাহা ছাড়িয়া দিলে যে কয়টি কবিতা লোক-হিতকর এবং ভগবৎ প্রেমের সংযোগে সুন্দর হইয়াছে সে দুই একটী কবিতা উল্লেখযোগ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'কৃষ্ণাগৌতমী' ও 'জীবনালোক' এ দুইটী কথা কবিতা ছন্দে ও রচনা মাধুর্য্যে সুন্দর এবং বলিবার ভঙ্গীটিও মনোরম। 'বংশী-রবে', 'পাপিয়ার প্রতি' 'শুকতারা' 'প্রকৃতিব বিচিত্রতা' প্রভৃতি কবিতায় গীতি কবিতার সুরের আভাষ পাওয়া যায়। "বংশী রবে" কবি সুদূর অতীতের রাধিকার বাঁশী-রব শুনিয়া চিত্তের ব্যাকুলতা অতি সুন্দর ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন, শচীর দুলাল নিমাইয়ের নিশীথে গৃহত্যাগও একদিন বিশ্ববিধাতার ব্যাকুল বাঁশীর আহ্বানেই সম্পন্ন হইয়াছিল। কবি বলিতেছেন,—

"এ বাঁশরী রবে
নিমাই ছাড়িয়া যায়, অভাগিনী শচীমায়,
কাঁদাইয়া নদীয়ার ভক্তগণ সবে;
বিষ্ণুপ্রিয়া অভাগীর, ঝরিল নয়ন নীর,
আর ত পেলে না দেখা হৃদয়বল্লভে।
আঁধার ঘিরেছে আসি, নিদ্রিত নদীয়াবাসী,
নিদ্রাগত বিষ্ণুপ্রিয়া শচীমা দু'জন,
সেই সে গভীর রাতে বাজে বাঁশী দূর হতে,
পলাইল সে সঙ্কেতে নদীয়া-রতন।

'প্রকৃতির বিচিত্রতা' কবিতাটীতে বহিঃ-প্রকৃতির বর্ণনাটুকু মনোহর।

—অয়িগো প্রকৃতি রাণি !

কভু হাস্য মুখরিত, সর্ব্বদিক্ প্রফুল্লিত,

ললিত লাবণ্যে যেন ঢাকিয়াছ তনুখানি।"

* * *

"কভু রৌদ্রদীপ্ত দেহে, উজলি শোভিছ তাহে'

দোলাইছে শস্যগুলি মৃদুল মারুত ;

শ্যামল বসন পরা, স্নিগ্ধ কান্তি মনোহরা

ও সৌন্দর্য্য হেরি মন মানস মোহিত।

কভু বা সায়াহ্ন কালে, সোণালি মেঘের জালে,

আবরিয়া তনুখানি শোভিছে সুন্দর,

কভু বারি বরষিয়া, জলে দেহ আবরিয়া,

কদম্ব কেতকী গন্ধে প্রফুল্ল অন্তর।

কভু মহা ঝড় বৃষ্টি, বিনাশিতে যেন সৃষ্টি

মুহুর্ম্মুহু থেকে থেকে বিজলী চমকে ;

কড় কড় শব্দ ঘোরে, অশনি গর্জ্জন করে,

সে নিনাদ শুনি তুমি হাসিছ পুলকে।"

প্রকৃতির বৈচিত্র্যটুকু সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে সত্য কিন্তু কোথাও অন্তর্নিহিত মাধুর্য্যের মধ্যে আপনার কবিত্বকে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন নাই।
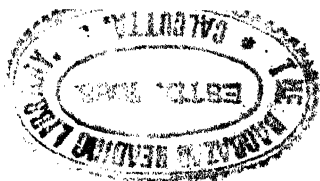
শ্রীযুক্তা সরলাবালা দাসী

'মিরণ' রচয়িত্রী সরলাবালা দাসী পরলোকগত আলিপুরের উকীল-সরকার হেমেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পত্নী। ইনি সুপ্রসিদ্ধ অক্রূর দত্তের বাড়ীর মেয়ে। 'মিরণ' কবিতা-গ্রন্থখানি ১৩১৮ সালে শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ১নং অক্রূর দত্তের লেন 'বী' প্রেসে মুদ্রিত। এই কাব্য গ্রন্থখানার ইতিহাস এইরূপ,—পৃথিবীতে থাকিয়া, পার্থিব উপায়ে, 'মিরণের' মৃন্ময়ীর—আমার লোকান্তরিতা স্নেহময়ী কন্যার স্মৃতিকে ধরিয়া রাখিবার এই উদ্যম। তাই স্বতঃ প্রবাহিত জ্বালাময়ী কবিতার অশ্রু মুক্তার মত ছাপার সুন্দর অক্ষরে, তাহার লীলাময়ী মাধুরী ধরিয়া রাখিবার প্রয়াস। তাই এই নশ্বর প্রথায় সেই অবিনশ্বর স্মৃতি জাজ্জ্বল্যমান রাখিবার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার ফলে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। ভাবপ্রসঙ্গে বিজড়িত বলিয়া অন্য কবিতাও ইহাতে স্থান পাইয়াছে।"

'মিরণে'—প্রায় একশত খণ্ড কবিতা আছে। অধিকাংশই ব্যক্তিগত শোকোচ্ছ্বাস। ব্যক্তিগত শোক-কবিতা ছাড়া অন্যান্য কবিতাগুলি অধিকাংশই বৈরাগ্য, নৈরাশ্য এবং ঈশ্বর-ভক্তিপূর্ণ। আমরা এখানে 'অশ্রু' কবিতাটি উদ্ধৃত করিলাম।

অশ্রুই জীবন পথে প্রকৃত সম্বল।
অশ্রু নাই যার তার জীবন বিফল।
অশ্রু মুক্তা, অশ্রু রত্ন, জগতের সার।
পবিত্রতা মূর্ত্তিমতী অবনী মাঝার।
অশ্রু ব্যথা, অশ্রু হাসি, বিচিত্র সুষমা।

প্রিয় হতে প্রিয়তর—চির প্রিয়তমা।
অশ্রু জ্ঞান, অশ্রু ধ্যান, অশ্রুই ধারণা
অশ্রু প্রাণ, অশ্রু মন, ঈশ্বর প্রেরণা।

শ্রীযুক্তা অম্বুজাসুন্দরী দাশ গুপ্তা

'প্রীতি ও পূজার' কবি অম্বুজাসুন্দরী এক সময়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিতা ছিলেন। তাঁহার কবিতা 'বামাবোধিনী' 'নব্যভারত' এবং অন্যান্য সাময়িক সাহিত্যে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইত। 'প্রীতি ও পূজা' তাঁহার প্রথম কবিতাগ্রন্থ। ইনি টাঙ্গাইল নিবাসী অবসর প্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত কৈলাশগোবিন্দ দাশ গুপ্ত মহাশয়ের পত্নী। এক সময়ে ইঁহার কবিতা সরল ভাষা ও অকৃত্রিম প্রকাশের জন্য অনেকেরই প্রিয় ছিল।

১৩০৪ সালে বামাবোধিনী ডিপজিটারী হইতে 'প্রীতি ও পূজা' প্রকাশিত হইয়াছিল। সে হিসাবে এই কবিতা গ্রন্থখানির বয়স তেত্রিশ বৎসর। ইহাতে প্রায় একশত খণ্ড কবিতা আছে। এই সকল কবিতার মধ্যে আপনাকে ছাড়িয়া কবি বড় বেশি কোন কথা বলেন নাই। আপনার সুখ, দুঃখ, আনন্দ, সন্তান-স্নেহ ও স্বামী-প্রীতি ইহা লইয়াই বেশির ভাগ কবিতা রচিত হইয়াছে। কবি ঐ সকল রচনার মধ্য দিয়াও অনেক সময় একটা অজানা অসীমের সন্ধান পাইয়াছেন এবং প্রকৃতির রসমাধুর্য্যের মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছেন, সেইরূপ স্থানেই তাঁহার কবিতার রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে—তখনই শুনিতে পাই—

"আকাশের তারা, ধরার কুসুম,
জলের লহরি,—আমারি সব,—
আমারি কারণ বনে লতা পাতা,
আমারি কারণ পাখীর রব।"

'বঙ্গ-কুল-নারী' কবিতায় কবি যে চিত্রটি আঁকিয়াছেন—তাহা সত্য সত্যই অতি সুন্দর!—

"বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নারী,
ধীরতা নম্রতা মাখা, ঘোমটায় মুখ ঢাকা
রয়েছে উনন-ধারে চিরকাল ধরি,
বড় ভালবাসি আমি বঙ্গ-কুল-নারী।
নয়নে কজ্জল-দাগ, অধরে তাম্বুল-রাগ,
ললাটে সিন্দুর-বিন্দু লক্ষ্মীর আসন,
সহাস্য সুন্দর মুখ, সুন্দর সরল বুক,
উজ্জ্বল তারার মত আনত আনন।"

* * * *

"বুক ভরা স্নেহ-ধারা পতি-প্রেমে মাতোয়ারা,
স্থির সরসীর ন্যায় গম্ভীর সুস্থির।
আঁখিভরা সুশীতল বরষা-গঙ্গার জল,
সফেন তরঙ্গে সদা হয় উদ্বেলিত,
উচ্চ হিয়া উচ্চ মন, উচ্চ কাজ অনুক্ষণ,
তবুও ক্ষুদ্রের ন্যায় পর-পদানত।
সর্ব্বদা সন্তুষ্টমনা, সামান্য নীহার-কণা,
একটু উত্তাপে শুষ্ক কমনীয় কায়,
একটু মলয়ানিলে আবেশে পড়িবে টলে
আবার সহাসে স'বে ঝঞ্ঝাবাত তার।"

'শ্যামাপাখী' 'নৈশকোকিল' 'ডাকে বঁধুয়া' প্রভৃতি কবিতায় গীতি কবিতার সুরের রেশ আছে।

শ্রীযুক্তা প্রফুল্লময়ী দেবী

খুল্না জেলার সেনহাটি গ্রাম বৈদ্য-প্রধান স্থান। এই গ্রামে ধন্বন্তরী বংশীয় বৈদ্য সন্তানেরা অনেক দিন হইতে বাস করিয়া আসিতেছেন। প্রফুল্লময়ী এই বংশের স্বর্গীয় বিপিনবিহারী সেন-মুন্সী মহাশয়ের কন্যা। এই বংশেই পরলোকগত স্বনামধন্য প্রমদাচরণ সেন মহাশয় প্রথম বালক বালিকাগণের উপযোগী মাসিকসাহিত্য 'সখা' সম্পাদন করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। প্রফুল্লময়ীর পিতা স্বর্গীয় বিপিনবিহারী মাতামহের জমীদারির কিয়দংশ ওয়ারেশ-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার মাতুলালয় ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত রাজবাড়ী মহকুমার পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী বাণীবহ গ্রামে যাইয়া বাস করেন। সেই গ্রামে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে প্রফুল্লময়ীর জন্ম হয়।

প্রফুল্লময়ীর বাল্য জীবন বাণীবহে অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার পিতা স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি উক্ত গ্রামে একটী ছাত্র-বৃত্তি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আটবৎসর বয়সে বালিকা প্রফুল্লময়ী জেলাবোর্ডের উচ্চ প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়া ফরিদপুর জেলায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরের বৎসর "নব্যভারত" সম্পাদক স্বর্গীয় দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠাপিত "ফরিদপুর সুহৃদ সম্মিলনী"র একটী পরীক্ষা দিয়া সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পর আর তাঁহার কোন বিদ্যালয়ে পাঠের সুযোগ হয় নাই।

অতি অল্প বয়সেই প্রফুল্লময়ীর কবিত্ব শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে কোনও মাসিক পত্রিকায়

একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। বালিকা সেই কবিতাটি সুর দিয়া আবৃত্তি করিতেছিলেন তখন তাহার সমবয়স্ক এক খুল্লতাত ভ্রাতা বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিলেন—'পরের লেখা কবিতা পড়িয়া কাজ নাই, নিজে লিখিতে পারিলে তখন পড়িস।' এই কথায় প্রফুল্লময়ীর প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল, সেই দিনই মহারাণীর সম্বন্ধে এক কবিতা লিখিলেন, সেই তাহার প্রথম কবিতা।

দ্বাদশ বৎসর বয়সে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রফুল্লময়ীর বিবাহ হয়। তাঁহার শ্বশুর ৺স্বর্গীয় দিগিন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত পটুয়াখালীর সর্ব্বপ্রধান উকিল ছিলেন। তাঁহার শিক্ষানুরাগই প্রফুল্লময়ীর কবিত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়াছিল এবং তিনি তাঁহাকে কন্যার আসনে স্থান দিয়া বাঙ্গালার সাহিত্যের দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি প্রফুল্লময়ীকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন এবং অনেক উৎকৃষ্ট সাহিত্য-গ্রন্থ পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রফুল্লময়ী প্রথম কবিতা-পুস্তক "বীর-বালক" লবকুশের বীরত্ব-গাথা ব্যঞ্জক একখানি অমিত্রাক্ষর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখিয়াছিলেন—"তিনি নিতান্তই বিস্মিত হইয়াছেন যে, প্রফুল্লময়ী এত অল্পবয়সে মাইকেলের ছন্দোবদ্ধ ও ভঙ্গী কিরূপ ভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন এবং কিরূপ সরল শুদ্ধ ভাষায় তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন।"

তাহার পর প্রফুল্লময়ীর বহু কবিতা "প্রবাসী", "ভারতবর্ষ", "যমুনা" "নব্যভারত" প্রভৃতি মাসিক পত্রাদিতে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩৩০ সালে তাঁহার কাব্যগ্রন্থ 'পুষ্প-পরাগ' প্রকাশিত হইয়াছিল। 'পুষ্প-পরাগ' প্রকাশিত হইবার পর তাঁহার কবি-প্রতিভা সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থান লাভ করিয়াছে। ইঁহার রচিত 'লক্ষ্য-হারা' ও 'প্রতিমা' নামে দুইখানা গদ্য গ্রন্থও আছে। আমরা এখানে 'পুষ্প-পরাগ' সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।—

প্রফুল্লময়ীর কবিতায় বৈচিত্র্য আছে। ইঁহার অনেক কবিতা ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা ছাড়াইয়া অনেক উচ্চ আদর্শে গ্রথিত। শুধু আপনাকে লইয়া নয়, আপনাকে ছাড়াইয়া বহির্জগতের ভাব, চিন্তা ও প্রেরণাও উহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"প্রাণ চাহে অসীমের মাঝে আপনারে দিতে ডুবাইয়া,
কি ভাবে করিবে আবাহন, তাই সে ফেলেছে হারাইয়া।
অনন্তের একটী কণিকা বারেক যে পেয়েছে সন্ধান,
জগতের শেষহীন কথা তা'র স্তব্ধ মৌনের সমান।"

'পুষ্প পরাগের' কবিতাগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আধ্যাত্মিক কবিতা, কথা-কবিতা, স্বদেশ বিষয়ক ব্যক্তিগত এবং নৈসর্গিক কবিতায় গীতি-কবিতার সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কথা-কবিতার মধ্যে "গুরু ও শিষ্য" কবিতাটি মর্ম্মস্পর্শী ও সুন্দর। কবির ছন্দ-বৈচিত্র্য, ভাবের বিন্যাস ও শব্দচয়ন উল্লেখযোগ্য। "শ্রাবণে" কবিতার একদিকে যেমন বাহিরের বর্ষা-প্রকৃতির সজল শ্যামল ভাব পরিস্ফুট তেমনি অন্তরের মধ্যে যে বর্ষার সজল শ্যামল সরস ভাবটি চিত্তকে আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিতেছে তাহাও ভাব-ব্যঞ্জনায় প্রকাশিত।

"ঝঞ্ঝা নয়রে বাদল নয়রে,
ওই যে মহোৎসব!
নূপুর রুনু ডুবাবে মোর
দেয়ার গুরুরব।
আকাশ ভরা ওই যে কাহার
নীলাম্বরীর জরীর বাহার,
সাড়ীর সাথে মিশ্‌বে রে মোর
নিশির অন্ধকার;

অলঙ্কারের শিঞ্জিনী কেউ
শুন্‌বে না আজ আর !
শ্রাবণ নিশার আঁধার রে আজ
গভীর হ'য়ে আসে,
এই লগনে আজকে তোরা
একলা রবি বাসে ?
বাতাস ডাকে 'আয় চলে আয়,'
মাতাল সে আজ কিসের নেশায়,
হিন্দোল দোলায় দোলাতে তায়
আকুল কেশ পাশে,
শ্রাবণ নিশার আঁধার যে ওই
জমাট হ'য়ে আসে !"

আমরা 'প্লাবন' কবিতার মধ্য দিয়াও কবি হৃদয়ের বিশালতা এবং বিশ্বমানবতার পরিচয় পাই। কবি বলিতেছেন—

"ও কা'র 'ব্যাকুল প্রাণের এমন পরিচয় ?
আজকে যে তোর গোপন ব্যথা
সকল বিশ্বময় !
আজ সে গভীর ব্যথার তরে,
কতই চোখে অশ্রু ঝরে,
বুকের মাঝে ঝঙ্কারে গো
"একা তোমার নয় !
আজকে তোমার বুকের ব্যথা
সকল ভুবনময় !"
আবার, সবার ঘরের সুখের ঢেউ ওই
লাগ্‌ল যে তোর দোরে ;
কতই যে হাত আদর করে
এগিয়ে নেয়রে তোরে।

"সীমায় বেঁধে রাখিস্‌নেরে
বিলিয়ে দেরে ছড়িয়ে দেরে"
কে বলে ঐ মধুর স্বরে
ব্যাকুল হৃদয় ভরে'
একি প্লাবন ভুবন পাবন
এলো গো তোর দোরে।"

এই সুরের মাধুরীই প্রফুল্লময়ীর কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'চাঁপার পূর্ব্ব কাহিনী,' 'মধুপের প্রতি কেতকী' এবং 'সাধ' কবিতাটি সৌন্দর্য্য রসে ঢল ঢল।

কবির বিষাণ, অভাগার কাতর প্রাণেও সঞ্জীবনী-শক্তি জাগরিত করিয়া উদ্বোধিত করিতেছে, সেই বাণী এই—

"একেলা বিভোলা গৃহ মাঝে,
তোর কিরে দিন গণা সাজে?
ওঠ জাগ মরণের গানে।
ওই কে থাকিয়া দূর দেশে
অদৃশ্য অলক্ষ্যতম বেশে
বাজাতেছে পবিত্র বিষাণ।"

* * *

"তোর প্রাণে পশেনি সে সুর
হয়নিক হিয়া ভরপূর
উদাসীন হয়নি পরাণ?
আয় মুক্ত! আয় বদ্ধ প্রাণ,
অবসাদ হোক অবসান,
রাঙ্গা রবি উদিত গগনে।"

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দত্ত

১৩১১ সালের ১৪ই অগ্রহায়ণ তারিখে শ্রীমতী রাধারাণী কোচবিহার রাজ্যে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ মহাশয় তখন কোচবিহার প্রদেশের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, উপস্থিত তিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার কৈশোরের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত কোচবিহারেই ছিলেন, সেইখানেই গৃহশিক্ষকের নিকট ও বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করিতেন। পড়াশুনায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল। শ্রীমতী রাধারাণীর শৈশব, বাল্য ও কৈশোরের প্রথম উন্মেষ কাল কোচবিহার রাজ্যের উন্মুক্ত উদার রমণীয় প্রকৃতির কোলেই কাটিয়াছে। বাল্যকাল হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি, বিশেষভাবে কাব্যের উপর তাঁহার একটা গভীর ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল। কোচবিহারের সুবিস্তৃত শ্যাম স্নিগ্ধ প্রান্তর; তার পুষ্পিত কানন, কলস্বনা নদী, গহন বন এই কিশোরী কুমারীর কল্পনা-বিলাসী অন্তরখানিকে স্পর্শ করিয়া সর্ব্ব প্রথম তাঁহার ভিতরের সহজাত কবি প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিয়াছিল।

কৈশোরকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের অতি অল্পকাল পরেই দুর্ভাগ্যক্রমে বৈধব্য ঘটে। স্বামী ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রামপুর রাজ্যের ষ্টেট-ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। সুস্থ সবল শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম পাত্র পাইয়া শ্রীমতী রাধারাণীর পিতা মাতা অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন। পড়াশুনার ব্যাঘাতের আশঙ্কায় বিবাহে তাঁহার একান্ত অনিচ্ছা ছিল। সেই অপরিণত বয়সেও

শ্রীমতী রাধারাণী পিতামাতাকে বারম্বার তাঁহার বিবাহের অসম্মতি জানাইয়াছিলেন, কিন্তু বালিকা কন্যার মতামত কোন্ অভিভাবকেরাই বা গ্রাহ্য করেন? এখানেও তা' উপেক্ষিত হইয়াছিল!

বিবাহের পরই স্বামী তাঁহার কর্ম্মস্থলে চলিয়া যান, এবং অল্প কালের মধ্যেই সেই সুদূর প্রবাসে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হইয়া অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার বালিকা পত্নীকে সর্ব্বপ্রথম কাছে আনিয়াছিলেন।

এত অল্প বয়সে তাঁহার বৈধব্য ঘটায় তাঁহার পিতা ও পিতৃকুলের হিতৈষী আত্মীয় বন্ধু এবং শ্বশুরকুলের অভিভাবকেরা সকলে কাতর সমবেদনায় অনুপ্রাণিত হইয়া পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী রাধারাণী এ বিষয়ে এবার তাঁহার এমন সুদৃঢ় আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন যে, অভিভাবকেরা বাধ্য হইয়া এ কার্য্য হইতে নিরস্ত হ'ন।

শ্বশুরকুলের তিনিই সর্ব্বজ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ। পুত্রশোকাতুরা শ্বশ্রূদেবী তাঁহার এই বিধবা বালিকা বধূটিকে লইয়া সেদিন তাঁহার স্বর্গগত সন্তানের বিয়োগ ব্যথা ভুলিয়াছিলেন। সে অবধি শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার স্বামীর নিকটতম আত্মীয় ও প্রিয়জনদের সেবা করিয়াই তাঁহার ভাগ্যহত জীবনের দুঃখময় দিনগুলি যাপন করিতেছেন।

সামাজিক হিসাবে বিধবা শ্রেণীভুক্তা হলেও একটি কুমারী জীবনের সুকুমার সারল্য ও নির্ম্মল শুচিতা ইঁহার শুভ্র জীবনে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান। বৈধব্যের পর সেই কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার শরীর ও স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রায়ই তাঁহাকে শয্যাগত হইয়া পড়িতে হয় এবং বৎসরের মধ্যে একাধিকবার দীর্ঘকালের জন্য সহরের ধূলাবালি ও ধোঁয়ার বাহিরে গিয়া পাহাড়ে, সমুদ্র তীরে বা সুদূর পশ্চিমের

বঙ্গের মহিলা কবি

শ্রীযুক্তা রাধারাণী দত্ত

কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে, মুক্ত প্রকৃতির স্নিগ্ধ সঞ্জীবনী আবেষ্টনের মধ্যে স্বাস্থ্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়।

যে অল্প অবকাশটুকু পান তাহার মধ্যেই বাণীর কমল কুঞ্জবনে ক্ষণিকের বিরাম সুখের নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাসটুকু ফেলিবার জন্য তারই মধ্যে যে গান তাঁহার কণ্ঠে বাজে, যে ছন্দ তাঁহাকে নন্দিত করিয়া তোলে, যে কল্পনা তাঁহাকে উদাস করিয়া দেয়—যে স্বপ্ন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরে, যে তর্ক তাঁহাকে পীড়া দেয়, যে সমস্যা তাঁহাকে আকুল করিয়া তোলে, সেই সমস্তই আমরা তাঁর কাব্যে ও কবিতায়, গল্পে ও গাথায়, প্রবন্ধে ও নিবন্ধে একটা বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে দেখি। শ্রীমতী রাধারাণী ভয়ে বা সঙ্কোচে, অথবা সুনাম নষ্ট হইবার আশঙ্কায় অথবা আত্মীয় পরিজনের অপ্রিয়ভাজন হইতে হইবে বলিয়া তাঁহার রচনার মধ্যে জীবনের সত্য প্রকাশে কোন দিন কুণ্ঠিতা হন নাই। মিথ্যার ছদ্মবেশকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করেন। অন্যায় ও অসত্য লোকাচার এবং অতি বৃদ্ধ সমাজের অযৌক্তিক বিধি ও নিয়মকে প্রকাশ্য ভাবে অস্বীকার করিতে তিনি কখনো পশ্চাৎপদ হন নাই। এজন্যে তাঁহাকে ঘরে বাহিরে বহু নিন্দা ও লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছে।

১৩৩০ সাল হইতে প্রথম তাঁহার রচনা 'ভারতবর্ষ' 'বসুমতী' 'মানসী' ও 'মর্ম্মবাণী' প্রভৃতি একাধিক সাময়িক পত্রে প্রকাশ হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু লিখিতে সুরু করিয়াছিলেন তিনি তাঁহার বালিকা বয়স হইতেই।

১৩৩৬ সালের ফাল্গুন মাসে তাঁহার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ "লীলা কমল" প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের একাধিক পত্র ও পত্রিকা তাঁহার এই বইখানিকে উচ্ছ্বাসিত প্রশংসায় অভিনন্দিত করিয়াছে।

"লীলা কমলে" শ্রীমতী রাধারাণী তাঁহার যে রচনাগুলি একত্র করিয়া তাঁহার জীবন দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়াছেন, তাঁহার সেই কবিতাগুলির

অন্তর্নিহিত বেদনার সুর আমরা তাঁহার উদ্বোধন কবিতাটির মধ্যেই শুনিতে পাই—

"আজো যার পাইনি উদ্দেশ
তারে খোঁজা নাহি হোক্ শেষ!
আলোকে আঁধারে দূরে
মানব জীবন-পুরে
খুঁজি তার পদ চিহ্ন লেশ!
যুগে যুগে পলে পলে দিকে দিকে জন্ম জন্ম মোর
সেই দেবতার খোঁজে হয়ে থাক্ একান্ত বিভোর!—"

কবি তাঁহার জীবন-দেবতার ধ্যানে বিভোর। তাঁরই প্রেমের বিকাশ কবির সুপ্ত-চেতনাকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। তিনি—

"আপন অন্তর গন্ধে আপনা বিস্মৃত আত্মহারা
বিহ্বল ব্যাকুল!"

সুন্দরের কামনা তাঁহার অন্তরকে পীড়িত করিয়া তুলিয়াছে! মিলন-আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত তাঁহার সাগ্রহে উন্মুখ!

"উচ্ছ্বসিত প্রাণরসে দেহ মনে স্বপ্নাবেশ লাগে,
নয়নে লাবণ্য ছুরে, অধরে অধরে অতৃপ্ত তৃষা জাগে,
আনন্দ চঞ্চল চিত্ত বসন্তের বর্ণ গন্ধ রাগে
দীপ্ত ঝলমল;
জীবনের অন্ধ-বীজ অঙ্কুরের পরিণতি মাগে
আলোকে উজ্জ্বল!"

শ্রীমতী রাধারাণী দত্তের কবিতার মূল প্রেরণা বা উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় এইখানে—"জীবনের অন্ধ-বীজ অঙ্কুরের পরিণতি মাগে—" এই আকিঞ্চনই প্রিয়-বিরহের পরম বেদনা রূপে তাঁর প্রত্যেক কবিতাটিকে অমৃত সরস ক'রে তুলিয়াছে। তাই কবি বলিয়াছেন—

"মধুর ধ্যানের রসে বিচ্ছেদের শূন্য পাত্র মম
লইয়াছি ভরি,
অন্তরের হাসি তাই অশ্রু যূথি রূপে প্রিয়তম
পড়ে আজি ঝরি!
তোমার বিরহ মোর কামনা পঙ্কের মাঝে প্রিয়,
ফুটায়েছে ফুল;
বিথারি সহস্রদল সে কমল হাসে কমনীয়
ত্রিলোকে অতুল!"

বিরহের মধ্যেই কবির কল্পনা তাঁর প্রিয়-মিলনের সার্থকতাও খুঁজিয়া পাইয়াছে।

"আমার এ রিক্ত প্রাণে পরম পূর্ণতা বন্ধু তাই
আমি সর্ব্ব সুখী,
তুমি বাসিয়াছ ভালো, আর কোনো দৈন্য ক্ষোভ নাই
নহি নহি দুখী!
তুমি বাসিয়াছ ভালো, তুমি ভালো বাসিয়াছ বঁধু,
যত স্মরি' তত প্রাণে উছলি উথলি ওঠে মধু;
বিরহ-বেদনা তাই গন্ধ-ধূপে পরিণত শুধু
ঊর্দ্ধ অভিমুখী।"

রাধারাণীর কাব্য-সঙ্গীতের ইহাই হইতেছে প্রধান সুর! এ সুর তাঁহার সুললিত সাবলীল ছন্দ মাধুর্য্যে ধ্বনিত হইয়াছে ভাবের ঐশ্বর্য্যে ভরা সুকুমার শব্দ সম্পদে ও প্রকাশ ভঙ্গীর অনবদ্য সুষমায়! কল্পিত রচনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও রাধারাণীর একটা বিশিষ্টতা উল্লেখযোগ্য।

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী

'ধূপ' ও 'গোধূলি'র কবি শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর কবি-খ্যাতি বাঙ্গালা দেশে পরিচিত। নানা মাসিক কাগজে ইঁহার রচিত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। 'পরিচারিকা' নামক একখানা মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতাও ইনি কিছুদিন করিয়াছেন। নিরুপমার প্রথম কবিতা গ্রন্থ 'ধূপ' ১৩২৫ সালে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সেন কর্ত্তৃক ১নং চৌরঙ্গি হইতে প্রকাশিত হয় এবং ১০০নং গরপাড়া রোড্ হইতে ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল। ধূপে কবি করুণ কণ্ঠে, বিনীত ভাবে গাহিয়াছিলেন—

"পূজা মন্দির মাঝে
পূজা আয়োজন করিয়াছি শুধু
সঙ্কোচে ভয়ে লাজে।
চয়ন করেছি কুসুম-কলিকা
গোপনে সুরভি ঢালা,
তব কণ্ঠের মতন করিয়া
গাঁথিয়াছি বরমালা।"

ধূপে কবি তাঁহার কবিতাগুলির একটি শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন, যথা—প্রকৃতি, দুঃখ, গান, প্রেম, ভক্তিযোগ ও বিবিধ। এই নানা শ্রেণীর কবিতার মধ্য দিয়া একটি সুর অতি সহজেই ধরা দেয়, সেই সুর বেদনার সুর। বিশ্বপ্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে, প্রেমের পরিপূর্ণ রস ও আনন্দ-প্রীতির মধ্যে, সকলের মধ্যেই কবির একই সুর শুনিতে পাই,—

"গান যেথা নিভে গেছে, প্রাণ যেথা আছে বাকি,
শূন্য দিঠি ঢাকিবারে মুদে আসে মৌন আঁখি,
আঁখি জল স্নিগ্ধ মোর হৃদয়ের এ ছায়ায়
ফিরে আয়, ফিরে আয়!

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী

রজনীর ফোটা ফুলে প্রভাতের মালাগাছি,
শেষ আশাটুকু নিয়ে আমি যেথা বেঁচে আছি ;
অসহ বিরহভার,—হে নিঠুর ফিরে আয়,
ফিরে আয়, ফিরে আয় !°

এই বিরহ-বিধুর প্রাণের মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা ও বেদনাকে লইয়াই কবি তাহার কাব্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন।

'গোধূলি'—নিরুপমার নব প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ১৩৩৫ সালে বাহির হইয়াছে। 'গোধূলির' অনেক কবিতায়, কবির কাব্যোৎকর্ষের পরিচয় দিতেছে। কিন্তু সুর ও ছন্দে কোন বৈচিত্র্য কিংবা অভিনবত্ব নাই। অনেকগুলি কবিতা রবীন্দ্রনাথের সুর, ছন্দ ও ভাবের প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়—এক কথায় এই তরুণ কবির কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এত বেশি যে, অনেক কবিতা পড়িতে পড়িতে রবীন্দ্রনাথকেই মনে পড়িয়া যায়—স্থানে স্থানে শব্দের মিলন, ঝঙ্কার, এমন কি ভাবের অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত সুস্পষ্টরূপে চক্ষে পড়ে। ইহা সত্ত্বেও নিরুপমার নিজস্ব প্রতিভা আছে। ছন্দের ঝঙ্কার, শব্দ চয়নের নৈপুণ্য, ভাবের নূতনত্ব এবং অন্তরের প্রেরণা আছে।

অনেক সময় কবির ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের চিত্র অজ্ঞাতসারে তাহার কাব্যে ছায়াপাত করিয়া যায়। সেই ব্যক্তিগত দুঃখ ও বেদনাকে ছাড়াইয়া যে কবি বাহিরে বিশ্বের বেদনাকেও অনুভব করিয়া ছন্দে ও ভাবে প্রকাশ করিতে পারেন তাহাকেই আমরা উচ্চশ্রেণীর কবি বলিতে পারি। যিনি এইরূপ কবি তাঁহার কবিতা আপনার ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বহু ঊর্দ্ধে চলিয়া যায়। বিশ্বের প্রতি মানবের বেদনা কবি আপনার হৃদয় দিয়া অনুভব করেন এবং আপনার কথা বলিতে বলিতে নিখিলের নরনারীর মর্ম্ম-বেদনা আপনা হইতেই তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এইরূপ কবিত্বের ব্যঞ্জনা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত

অতি অল্প কবির কাব্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যুতের বিকাশের মত মাঝে মাঝে নিরুপমার দুই একটি কবিতায় ঐরূপ বিশ্বজনীন ভাবের অভিব্যক্তি দেখিতে পাই—

"বেদনা যেন নাহি জড়ায়ে রয়,
ত্যাগেরে কর মোর মহিমাময়।
আমার আঁখিতারা
ঝরায় যত ধারা,
মুক্তিপথে যেন মুক্তা হয়,
ত্যাগেরে কর মোর মহিমাময়।"

বেদনার ভিতর দিয়াও কবির প্রেম কেমন করিয়া আপনাকে জয়যুক্ত করিয়াছে তাহাই কবি অতি সুন্দররূপে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

"ব্যথা দিবে বলে দিয়েছিলে ব্যথা
ব্যথা প্রিয় তুমি দিলে কই
প্রকাশিলে তব প্রেম ব্যাকুলতা
দুখ কোথা তাহে সুখ বই?
নব নব রূপে হেরিয়া তোমায়
হৃদি ভরে উঠে নবীন সুধায়
আঁখিজল আরো হিয়ায় হিয়ায়
তোমারে যে বঁধু চিনে লই,
ব্যথা দিবে বলে দিয়েছিলে ব্যথা
ব্যথা তুমি প্রিয় দিলে কই?"

এই মহান্ আদর্শের চরম পরিণতি কবির 'প্রেমের স্বরূপ' কবিতাটিতে দেখিতে পাইতেছি। আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। উহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, কবি নিরুপমা তাহার কবিতায় স্বার্থময় প্রেমের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়াইয়া আপনাকে ঊর্দ্ধে পৌঁছাইতে পারিয়াছেন।

"তোমার তরে মোর কেমন প্রেম
জানিতে চাহ বঁধু কেন ?
পাষাণ খনি তলে গোপন হেম
পষাণ হ'য়ে আছে যেন !

বাহিরে কোন রূপ প্রকাশ নাই
হৃদয় ভ'রে উঠে রূপেতে তাই,
গভীর কালো মেঘে গভীরে থাকে জেগে
গোপন সুধাবারি হেন !
তোমার তরে মোর কেমন প্রেম
জানিতে চাহ বঁধু কেন ?

আপন মাঝে আছে আপন সুধা
আপনি ভরে আছে সুখে
হৃদয়ে নাই এর বিষম ক্ষুধা
অনল নাই এর বুকে !

আকাশ থাকে দেখো আপনি ভরা
শূন্য যাহা কিছু পূর্ণ করা,
আপন নীলিমায় ঢালিয়া দিয়া যায়
ব্যাকুল ধরা অভিমুখে,
আপন মাঝে আছে আপন সুধা
আপনি ভরে আছে সুখে !

যে প্রেম আছে বঁধু তোমার তরে
সবারি আছে তাহে ভাগ,

সবারে দিয়ে সুখ জীবন পরে
পূরিবে এই মহাযাগ!

নির্ঝর ধারা দেখো আপন দানে
বাঁচায় তৃষাতুর নিখিল প্রাণে,
সবারে ভালবেসে তবে তো পায় শেষে
সাগরে দিতে অনুরাগ,
যে প্রেম আছে বঁধু তোমার তরে
সবারি আছে তাহে ভাগ।”

নিরুপমার ব্যক্তিগত জীবনের পরিচয় এইরূপ। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে যুক্তপ্রদেশের হোসেঙ্গাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্ত। ইনি কোন স্কুল কলেজে পড়াশুনা করেন নাই। পিতার নিকট হইতেই তাঁহার শিক্ষালাভ হইয়াছে। নিরুপমার মাতা বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগিণী ছিলেন—তাঁহার কাছ হইতে ইনি বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যের প্রতি অনুরাগিণী হইবার প্রেরণা পাইয়াছিলেন। ইঁহার বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থা নানা দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হওয়ায়, প্রথম স্বামীর সহিত সম্বন্ধ চ্যুত করিয়া পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। ইঁহার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার সেন। নিরুপমা অতি শৈশব হইতেই কবিতা লিখিতেন। ‘ধূপ’ জীবনের প্রথম অবস্থায় রচিত কবিতার সমষ্টি। ইনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে প্রায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ‘পরিচারিকা’ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্তা লীলা দেবী

শ্রীযুক্তা লীলা দেবী প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশের শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের কন্যা। লীলা দেবীর সহিত ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গীয় স্যার আশুতোষ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয়। আর্য্যকুমার উচ্চ শ্রেণীর শিল্পী। লীলা দেবী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ললিতকলার উৎকৃষ্ট বিভাগ চিত্র-শিল্প এবং নব নব ভাব-ব্যঞ্জক চিত্রের প্রকাশে এক নূতন রূপমাধুরী রচনা করিয়াছেন। দেশের শিল্প, দেশের সাহিত্য প্রভৃতির প্রতি শৈশব হইতেই তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। ছেলেবেলায় বিশেষ অনুরাগের সহিত তিনি সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য পাঠ করিয়াছিলেন। লীলার রচনায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। অতি শৈশবেই তাঁহার কাব্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বাল্যকালের কয়েকটি কবিতা পড়িয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন যে, "লীলার কল্পনা-লীলা এবং রচনালীলা আমার ভাল লেগেছে।"

লীলা দেবীর একমাত্র কবিতাপুস্তক "কিশলয়' ১৩২৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশক—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কলিকাতা। 'কিশলয়ের' ভূমিকা লিখিয়াছেন অনারেবল্ ডাক্তার স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী সি, আই, ই। দেব-প্রসাদ বাবু এই কবির কাব্যের যে পরিচয়টুকু দিয়াছেন তাহা তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং রসবোধের পরিচায়ক।

লীলার কবিতা 'লিরিক' বা গীতি কবিতা শ্রেণীর। প্রত্যেক কবিতার মধ্যে একটা মৃদু মধুর সহজ সরল সুরের স্বচ্ছন্দ গতি কলনাদিনী নির্ঝরের ন্যায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে।

'কিশলয়ের' কবিতাগুলিকে কয়েকটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একটি "আত্মানুভূতি" দ্বিতীয় "আত্মনিবেদন" তৃতীয় 'দেশপ্রেম',— রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক এবং আধ্যাত্মিক ভাব পরিপূর্ণ কবিতাগুলি ত্যাগের ভিতর দিয়াই যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠে সেই ভাবদ্যোতক। প্রত্যেকটি কবিতার ভিতর ধর্ম্মপ্রবণতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং আত্মনিবেদনের ভাব সুস্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। লীলা দেবীর কবিতার আর একটি বিশেষত্ব যে একটি সুমধুর বেদনার করুণ কাতর সুর প্রত্যেকটিতে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

"তোমার সুখের দিনে
উৎসব মিলনে
ভুলে যদি যাও মোরে ক্ষতি নাহি তায়
সঙ্গীহীন যবে তুমি
নিতান্ত নিজনে
স্মরিও আমায় সখা এ মিনতি পায়।
বসন্ত কুসুম ছাওয়া
মাধবী বিতানে
নাহি শোনো ক্ষতি নাই আমার এ গান
দুরন্ত ঝড়ের রাতে
শয়ন শিথানে
মোর গানে ক্ষণতরে দিও সখা কাণ!"

তাঁহার মর্ম্মস্থানের দারুণ আঘাতে যে অপূর্ব্ব অমৃতের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পাঠকের মনেও এক সুমধুর বিষাদ বেদনার সৃষ্টি করে। কবি লীলা দেবীর হৃদয় বিশ্বপ্রেমে কিরূপ পরিপূর্ণ তাহা তাহার 'আত্মানুভব' ও বিশ্ব-প্রেম কবিতা দুইটিতেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। 'সবার মাঝারে আমার প্রাণের পাই আজি অনুভব',—এই একটি মাত্র ছত্রেই লীলা

শ্রীযুক্তা লীলা দেবী

দেবীর আত্মানুভব বিশ্বপ্রীতির এক বিরাট অনুভূতিতে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। কতকগুলি পৌরাণিক কাহিনী লইয়া কবির যে রচনা তাহা বড়ই মনোরম, বড়ই অভিনব। তাঁহার 'উর্ম্মিলা' 'পুরূরবা' ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন। কাব্যের উপেক্ষিতা বিরহিণী উর্ম্মিলাকে লইয়াই কবি যে রস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার ছন্দ, ভাব, ভাষা ও বর্ণনা সহজ সরল,—বলিতে গেলে একেবারে অনবদ্য সৃষ্টি।

"হে চির বিরহিণী হে প্রিয় পুজারিণী
নীরবে উপাসনা এমন কার?
রাজার বধূ বটে, কাহার হেন ঘটে,
কাহার ভালে হেন বেদনভার।"

শেষের কয়েকটি ছত্রে বিরহিণী উর্ম্মিলার ম্লান মূর্ত্তিটি যেন মূর্ত্ত হইয়া

"পতিতে তন্ময় তুমি যে চিন্ময়
পাওনি প্রতিদান কাছেতে তাঁর
দেখেনি সন্ন্যাসী, সে ব্যথা বিন্যাসি
শ্রীরামময় ছিল হৃদয় যাঁর।"

লীলার কবিতায় সংযম, সারল্য ও স্বাভাবিকতা ও প্রসাদগুণ বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট। ভাষার পেলবতা, শান্তিপ্রদ মধুর ভাবের অবতারণা, সঙ্গীতের সুমধুর স্বরলহরী এবং শব্দের মৃদু ঝঙ্কার এমন ভাবে মনের মধ্যে একটা আনন্দের সৃষ্টি করে যে, সেই সুরের রেশ সহসা মিলাইতে চাহে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপে 'সহসা' কবিতাটী উদ্ধৃত করিলাম—

"সহসা এসেছিলে সহসা চলে গেলে
সহসা থেমে গেনু
চকিত লাজে!

সহসা একি হ'লো কি হাওয়া বয়ে গেলো
এমন কুসুমিত
মধুর সাঁঝে !
নিমেষ অগণন, চলেছে অফুরণ
ভুলিয়া কভু সেতো
না হেরে আর'
বিজনে ছিনু একা, চকিতে হ'ল দেখা
অমনি ছাড়াছাড়ি
যে পথ যার !
উত্তল সমীরণে, শ্যামল বনে বনে,
তটিনী মনে মনে
সে কথা কয় !
আমি যে দিশেহারা দেয়না কেহ সাড়া
নয়ন ভরা জল
অঝোরে বয় ।"

শ্রীযুক্তা উমাদেবী

উমাদেবী আধুনিক যুগের তরুণ কবি। ইঁহার পিতৃদেব স্বর্গীয় মোহিতচন্দ্র সেন খ্যাতনামা অধ্যাপক ও দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। উমার জননী সুশীলা দেবী সুলেখিকা ও কবি ছিলেন। অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া সংসারের নানা আবর্ত্তের ঘূর্ণিপাকে পড়িয়া ইঁহার শৈশব জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। উমার স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত শিশির কুমার গুপ্ত। সাহিত্যসাধনাকে উমা তাঁহার জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমতী উমা দেবী

প্যারী সোলন কর্তৃক অঙ্কিত

উমার প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'ঘুমের আগে' তাঁহার বয়স যখন চৌদ্দ কি পনের বৎসর তখন প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বাতায়ন' সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। নানা মাসিক কাগজে ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইয়া থাকে। উমাদেবীর প্রথম রচনা 'ঘুমের আগে' শিশুরাজ্যের সোণার স্বপ্ন-কাহিনীর সুমধুর ছবি। ইহাতে শিশুর মন ভুলানো ছড়াগুলি অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে উহার মধ্যে নিজস্ব প্রতিভার ছায়া বড় কম।

'বাতায়ন' উমাদেবীর কবি-প্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাতায়নে মাত্র চল্লিশটি চতুর্দ্দশ পদী কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে। এ কাব্যগ্রন্থখানা বর্ত্তমান ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশিশিরকুমার গুপ্ত কর্ত্তৃক ৫৫নং কেনাল ইষ্ট রোড্ বেলেঘাটা, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ 'বাতায়নের' কবিতা কয়টি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"এই 'ছায়া ছবির' বিষয়গুলি তোমার বানানো পদার্থ নয়, এগুলি তোমার আপন দেখা বিষয়, তোমার দৃষ্টির ঔৎসুক্য ও প্রকাশের সরল নৈপুণ্য দিয়ে এর প্রত্যেকটিতে বিশিষ্টতা আছে।"

আমাদের দেশে বর্ত্তমান যুগে যে শ্রেণীর কবিতা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সহিত 'বাতায়নের' কবিতার স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রূপটি সহজেই চক্ষে পড়ে। ছোট জীবনের ছোট সুখ দুঃখের কথা, তাহাদের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সরল সহজ চিত্র কবি যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কবিতার আকারে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই এক নূতন দিকে আমাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া লয়। সেই প্রণয় ও বিলাস সম্ভোগের বৈচিত্র্যহীন কবিতার পরিবর্ত্তে এই যে সুন্দর সহজ রচনাগুলি যাহা প্রতিদিনকার নর-নারীর জীবন-যাত্রার মধ্য হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা

মনের মধ্যে একটা জীবন্ত ছবি আনিয়া দেয়। মনের ভিতর বাস্তবের চিত্র হইতে যে আদর্শ সুস্পষ্ট অনুভূত হয় তাহা সকলের প্রাণেই আনন্দ প্রদান করিয়া থাকে। আমরা এখানে বাতায়নের একটি মাত্র কবিতা উদ্ধৃত করিলাম—তাহা হইতেই পাঠকের নিকট লেখিকার সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং কবি-প্রতিভার শুভ্র জ্যোতিঃ প্রতিভাত হইবে।

"মজুর, মজুর-বউ করিছে বচসা
সেদিন নয়নে মোর পড়িল সহসা ;
নিত্যকার এ ব্যাপার, তবু কুতূহলী,
জানালার কাছে আমি ছুটে গেনু চলি ;
দেখি এক নির্ব্বিকার এতটুকু ছেলে
আপনার মনে সেথা ধূলো নিয়ে খেলে,
তা'কে নিয়ে এ বিবাদ বেঁধেছে এমন
জুটেছে পাড়ার লোকে জানিতে কারণ।
বউটা বলিছে কেঁদে,—"করোগো বিচার,
কত যে মানৎ-করা এ ছেলে আমার
এরে কেন দেয় গালি ? কেন মারে ধ'রে ?
দেখি আজ কেমনে ও ঢোকে মোর ঘরে।"
"আয় খোকা আয়" ব'লে হাত ধ'রে টানে,
"বাবা" ব'লে ছেলে চায় মজুরের পানে।"

এই ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থখানার অভিনব মুদ্রণ-নৈপুণ্য, অনাড়ম্বর শোভন রূপটিও বাতায়নের বাহিরের অনেকখানি সৌন্দর্য্যের আভাষ চোখের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করে। একদিন বাতায়নের কবি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ ভাবে যশস্বিনী হইবেন এইরূপ শুভ ভবিষ্যত কামনা আমরা নিঃসন্দেহে করিতে পারি।

পরিশিষ্ট

আমরা এখানে আরও কয়েকজন মহিলা কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলাম। ইঁহাদের কাহারও রচনায় কোন বৈচিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য নাই। অথচ ইঁহাদের পরিচয় প্রদান না করিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় বলিয়াই এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

১। **কল্পনা-কুসুম**—উর্ব্বশী নাটক প্রভৃতির গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী কামিনীসুন্দরী দেবী কর্ত্তৃক বিরচিত। কলিকাতা, জি, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি কর্ত্তৃক বহুবাজার ষ্ট্রীট, ৩০৯ সংখ্যক ভবনে বসু প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১২৭৮। বৈশাখ।

বিজ্ঞাপনে লেখিকা লিখিয়াছেন—ভারতবাসিনী ভগিনীগণের উৎসাহ-বর্দ্ধনের ও চিত্ত সন্তোষের নিমিত্ত আমি এই সামান্য কুসুমের মালাটি গাঁথিয়া ভারত-সমাজে প্রেরণ করিলাম, এখন ইহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে চরিতার্থ হইব। ইহা বঙ্গকুলকামিনীদিগের যে মনোহারিণী হইবে এমন ভরসা করিতে পারি না; তথাপি মনুষ্য দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী। গ্রন্থের পত্রাঙ্ক ১০৫। কুড়িটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি। ইহা সেকালের একঘেয়ে পয়ার ছন্দে বিরচিত নহে। ছন্দে একটু বৈচিত্র্য আছে। যথা—

"বকুল-মাধবীলতা-তরু-লতা বনে,
আনন্দে করিতে ধ্বনি, মিশাইয়া গুঞ্জ ধনি,
সে মধুর প্রতিধ্বনি উঠিত গগনে।

জলধর শ্যাম, রাধা তড়িত-উজ্জ্বল,
শিখিনী হেরিয়া সুখে নাচিত, গাইত শুকে,
চাতকী উড়িত ডেকে আনন্দে বিহ্বল।

গোকুল-আলোক শশী উদিত দেখিয়া,
চকোরী সুধার আশে, ঘুরি ঘুরি পাশে পাশে,
মনের উল্লাসে, কিবা বেড়াত উড়িয়া!"

২। **পুষ্প পুঞ্জ**—শ্রীমতী ষোড়শীবালা দাসী প্রণীত। কলিকাতা ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীট সোমপ্রকাশ ডিপজিটরী দ্বারা গ্রন্থকর্ত্রীর জন্য প্রকাশিত। ৪৮নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট ভারবি যন্ত্রে শ্রীতারিণীচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯১।

বিজ্ঞাপনে শ্রীরঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"অনেকগুলি কবিতা বেশ স্বপ্নের ছায়াময় সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়াছে।" গ্রন্থের পত্রাঙ্ক—৯২। 'বিভু-বন্দনা', 'প্রভাত কালের প্রার্থনা' 'কুলীন বালা' প্রভৃতি পয়ার ছন্দে বিরচিত কবিতায় ইহার কলেবর পূর্ণ। 'নিশীথে পাপিয়া' কবিতাটি হইতে এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"হাসে চাঁদ, হাসে ধরা, সকলি হাসিতে ভরা,
হাসে অই নিরমল সরসী-জীবন।
হরিত পত্রের কোলে, ফল ফুল হেসে দোলে,
হাসে অই মনোরম শ্যাম তরুগণ!
মৃদুল বাতাস হাসে, হাসে লতাগণ।
লতার ললিত অঙ্গে, মুকুলেরা কত রঙ্গে,
হেলে দুলে হাসে কিবা নয়ন রঞ্জন।"

* * *

"যে জন গড়েছে এই সুন্দর ভুবন,
এই চাঁদ মনোহর, এ সুস্নিগ্ধ শশিকর,
এই যে তারকামালা হীরক মতন,
এই যে বিকচ ফুল, এ হসিত লতাকুল,
এই হাসি-পূর্ণ শ্যাম মহীরুহগণ,
ইহাদের যেই জন, করেছেন বিতরণ,
এ হাসি, আমিত তাঁরি হাতের গঠন;
কেননা হাসিব তবে ইহারা হাসিলে?
কেননা এদের সনে, মিশাইব এ জীবনে,
কেন না নাচিব আমি মৃদুল অনিলে?"

৩। **কবিতা-মালা**—শ্রীমতী ব্রজেন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত ও শ্রীমনোমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা নিউটন প্রেস্ যন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৯৭ সাল। পত্রাঙ্ক—৬৯। উল্লেখযোগ্য কবিতা একটিও নাই।

৪। **সুধাময়ী**—শ্রীসরোজিনী দেবী কর্ত্তৃক প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীকালাচাঁদ দাস দ্বারা রঙ্গপুর 'নবাবগঞ্জ' লোকরঞ্জন যন্ত্রে মুদ্রিত। বৈশাখ ১৩০১। পত্রাঙ্ক—৩৬।

৫। **নীহার-মালা**—শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী। চুঁচুড়া হীরা যন্ত্রে শ্রীদীননাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। ১৩০৪ সাল। পত্রাঙ্ক ২৪।

৬। **ভক্তি-সঙ্গীত**—শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসী। ১৩০৬ সাল। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ৫০ নং হরিঘোষের ষ্ট্রীট 'সাহিত্য যন্ত্রে' শ্রীতারাদাস ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত। পত্রাঙ্ক ৪২।

রচয়িত্রী পুত্রশোক-কাতর হৃদয়ে যে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাই এই গ্রন্থে মুদ্রিত হইয়াছে।

৭। **নিবেদিতা**—শ্রীমতী লীলাবতী দেবী। ১৩১০ সালে প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৭২। নিবেদিতা-রচয়িত্রী স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক্ যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথমা কন্যা এবং পণ্ডিত মদনমোহন তর্কলঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্রী। "স্মৃতি" কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"কবে কোন্ অতৃপ্ত চুম্বনে জীবনের প্রথম মিলনে
অনিদ্রায় কেটেছে যামিনী ?
লুকানো সে প্রাণের বাসনা বাহিরিতে করি আনাগোনা
সরমেতে ফুটেও ফোটেনি।

প্রথম প্রণয় পুষ্পরাশি সবেমাত্র উঠিল বিকাশি
প্রাণে জানে কত সুখসাধ।
কেঁপেছিলো পুলকে হৃদয় এত কিগো তারে বলা যায়
লজ্জা আসি সাধিলরে বাদ ॥
নয়নেতে ছিল ঘুমঘোর, সুখনিশা হয় হয় ভোর,
বলি বলি বলাত হ'ল না।
পূর্ব্বদিকে অরুণ কিরণ, জানাইল উষা আগমন,
নিশি গেল আর ত এলো না ॥
দোয়েল গাহিল মধুস্বরে, "জাগ জাগ নববধূ ওরে"
সলাজেতে শিয়ে দিনু বাস।"

৮। **মালা**—শ্রীমতী হেমন্তবালা দত্ত। ১৩১৭। চট্টগ্রাম—শ্রীশ্রী গৌরীশঙ্কর লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পত্রাঙ্ক ৫১। কলিকাতা হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। রচয়িত্রী স্বর্গীয় কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের ভগিনী।

৯। **মর্ম্মভেদী**—শ্রীমতী সুরেশ্বরী দেবী। ১৩১৮। শ্রীপ্রকাশ চন্দ্র দত্ত প্রকাশিত। ১নং অক্রুর দত্তের লেন, কলিকাতা। পত্রাঙ্ক ৯২। পুত্রশোকাতুরা জননীর শোকোচ্ছাস।

১০। **মন বুলবুল**—শ্রীসুশীলমালতী। প্রকাশক—শ্রীবিজনকুমার সরকার। ৩৩নং গড়পার রোড। পত্রাঙ্ক ২৪০। কলিকাতা ৬নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন প্রেস। আশ্বিন—১৩১৮ সাল।

১১। **স্মৃতি**—শ্রীমতী পাঁচুরাণী কর্ত্তৃক রচিত। শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৭নং মদনমিত্রের লেন, বেঙ্গল প্রেসে শ্রীরমণীমোহন দে দ্বারা মুদ্রিত। পত্রাঙ্ক—১৫১।

১২। **মর্ম্মোচ্ছ্বাস**—শ্রীকুসুমকুমারী রায় প্রণীত। কলিকাতা—ভবানীপুর ২নং কেদারনাথ বসুর লেন হইতে শ্রীনবগোপাল চাকি এম, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩১১ সাল। পত্রাঙ্ক ১৭২।

ইঁহার রচনায় ছন্দ-বৈচিত্র্য আছে। ভাবের বা প্রকৃত কবিত্বের প্রকাশ অতি অল্প। দুই একটি কবিতায় কবির প্রকৃত প্রাণের ঝঙ্কার দেখিতে পাওয়া যায়।

১৩। **বিষাদ**—শ্রীমতী মুক্তকেশী। প্রকাশকের নাম মুদ্রাকরের নাম, সন তারিখ ইত্যাদি কিছুই নাই। লেখিকা দেশীয় খ্রীষ্টান। গ্রন্থ মধ্যে সে পরিচয় আছে। দুই একটি কবিতায় কবিত্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"পারিজাত—পুষ্পরথ অশ্ব তার
ঝিঁ ঝিঁ একতান,
ফুৎকারে উড়িয়া যায় তূলা প্রায়
এমনি বিমান ;
চারিদিকে তার বসান শিশির,
জ্যোৎস্নার জাল করে ঝির ঝির ;—
এ অপূর্ব্ব রথখানি,
উষার রেখার প্রায়;
নামিল সে বঙ্গক্ষেত্রে যেখানে অসংখ্য লোক
শয্যায় লুটায় হায় !"

১৪। **জ্যোতি**—শ্রীজীবনবালা দেবী প্রণীত। শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত। কলিকাতা ৬নং কলেজ স্কোয়ার, সাম্য প্রেসে, সেখ আবদুল লতিফ দ্বারা মুদ্রিত। ১৩১৭। পত্রাঙ্ক ১৪৯। জ্যোতি নামের তিন বৎসরের একটি ছোট মেয়েকে হারাইয়া সন্তানহারা জননীর বিলাপগাথায় এই কাব্যগ্রন্থখানা পূর্ণ। কবি শ্রীমতী জীবনবালা দেবী ১২৯২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী এই বালিকার কবিতা পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"এ বালিকা কবি ভারতের রবি
ভারতে উদিল কিবা—
দানে কর রাশি, পাপ তমোনাশি
নিশিকে করিল দিবা।"

এই অতিশয়োক্তি পরিহার করিলেও, জ্যোতির কবিতাগুলি পাঠ করিলে একটি সুন্দর ধর্ম্মভাবের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে একটু উদ্ধৃত করিলাম। তাহা হইতেই আমাদের বক্তব্য সমর্থিত হইবে।

"সরসে সরোজবালা যাঁর পাশে চেয়ে থাকে,
বিহগের কলকণ্ঠে যাঁহারে সতত ডাকে,
অনিমেষ শত আঁখি চেয়ে থাকে যাঁর পানে.
প্রভাতে পুলকভরে নমি তাঁর শ্রীচরণে।
বচন বলিতে নারে, শ্রবণ যা শুনে নাই,
নাসিকায় গন্ধহীন, নয়ন যা দেখে নাই,
ত্বকেতে পরশহীন যাঁহার বিশালকায়,
প্রভাতে উদ্দেশে আজি প্রণমি তাঁহার পায়।
নিদাঘের তপ্ত রবি, বরষার জলধার,
শরতের চারুশোভা, হেমন্তে শিশিরভার,
বসন্তে সুন্দর ছবি, এ বিশ্ব রচনা যাঁর,
প্রভাতে পুলকভরে প্রণমি চরণে তাঁর।
নয়নেতে দেখি নাই, তবু যাঁরে প্রাণ চায়,
ব্যাকুল হৃদয়খানি বিকায়েছি যাঁর পায়,
যাঁহার শরণে পাপ-তাপ জ্বালা দূরে যায়,
আজি প্রাতে নমি আমি সেই বিশ্ব বিধাতায়।"

এইরূপ ভাবে প্রত্যেকটি কবিতার মধ্য দিয়াই প্রেমময়কে পাইবার জন্য এক ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া রহিয়াছে এবং প্রাকৃতিক পদার্থ নিচয়ের মধ্য দিয়া সেই আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

১৫। **কনক-কুসুম**—শ্রীবিভাবতী সেন। শ্রীবরদাকান্ত সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ। পত্রাঙ্ক ২৩৯। ইঁহার কবিতাও সাধারণ শ্রেণীর। কল্পনা, ভাব ও আদর্শের দিক্ দিয়া কোনও নূতনত্ব নাই। ছন্দে নূতনত্ব আছে। তুই এক স্থানে বর্ণনার ঐশ্বর্য্য আছে। যথা—

"হাসিছে বিশাল ধরা জ্যোছনা মাখিয়া
নক্ষত্র হাসিয়া কোলে
হেথা হোথা পড়ে ঢলে,
চাঁদিমা অম্বর কোল আছে উজলিয়া।
খদ্যোত জ্বালিয়া পাখা,
অদূরে দিতেছে দেখা,
নীরব মধুর বায় যেতেছে বহিয়া।
তমাল বকুল গাছে,
ডাকিতেছে মাঝে মাঝে,
সুমধুর রব তুলি চন্দন পাপিয়া।
কাননে কুসুম চয়,
হেসে হেসে সারা হয়,
রজত নীহার কণা বদনে শোভিয়া।
প্রকৃতি আপনা ভুলে,
হাসিছে হৃদয় খুলে,
এমনি সুখেতে কে যে আঁখি নিমীলিয়া।
কে জানে সহস্র হাসি,
কোথা কার গে'ছে ভাসি,
সে যায় কোথায় আজি প্রকৃতি ভুলিয়া।
প্রফুল্লে জগত মাখা,
হাসিটি রয়েছে আঁকা,
এ হাসি কেমনে সে যে গেল পাশরিয়া।"

১৬। **রুক্মিণী** (কাব্য) শ্রীবিন্দুবাসিনী দাসী। এ বইখানা আমরা দেখিবার সুযোগ পাই নাই। আনুমানিক প্রায় কুড়ি পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৭। **মালা**—শ্রীপ্রতিভাময়ী দেবী। এ বইখানাও প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। মিষ্টি সুরে সহজ সরল ভাষায় কয়েকটি খণ্ড কবিতার সমষ্টি।

সম্পূর্ণ

—গ্রন্থকারের বই—

১। বিক্রমপুরের ইতিহাস ... ... ২॥০

২। কেদার রায় [বারভূঁইয়া] ... ... ১॥০

৩। বিক্রমপুরের বিবরণ [১ম খণ্ড] ... ... ২॥০

৪। বিক্রমপুরের বিবরণ [২য় খণ্ড] ... ... ২৲

৫। আসামের ইতিহাস [সচিত্র] ... ... ১৲

৬। মাধবী (উপন্যাস) [দ্বিতীয় সংস্করণ] ... ... ১॥০

৭। পরশমণি " " ... ... ১॥০

৮। পল্লী-রাণী " [তৃতীয় সংস্করণ] ... ... ॥০

৯। জীবন-সঙ্গিনী [দ্বিতীয় সংস্করণ] ... ... ॥০

১০। পল্লী-লক্ষ্মী [দ্বিতীয় সংস্করণ] ... ... ॥০

১১। ঋণের দায় [দ্বিতীয় সংস্করণ] ... ... ১৲

১২। গৃহলক্ষ্মী ... ... ১৲

১৩। শুভক্ষণ ... ... ১৲

১৪। প্রিয়তমা ... ... ১।০

১৫। রূপের আগুন ... ... ॥০

১৬। বঙ্গ সমাজ ... ... ॥০

১৭। প্রেমের অভিষেক ... ... ॥০

১৮। উর্ম্মিলা [যন্ত্রস্থ] ... ... ২৲

১৯। লক্ষ্যপথে [দ্বিতীয় সংস্করণ] ... ... ১৲

২০। শুভ-বিবাহ ... ... ১৲

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

পপুলার এজেন্সী
১৬৩, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।